ত্রিপুরার ৪০টি শতবর্ষপ্রাচীন বিদ্যালয়

মৃণালকান্তি দেবরায়
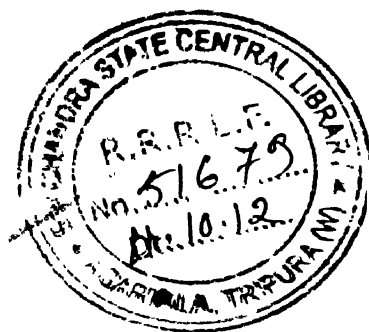
বুক ওয়ার্ল্ড
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১

TRIPURAR CHALLISHTI SHATABARSHA PRACHIN VIDYALAY
by
MRINAL KANTI DEBROY

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০১০
প্রকাশক ঃ অঞ্জনা দাম
বুক ওয়ার্ল্ড
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১
ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৭৮১ / ২৩১৫১২১
কমপিউটার টাইপ সেটিং ঃ শিবনারায়ণ মজুমদার, বিকাশ গণচৌধুরি
প্রচ্ছদ ঃ অপরেশ পাল
মুদ্রণ ঃ এস ডি প্রিন্টার্স
৩২-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯
কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
১৬ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন ঃ (০৩৩) ২৩৬০ ৪৯৮১
সার্বিক যোগাযোগ
জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- ৭৯৯০০১, ত্রিপুরা
ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৭৮১ / ২৩১ ৫১২১
ISBN : 978-81-8266-201-8
200 টাকা

আমার স্নেহময়ী দিদিকে (স্বর্গীয়া দীপ্তি ধর)
যার কারণে চলার পাথেয়
খুঁজে পেয়েছি —

লেখকের নিবেদন

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই পলিটিক্যাল এজেন্টের নিয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার রাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের সংস্কারে রাজাকে প্রভাবিত করেন। ফলে জনমুখী কিছু কল্যাণকর ব্যবস্থারও সূত্রপাত হয়। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাও এর মধ্যে একটি। এর আগে রাজ্যে যে স্কুল একেবারেই ছিল না, তা নয়— অবশ্য তা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে। জনসাধারণ্যে শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নেহাতই নতুন ধারণা, ইউটিলিটিরিয়ান ব্রিটিশ সরকার থেকেই তা উৎসারিত। তাই বলা যেতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী পদক্ষেপের ইতিহাস ত্রিপুরায় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট থেকে শুরু, যখন প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডবলিউ. বি. পাওয়ার আগরতলায় পদার্পণ করেন। এরপর থেকেই পার্বত্য ত্রিপুরায় একের পর এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শুরু। যদিও কোনো কোনো সময়ে রাজ্যের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও বলা যায় যে, অন্তত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজ্যে ১৪৯টি (বালক — ১৩৯, বালিকা — ১০) স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক স্কুলই অবলুপ্ত হয়েছে, বাকি সব স্কুলই আজ শতবর্ষের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে।

বর্তমানে কিছু কিছু স্কুলের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে— তা নেহাতই বিচ্ছিন্নভাবে এবং রাজধানী এবং দুই-তিনটি মহকুমা শহরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে হয় না। আবার যেসব স্কুলে শতবর্ষ পালিত হচ্ছে, দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সবগুলির ক্ষেত্রেই এদের বয়স যথেষ্ট কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

বর্তমান লেখক উমাকান্ত একাডেমীর একজন প্রাক্তন শিক্ষক, সৌভাগ্যক্রমে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে উমাকান্ত একাডেমীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উমাকান্ত একাডেমীর প্রাচীন উৎসের খোঁজ করতে করতে বিভিন্ন তথ্য থেকে আরো কিছু শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুলের খোঁজ পেয়ে যাওয়ায় অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ে, যার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থটি।

এমনিতেই আমরা ইতিহাস সম্পর্কে আশ্চর্য ধরনের নিস্পৃহ, তাই পুরানো স্কুলগুলির প্রথম যুগের ইতিহাস কোনো স্কুলেই যত্ন সহযোগে রক্ষিত হয়নি, অবহেলা-অযত্নে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতি কিছুটা ভরসা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজন্য আমলের পর স্কুলের বর্তমান পরিণতির ইতিহাসে সমস্যা দেখা গেছে। এইসব কারণে আলোচ্য স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাকাল বা বয়স নিরূপণে কিছু নীতি-নির্দেশিকা অবলম্বন করতে হয়েছে, যেমন—

১) কিছু কিছু স্কুলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকালের নির্দিষ্ট সন-তারিখ লব্ধ তথ্য থেকে পাওয়া গেছে। ফলে, এদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

২) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ সন থেকে প্রশাসনিক সংস্কারের যুগ শুরু হওয়ার সময়ে রাজ্যে কোনো নতুন বিভাগ / উপ-বিভাগ সৃষ্টির সময় বিভাগীয় সদরে প্রশাসনিক অফিস-আদালত, জেল ইত্যাদি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ও স্কুল-প্রতিষ্ঠা একটি আবশ্যিক রীতি ছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিভাগ সৃষ্টির সময় বিভাগীয় সদরে আগে থেকেই স্কুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। তাই বিভাগ সৃষ্টির সময়ে সদর কেন্দ্রে পাঠশালার প্রতিষ্ঠা (যদি আগে হয়ে না থাকে) সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করা যায়।

৩) বিভাগে একটি মাত্র স্কুল থাকলে, তা বিভাগীয় সদরেই অবস্থিত বলে ধরে নিতে হবে। মেয়েদের স্কুলের ক্ষেত্রেও একই শর্ত সমানভাবে প্রযোজ্য।

৪) বিভাগীয় কেন্দ্র নয়, অথচ হাসপাতাল / ডিসপেনসারি আছে, এমন ক্ষেত্রে ওই স্থানে যে স্কুল থাকবে তা নিশ্চিত। কারণ, স্কুলের ব্যয়ভার ডিসপেনসারির ব্যয়ভারের চেয়ে অনেক কম।

৫) তহশিল-কাছারি ও বাজার উভয়ই আছে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য জনবসতি থাকায় অবশ্যই পাঠশালা যে আছে, তাতে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৬) কোনো বসতিতে পোস্ট-অফিসের অস্তিত্ব সেই এলাকায় সাক্ষরতার প্রমাণ দেয়। ফলে পোস্ট-অফিসের উপস্থিতি ঐ এলাকায় স্কুলের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ দেয়।

৭) কোনো স্থানে তহশিল-কাছারি অথবা বাজার থাকলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেও স্কুলের অস্তিত্বের যথেষ্ট জোরালো সম্ভাবনা থাকে।

এইসব নীতি-নির্দেশিকার ভিত্তিতেই লেখক বিভিন্ন উৎস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কতক স্কুলের শতবর্ষ অতিক্রমণের খোঁজ পেয়েছেন এবং রাজন্য আমলের আরো বেশ কিছু স্কুলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু রাজন্য আমলের স্কুলগুলির পরবর্তী সময়ে বিবর্তনের চিত্রটি খুঁজে পেতে লেখক সবচেয়ে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন। রাজন্য আমলের হাই স্কুলগুলির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না থাকলেও এম.ই. (মধ্য ইংরেজি) এবং তার নিচু পর্যায়ের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে এই বিবর্তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত বিচিত্র পথে ঘটেছে যে চমকে যেতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন ব্যক্তিদের সহায়তায় স্কুলের বিবর্তিত রূপ ধরা পড়েছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমান কাজ করেছে। এই দুর্বলতার জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী, এদের বিবর্তিত রূপ উদ্ধারে যেমন প্রচুর সময় প্রয়োজন, তেমনি যথেষ্ট পরিশ্রমও দরকার— যা লেখকের পক্ষে বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। কাজেই রাজন্য আমলের স্কুলগুলির ইতিহাসের সন্ধানে এই প্রচেষ্টা

আংশিক ও অসম্পূর্ণও বটে। তবে কোনো একজনের পক্ষে কাজটা শুরু করে দেওয়াটা একান্তই জরুরি, নতুবা এদের ইতিহাস আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বইয়ের সূত্র ধরে নবীন গবেষকরা এগিয়ে এসে লেখকের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবেন, এই প্রত্যাশা রইল।

রাজন্য আমলের শেষভাগে 'জনশিক্ষা সমিতি' পরিচালিত স্কুলগুলির লিস্ট লেখক জোগাড় করতে সমর্থ হননি। অঘোর দেববর্মার 'জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা' গ্রন্থে যেসব স্কুলের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে বাইখোরার স্কুলটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, তৈরূপা ও জলেমার স্কুল হাইস্কুল এবং নোয়াবাদীর স্কুলটিও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়রূপে আজ বিদ্যমান। বাকি স্কুলগুলির বর্তমান রূপ জানতে লেখকও আগ্রহী।

বইটিতে রাজন্য আমলের মাদ্রাসা স্কুলগুলি নিয়ে কোনো বিশেষ আলোচনায় লেখক সক্ষম হননি, এটিও বইটির একটি দুর্বলতা, সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ভবিষ্যতে কারো জন্য এই কাজটি তোলা রইল।

বইয়ের পরিশিষ্ট অংশটিতে আলোচ্য বিদ্যালয়গুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্থানীয় ধারণা ও রাজন্য-পরবর্তী আমলের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা দেবানন্দ দাম মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতার কারণেই বাস্তবতা পেয়েছে। এ জন্য লেখক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আগরতলা
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০

মৃণালকান্তি দেবরায়
প্যারীবাবুর বাগান
জয়নগর, আগরতলা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (১)	১১
২.	উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (২)	২০
৩.	রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন, কৈলাসহর (১)	৩৫
৪.	রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন, কৈলাসহর (২)	৪০
৫.	নবদ্বীপচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন, সোনামুড়া	৪৭
৬.	বোধজং বয়েজ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা	৫৭
৭.	কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন, উদয়পুর	৬১
৮.	বিশালগড় টাউন গার্লস হাই স্কুল, বিশালগড়	৭২
৯.	ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন, বিলোনীয়া	৭৬
১০.	বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা	৮৩
১১.	কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কমলপুর	৮৯
১২.	খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, খোয়াই	৯৩
১৩.	মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা	১০০
১৪.	বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন, ধর্মনগর	১১৮
১৫.	কৈলাসহর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, কৈলাসহর	১২৭
১৬.	ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ঋষ্যমুখ, বিলোনীয়া	১৩৫
১৭.	সোনামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সোনামুড়া	১৪১
১৮.	ধর্মনগর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, ধর্মনগর	১৪৪
১৯.	খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, খোয়াই	১৪৬
২০.	কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, বিলোনীয়া	১৪৮
২১.	সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, সাব্রুম	১৫০
২২.	উদয়পুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উদয়পুর	১৫২
২৩.	সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, আগরতলা	১৫৭
২৪.	কৈলাসহর / উদয়পুর মাদ্রাসা— কোন্‌টি শতবর্ষের অধিকারী ?	১৬১
২৫.	বিলোনীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় — একটি বির্তক ?	১৬৪
২৬.	আরো কিছু শতবর্ষ অতিক্রমকারী বিদ্যালয়	১৬৯
২৭.	রাজন্য আমলের আরো কিছু বিদ্যালয়	১৮৪
২৮.	উপসংহার	১৯৫
২৯.	পরিশিষ্ট - ১ ঃ যোগাযোগ	২০৪
৩০.	পরিশিষ্ট - ২ ঃ শেষকথা	২৪২
৩১.	গ্রন্থপঞ্জী	২৪৫

উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (১)

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলের (১৮৬২-৯৬ইং) প্রথম থেকেই রাজধানী আগরতলায় একটি মাইনর পর্যায়ের স্কুল ছিল। ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত ত্রিপুরার প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট A.B.W.Power -এর প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের প্রথম তারিখে আগরতলায় Power সাহেব প্রথম পদার্পণ করেই স্কুলটিকে প্রত্যক্ষ করেন। স্কুলটিতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। স্কুলটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "That at Agurtollah is conducted on the same principles as our Zillah Schools ; two masters teach English, and two Bengalee and Sanscrit.[১]" স্কুলটিতে কতজন ছাত্র পড়ত, অথবা কী ধরনের পরিবারের ছাত্ররা এই স্কুলে আসত, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "It musters between thirty and forty scholars, many of whom belong to the Rajah's family (his sons do not attend the school, they are being taught privately, and are all learning English) ; others are the sons of men holding office in the state, of talukdars living in the vicinity, and others. One or two Mahomedans also attend. Nearly all belong to the better classes.[২]" অর্থাৎ সোজা কথায় স্কুলটি প্রকৃতপক্ষে ছিল রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রশাসক অথবা প্রশাসনিক কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সূতিকাগার। ওই সময়ে মূলতঃ রাজধানী আগরতলা ঠাকুর শ্রেণীর লোক, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী ও সামান্য কিছু ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের দিয়েই গড়ে উঠেছিল, রাজধানীতে সাধারণ প্রজার সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তাই এই স্কুলটির রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই ছিল না, তা বলা যায়।

A.W. B. Power-এর বর্ণনা অনুসারে, স্কুলটি পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি ছিল, এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বয়ং Power সাহেব। খুব সম্ভবত, এই পরিচালনা কমিটি ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট আসার আগেও ছিল, অতিরিক্ত সুযোগলাভের প্রচেষ্টায় এজেন্ট সাহেবকে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অপরপক্ষে, পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছেও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার পক্ষে এটি একটি অনুকূল পরিস্থিতি ছিল।

তবে ব্রিটিশ এলাকার মাইনর স্কুলের ধাঁচে পরিচালিত হলেও স্কুলটি সমতল ত্রিপুরার ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না, পাঠ্যক্রম অথবা পুস্তক নির্বাচন এবং সামগ্রিক পরিচালনায় স্কুলটি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো।

স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট A.W.B. Power-এর বিবরণীতে কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্টরাও এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি।

তবে কোন্ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার 'আবর্জনার ঝুড়ি' গ্রন্থ থেকে। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য করেন বলে উল্লেখ করেছেন— "আমাদের ইংরেজী অধ্যয়নারম্ভের কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি অবৈতনিক বঙ্গ বিদ্যালয় (ব্রিটিশ ভারতের স্কুলের বিধি ব্যবস্থায় পরিচালিত সাধারণের প্রবেশগম্য আদি বিদ্যালয় ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য শিক্ষার Genesis) স্থাপন করিয়াছিলেন"।[৩] "ইংরেজী অধ্যয়ন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "পিতৃবিয়োগের পরেই তিনি আমাদিগের ইংরেজী অধ্যাপনার ব্যবস্থায় হাত দিলেন।"[৪] নবদ্বীপ চন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের শুরুতে। এরপরেই বীরচন্দ্রমাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নবদ্বীপচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের ইংরেজী অধ্যয়নপর্ব শুরু হওয়ার সময় রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজকুমারদের এই ইংরেজী অধ্যয়নের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণ ছিলেন, নব্যযুগের ধারায় দীক্ষিত ইংরেজী শিক্ষক আনন্দ বিহারী সেনের ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিরোধী কোনো শিক্ষা অথবা আলোচনা হয় কিনা, তার জন্য রাজদ্বারের লৌহ কর্মশালার অধ্যক্ষ, গোপীমোহন মুন্সীকে ইংরেজী শিক্ষার ছলে গুপ্তচর নিয়োগ করেন। গোপীমোহন মুন্সীর ইংরেজী শিক্ষার ভান নবদ্বীপচন্দ্র ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের খোরাক যে যোগাত, তা তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণিত আছে। তবে নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার ভাষায়— "কিন্তু এই হাস্যরসের উপরে দাবী অনেকদিন টিকিল না।"[৭] শীঘ্রই রাজগুরু তার পদ থেকে অপসারিত হন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কর্মচ্যুত ও অবরুদ্ধ হন।[৬] তাই এটা স্পষ্ট যে, এর আগেই অর্থাৎ মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে নবদ্বীপচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার ইংরেজী অধ্যয়ন শুরু হয়। কাজেই, নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার জবানী মতে, তার আগে অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে অথবা অন্তত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বীরচন্দ্র মাণিক্য এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধরা যেতে পারে।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে, বিশেষতঃ রাজধানীতে, কোনো স্কুল ছিল না, এই ধরনের ধারণা নিতান্তই ভুল। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের দ্বারা লিখিত ১৮৭৬-৭৭ সনের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে— "A Muktab for instruction in persian

has also been established at Agartala. At present this institution does not derive any support from the State, and is maintained at the expense of the Rajah's family tutor.[৭]"এ থেকে মনে হতেই পারে, এই ফার্সী শিক্ষার স্কুলটি সে বছরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পরের বছরের রিপোর্টে প্রমাণিত হয় যে, স্কুলটির অস্তিত্ব এর আগেও ছিল— .... "the Persian Muktab and Sanskrit tole of Agartala are really old institutions revised during the year."[৮] এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাজধানীতে ফার্সী ভাষায় মক্তব এবং সংস্কৃত টোল অনেক আগে থেকেই চালু ছিল। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী প্রচলনের আগে প্রশাসনিক কাজে ফার্সী ভাষার ব্যবহার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চালু ছিল। বাংলার নবাবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ফার্সী ভাষা ব্যবহার করা হতো। এছাড়া মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলের আগের সনদ, দানপত্র, নোটিশ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা ফার্সী শব্দে কণ্টকিত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, এমন কি বীরচন্দ্র মাণিক্যও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাই বীরচন্দ্র মাণিক্যের আগেও যে রাজধানীতে ফার্সীভাষার স্কুল ছিল, তা জোর দিয়েই বলা যায়। সংস্কৃতভাষা শেখার টোল সম্পর্কেও একই কথা চলে। কিন্তু রাজধানীতে বসবাসরত কর্মচারীদের (যেমন সেরেস্তাদার ইত্যাদি) সন্তানদের অথবা ঠাকুর পরিবারের (যাদের পক্ষে বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব ছিল না) সন্তানদের জন্য পরবর্তী কর্মচারী বা প্রশাসক হওয়ার লক্ষ্যে বাংলা ও গণিত শিক্ষার জন্য কোনো স্কুল বীরচন্দ্র মাণিক্যের আগে ছিল না, তা কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা নিশ্চিত যে অন্তত রাজধানীতে বহুকাল আগে থেকেই কমপক্ষে একটি মধ্যযুগীয় পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল। মহারাজ রত্নমাণিক্য (আনুমানিক ১৪৬৪ খ্রিঃ) গৌড় থেকে আসার সময় সঙ্গে যে করণ সম্প্রদায়ের তিনজনকে এনে এদেশে গৌড়ের অনুকরণে 'সেরেস্তা'-এর সৃষ্টি করে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার প্রবর্তন করেছিলেন, তারপর থেকেই রাজানুকুল্যে রাজধানীতে দেশীয় পাঠশালার সূত্রপাত হয়েছিল। কাজেই এই ধরনের স্কুল যেমন উদয়পুরেও ছিল, তেমনি রাজধানী স্থানান্তরের পর পুরাতন আগরতলায়ও সেটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে নতুন হাভেলী বা বর্তমান আগরতলার একটি রাজপ্রাসাদ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য দ্বারা নির্মিত হওয়ার পর থেকেই এখানে রাজাদের পাকাপাকি ভাবে বসবাসের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর আগে পুরাতন আগরতলায় রাজপ্রাসাদেই মহারাজা থাকতেন এবং সেখান থেকে নতুন হাভেলীতে এসে প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন করতেন। কাজেই ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে চলে আসার আগে ঠাকুর পরিবার ও রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই পুরাতন আগরতলায় থাকার জন্য স্কুলটি সেখানেই ছিল। প্রাসাদ নির্মাণের অব্যবহিত পরেই বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজা হন। ঐ সময়ে রাজার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাকুর পরিবার ও রাজকর্মচারীরা নতুন আগরতলায় চলে আসায় স্কুলটিরও স্থানান্তর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বীরচন্দ্র মাণিক্য আগরতলায় ঐ স্কুলটি স্থানান্তরের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলে

চালু মাইনর স্কুলের আদলে এর রূপান্তর ঘটান। খুব সম্ভবত, নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা এই ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। তাই অনুমান করা যায় যে, বর্তমান উমাকান্ত একাডেমী শতবর্ষ নয়, কয়েক শতবর্ষ প্রাচীন। এই অনুমানের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ লেখকের কাছে নেই, তাই আপাতত স্কুলটি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মেনে নিতে কোনো সংশয় থাকে না।

Power সাহেবের প্রথম রিপোর্টে স্কুলটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য না মিললেও দ্বিতীয় রিপোর্টে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৭৩-৭৪ সালের রিপোর্টে তিনি লিখেছেন— "There are at present 79 Scholars on the books ; a considerable number are being taught English."[৯] স্কুলের ছাত্রসংখ্যা নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় রিপোর্টের মধ্যে এত ফারাকের কারণ— প্রথম রিপোর্টটিতে তিনি অন্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পেশ করেছিলেন ; ঐ সময়ে অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছুটিতে ছিলেন— "The Headmaster of the school at Agurtollah is away for the Durgapujah vacation, taking the keys of the school record boxes with him, and since my return from leave there has not been time to obtain much information regarding primary education in the mofussil."[১০] স্কুলটির জন্য রাজার অনুদান ছিল মাত্র ৩০ টাকা। ফলে স্কুলের আর্থিক দুর্দশা ছিল চরমে এবং স্কুল পরিচালন কমিটির মিটিং-এ সমস্যা উত্তরণের পন্থা বের করার জন্য আলোচনা চলছিল বলে Power সাহেব জানিয়েছেন। তাই কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার বক্তব্য অনুসারে 'স্কুলটি অবৈতনিক' ছিল না এবং এই ধরনের আর্থিক দুরবস্থায় তা সম্ভবও ছিল না। রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে, "The school used to be supported by the Rajah and was called the "Maharaja's school," but fees were taken from the scholars, and monthly deductions made from the salaries of amlahs by way of voluntary subscriptions to the maintainance of the school.[১১]"

স্কুলটির আর্থিক দুর্দশা কাটাবার জন্য পরিচালন কমিটি অবস্থাপন্ন সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য আহ্বান করেন। এই অবস্থায় সাড়া দিয়ে রাজা স্কুলের জন্য অনুদান ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ টাকা করে দেন। কিন্তু এতেও স্কুলটির দৈন্যদশা ঘোচে না। ফলে স্কুলটি প্রায় উঠে যাওয়ারই উপক্রম হয়। স্কুলটির এই দুরবস্থার কারণে শিক্ষকদের বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ১৮৭৪-৭৫ সালের বিবরণীতে বলা হয়েছে— "The former income of the school, which was obtained partly by a grant from the Raja and partly by private subscriptions, was insufficient to meet the expenses, and the consequence was that the committee were oblige to

reduce the salaries of the teachers.[১২]" এই আর্থিক সংকটের সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য স্কুলটির অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং স্কুলটির জন্য ১৩৫০ টাকা বার্ষিক অনুদান ধার্য করেন। ফলে শিক্ষকদের বেতন আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে এবং আগের অবস্থায় স্কুলটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।[১৩] এই রিপোর্টে স্কুলটি অবৈতনিক হয়ে যায় বলে জানা যায়। তাই কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার 'স্কুলটি অবৈতনিক ছিল' এই তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ঐ সময়ে আগরতলার এই স্কুলটিতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। ১২৯৪ ত্রিং (১৮৮৪ - ৮৫ইং) সনের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, মাইনর স্কুলগুলিতে (যা মধ্য ইংরেজী বা M.E স্কুল নামেও পরিচিত) মোট সাতটি শ্রেণী ছিল। সর্বনিম্ন শ্রেণীটি ছিল বর্তমানের ইন্‌ফ্যান্ট শ্রেণীর সমতুল্য, যাতে শিশুশিক্ষা, কড়াকিয়া ইত্যাদি পড়ানো হত। তবে এই স্কুলটিতে উপরের শ্রেণীগুলিতে ছাত্রসংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। First class বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাত্র একজন, Second class বা পঞ্চম শ্রেণীতেও ছাত্রসংখ্যা একজন এবং অন্যান্য শ্রেণীগুলিতেও ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি ছিল না বলে ১৮৭৩-৭৪ সনের বিবরণীতে বলা হয়েছে।[১৪] অর্থাৎ সবচেয়ে নিচের ক্লাসগুলিতেই ভিড় ছিল বেশি। ছাত্রসংখ্যা ৭৯ জন হলেও স্কুলে দৈনন্দিন উপস্থিতি ছিল নৈরাশ্যজনক। পরের বছরের রিপোর্টে ছাত্রসংখ্যা ৭২ দেখানো হলেও দৈনন্দিন উপস্থিতির হার ছিল মাত্র ৪১[১৫]। এই অনুপস্থিত ছাত্রদের বেশির ভাগই ছিল ঠাকুর সম্প্রদায়ের, এর কারণ আমরা পরে আলোচনা করব।

১৮৭৪-৭৫ সনের রিপোর্টেই আমরা স্কুলটিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত ছাত্ররা পড়ত, তা জানতে পারি। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, ৭২ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৩ জন ঠাকুরশ্রেণীর অন্তর্গত, ৮ জন মণিপুরী, ২০ জন হিন্দু, ৩ জন মুসলমান এবং ৮ জন দেশোয়ালী। এ থেকে ঐ সময়ে রাজধানী আগরতলার জনগোষ্ঠীর সংখ্যার একটা চিত্র আমরা পাই।[১৬]

স্কুলটির আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হলেও যে সবকিছুই ভাল চলছিল, তা নয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট T. E. Coxhead-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, স্কুলটিতে ছাত্রদের দৈনন্দিন উপস্থিতির দৈন্যদশা Coxhead সাহেবকে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল— "I cannot say that during the year the Agurtollah school has worked well. The proportion of boys in daily attendence to those on the rolls has been very unsatisfactory.[১৭]" এই রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, স্কুলের পরিচালন কমিটির স্থানীয় সদস্যরাও তাদের দায়িত্বপালনে যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজকর্মও সন্তোষজনক ছিল না। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরাও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর কাছ থেকে স্কুলের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা অবগত হলে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এইসব ত্রুটি নিবারণে শক্ত ব্যবস্থা নেন। বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করে দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এছাড়া স্কুলটির প্রতি যুবরাজও আকৃষ্ট হন এবং ঠাকুরদের স্কুলে তাদের সন্তানদের নিয়মিত পাঠানোর অনীহার প্রতি মহারাজের অসন্তুষ্টির কথাও জানিয়ে দেওয়া হয় — "The special interest of the Joobraj has been awakened to the affairs of the school, and the thakoors have been informed that the Rajah view their indifference to the education of their children with great displeasure.[১৮]"

প্রকৃতপক্ষে, ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ প্রশাসনিক পদে ঠাকুরদের নিযুক্তি একটি প্রথা ছিল। এছাড়া ঠাকুররা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজকোষ থেকে নিয়মিত ভাতাও পেতেন। ফলে স্বভাবতই জীবনধারণ অথবা উচ্চপদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের কোনো সমস্যা ছিল না। এই কারণেই সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে পড়াশুনারও বিশেষ গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের কছে এই স্কুল ও ঠাকুর বংশোদ্ভুত সন্তানদের সুষ্ঠু শিক্ষাগ্রহণের সবিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তাদের হস্তক্ষেপে রাজ্যে নতুন ভাবধারায় যে প্রশাসনিক সংস্কার শুরু হয়েছিল, তাতে এক ঝাঁক সুশিক্ষিত প্রশাসকের প্রয়োজন ছিল। সেই অর্থে স্কুলটির ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি ঠাকুর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত প্রশাসক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই এই স্কুলটির প্রতি আমরা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট ও পরবর্তীকালে অ্যাসিস্টেন্ট পলিটিক্যাল এজেন্টের উদ্বেগ ও সতর্ক দৃষ্টি প্রায় প্রতিটি রিপোর্টেই দেখতে পাই।

স্কুলটিকে চাঙ্গা করতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ব্যবস্থা নিলেও যে সামগ্রিক অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছিল তা নয়। ঘন ঘন শিক্ষকের পরিবর্তন, অনিয়মিত ভাবে শিক্ষকদের বেতন প্রদান, উপযুক্ত পরিদশনকার্যের অভাব, স্থানীয় অধিবাসীদের স্কুলের প্রতি অনাগ্রহ স্কুলটিকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলছিল। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট C.W. BOLTON-এর ১৮৭৭-৭৮ সনের রিপোর্টে এ সম্পর্কে একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা আছে— "I regret to say that the school is not properly looked after, and therefore fails to fulfil efficiently its functions as the principal school of the State. The masters are frequently changed, and the influential residents of Agartala, both private and official, take no interest in the school. For some years past the Political Agents alone have generally visited the school.[১৯]"

ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের পাঠানো বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত পরিসংখ্যান বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই না পাওয়া যাওয়ায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে কয়টি ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তা নিচের সারণীতে দেওয়া গেল।

সারণী - ১

(আগরতলা ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা)

সন (খৃষ্টাব্দ)	মোট ছাত্রসংখ্যা	ঠাকুর	ত্রিপুরী	মণিপুরী	বাঙালী হিন্দু	মুসলমান	দেশোয়ালী	অন্যান্য	দৈনিক উপস্থিতি
১৮৭২	৩০-৪০ (?)	NA	NA	NA	NA	১/২	NA	-	NA
১৮৭৩-৭৪	৭৯	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA
১৮৭৪-৭৫	৭২	৩৩	-	৮	২০	৩	৮	-	৪১
১৮৭৫-৭৬	৭৬	১৪	১৩	১৪	১৯	৩	১৩	-	৪৩ ২৪
১৮৭৬-৭৭	৯০	৩৩	১২	০৫	২৭	৪	৯	-	NA

১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে আগরতলার ঐ স্কুলটিতে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী এই চারটি স্বতন্ত্র ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল—"The most important school in the state is that of Agartola, which is divided into four sections for the instruction seperately of English, Bengali, Sanskrit and and persian.[২০]" অর্থাৎ ১৮৭২ সালের পর কোনো একসময়ে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতের সঙ্গে ফার্সী শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্কুলটির অবস্থার উন্নতি হলেও মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যে 'জলচল' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার প্রথম বলি হয় আগরতলার এই স্কুলটি— "On account of the caste question the headmaster of the Agurtollah school, which is the largest institution of the kinds in the State left the Maharaja's service about the beginning of the year under report, and his place has not yet been filled up.[২১]" ফলে স্কুলটি আবার ক্রমশ অবনতির দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু স্কুলটির গুরুত্ব বিবেচনায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাস মহাশয় একে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করা আশু প্রয়োজন বলে ১৮৮৪-৮৫ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেন— "In the interest of both the students and the State, it is desirable to improve the position of Agartala Anglo-vernacular school. It ought to be raised upto the standard of an entrance school, and pupils ought to be allowed to compete at the Calcutta University Entrance Examination from it.[২২]"

ঐ সময়ে আগরতলার এই স্কুলটি মাইনর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য সফল ছাত্রদের রাজ্যের বাইরে কুমিল্লা অথবা অন্যত্র পড়তে যেতে হত। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের ক্ষেত্রে রাজ্যের বাইরে এই বৃত্তি কার্যকরী না থাকায় বাইরে পড়ার জন্য তারা কোনো সাহায্য পেত না। ফলে আগরতলার এই স্কুলটির ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট সংকুচিত ছিল। অবশ্য যেসব ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র বাইরে পড়ত, তাদের জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হতো। কিন্তু এতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হত। এইসব কারণেই অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জমান এই রাজ্যটির আর্থিক দুরবস্থা লাঘবের জন্যও স্কুলটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করা সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্টের চিন্তার মধ্যে ছিল। কিন্তু চরম আর্থিক দুর্গতি ও প্রশাসনিক উদাসীনতার ফলে স্কুলটির অবস্থা আরও শোচনীয় হতে থাকে। ১৮৮৮ ৮৯ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, স্কুলটির এই দুর্দশার কারণে ঠাকুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অনেক ছাত্রকে এই স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে কুমিল্লায় ভর্তি করে দেওয়া হয়।[২৩] তবু, বলা যেতে পারে, একক প্রচেষ্টায়, সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাস স্কুলটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যান— এ বিষয়ে তাঁকে প্রশাসনিক স্থবিরতা ও আগ্রহহীনতাকে অতিক্রম করে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে সমদৃষ্টিভঙ্গীতে আনতে হয়েছিল। তাই সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে তাঁর শেষ বছরে আমরা স্কুলটিকে এন্ট্রান্স পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে দেখি— "arrangement are also being made for the Agartala school being raised to the status of an Entrance school.[২৪]" এমন কি, ঐ বছরই পলিটিক্যাল এজেন্ট R. T. Greer আগরতলা পরিদর্শন কালে স্কুলটিকে এন্ট্রান্স পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে সুপারিশ করেন— "The creation of an Entrance school at Agartala will be an advantage to the Thakurs and others who are unable or unwilling to send their children for education out of Hill Tipprah. I found the existing school in a fairly prosperous state.[২৫]"

সূত্র ঃ

১ Adm. Report of the Political Agency, Hill Tipperah, Vol-I, page-29

২. — ঐ — page - 29

৩. আবর্জনার ঝুড়ি, পৃ - ৪২

৪. — ঐ —, পৃ - ৩৫

৫. — ঐ — পৃ - ৩৭

৬. রাজমালা, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ- ১০৯

৭. Adm. Report of Pol. Agency, Vol - I, Page - 104

৮. — ঐ —, Page- 135

৯. — ঐ —, Page- 46
১০ — ঐ —, Page- 29
১১. — ঐ —, Page- 46
১২. — ঐ —, Page-67
১৩. — ঐ —, Page-67
১৪ Adm. Report of the Pol.Agency, Vol - I Page - 47
১৫. — ঐ —, Page-67
১৬. — ঐ —, Page- 67
১৭ — ঐ —, Page- 79
১৮. — ঐ —, Page- 79
১৯. — ঐ —, Page-135
২০. — ঐ —, Vol-II, Page-58
২১. — ঐ —, Page-93
২২. — ঐ —, Page-152
২৩. — ঐ —, Page-243
২৪. — ঐ —, Page-255
২৫. — ঐ —, Page-259

উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (২)

ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহে সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাস ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীপদে বীরচন্দ্র মাণিক্য দ্বারা নিযুক্ত হন। ফলে আগরতলা মাইনর স্কুলটির এন্ট্রান্স পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথ দ্রুত সুগম হয়। ঐ বছরের ১৫ই ডিসেম্বর স্কুলটি এন্ট্রান্স স্কুলে রূপান্তরিত হয়। Administration Report এবং স্কুলের 'ভিজিটরস্ বুক' উভয়েই এই দিনটির উল্লেখ আছে। ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে লেখা রয়েছে— "The increase has been principally devoted to the Agartala English School which has been raised from a minor class institution to an Entrance class school .... The school contains now 101 students against 33 on the 1st of Pous (15th December) last, when the institution was inaugurated as an entrance school.[১]" আবার উমাকান্ত একাডেমীর 'ভিজিটরস্ বুকে' ১৩০১ ত্রিং সনের ১৯শে আশ্বিন (৫ অক্টোবর, ১৮৯১ইং) তারিখে স্বয়ং উমাকান্ত দাস লিখেছেন— "The school was started in its present form on the 1st of the day of Pous 1300 TE (...... 15th December, 1890).[২]" "in its present form" বলতে বোঝা যাচ্ছে এর আগে স্কুলটির অন্যভাবে অস্তিত্ব ছিল। 'ভিজিটরস্ বুক'-এ এই রিপোর্টের আগেও আরো তিনটি রিপোর্ট আছে। এর মধ্যে প্রথম রিপোর্টটির সন-তারিখ অস্পষ্টতার কারণে সনাক্ত করা যায় নি। তবে এই রিপোর্টটি ১৮৮৬-৮৮ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট J. C. Price-এর বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় রিপোর্টটি (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তারিখের) লিখেছেন পূর্ব কুমিল্লায় কার্যরত স্কুল-ইনস্পেক্টর দীননাথ সেন। তিনি স্কুলটি পরিদর্শনে এসেছিলেন খুব সম্ভবত একে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে, কারণ এই রিপোর্টে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।[৩]

'ভিজিটরস্ বুকে' লিখিত এই দুটি রিপোর্ট স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর-এর আগেও স্কুলটির অস্তিত্ব ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থেও স্কুলটির পূর্বতন অস্তিত্বের সমর্থন মেলে— 'পূর্ব হইতেই আগরতলায় একটি সামান্য রকমের—
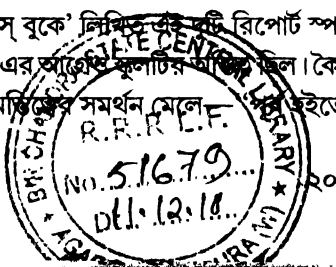
ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল। যুবরাজ বাহাদুরের উৎসাহ ও সাহায্যে উমাকান্ত বাবুর দ্বারা সেই বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট এন্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল[৪]।" কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উমাকান্ত একাডেমীর প্রতিষ্ঠাকাল তার এন্ট্রান্স স্তরে উন্নীতকরণের দিন থেকেই অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ধরা হচ্ছে। এই ধরনের মারাত্মক অবিচার রাজ্যের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভাগ্যে কেন জুটল, সে সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে।

প্রকৃতপক্ষে, এই বিচ্যুতির জন্য দায়ী ১৯৭৫ সালে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে "Tripura District Gazetteers' নামক আকর গ্রন্থে 'Education & culture' শীর্ষক অধ্যায়ে পরিবেশিত একটি তথ্য। 'Secondary Education'-শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "Agartala High School which was established in 1890 and renamed as Umakanta Academy in 1904 after the name of Rai Bahadur Umakanta Das, the late Minister of Tripura, remained the only high school in the State , ... [৫]."

এই 'which was established' কথাটিই যত বিপত্তির কারণ, কারণ এ থেকেই উমাকান্ত একাডেমীর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ বলে শিক্ষাবিভাগের দৃঢ়মূল ধারণা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অধ্যায়টির সূচনাপর্বে ১৮৭৪-৭৫ সালে আগরতলার স্কুলটি সহ রাজ্যে দুটি স্কুলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলির শিক্ষা-সম্পর্কিত তথ্যেরও উল্লেখ আছে। এইসব তথ্যই বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বইটিতে আগরতলার এই স্কুলটির হাইস্কুলে রূপান্তরণের তথ্যও লিপিবদ্ধ আছে— "Another important step for the improvement of educational facilities was taken by upgrading the standard of examination of the English School upto the Entrance Examination of the Calcutta University (Bengal Administration Report, 1890-91).[৬]" এই তথ্য থেকে Gazetter-এর লেখক স্কুলটির যে রূপান্তর ঘটেছিল, সেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। যাই হউক, পরবর্তীকালেও স্কুলটির শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আগে এর সঙ্গে অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা মিলিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু যে কারণেই হউক, একটি স্কুলের শতবর্ষের ইতিহাস খুঁজে পেতে যে অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যমের প্রয়োজন হয়, বোধ করি সেই সময়ে ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই উমাকান্ত দাস মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলেও দুইবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গুণমুগ্ধ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলটি বর্তমান অট্টালিকায় স্থানান্তরণের সময় উমাকান্ত দাসের নামে স্কুলটিকে নামাঙ্কিত করেন [৭]। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'Tripura District Gazetteers'-এর যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে উমাকান্ত একাডেমীর শতবর্ষ নিরূপণ করা হয়েছে, তাতে 'উমাকান্ত

একাডেমী' নামকরণের সময়টি ভুল ভাবে দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন তথ্য সংগ্রহে বা লিপিবদ্ধকরণে প্রাথমিক পর্যায়ে ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে অধিকতর তথ্যের প্রাপ্তি এই ভুলের পরিমার্জনের সুযোগ করে দেয়। উমাকান্ত একাডেমীর ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ কি এখনও আসে নি ? স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল অবিলম্বে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পিছিয়ে নিয়ে তাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের কর্তব্য নয় কি? ভবিষ্যতই এর উত্তর দেবে।

প্রথম অবস্থায় বিদ্যালয়টি কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্পর্কে কোনো তথ্যভিত্তিক ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সূচনায় দুর্গাবাড়ীর পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে স্কুলটি অবস্থিত ছিল বলে প্রাচীন ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে বর্তমান নেতাজী চৌমুহনী অঞ্চলেও কিছুদিন ছিল বলে অনেকে জানিয়েছেন। কেবলমাত্র স্মৃতি থেকে আহরিত এই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য, তা বিবেচ্য। তবে স্কুলটির স্থানান্তর ঘটিত একটি সংবাদ পাওয়া যায় 'ভিজিটরস্ বুক'-এর একটি রিপোর্টে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে ঐ বইয়ের পঞ্চম রিপোর্টে জানা যায়— "The school has no compound which may be used as a playground ; to supply this want it has been in contemplation to remove the school to a more open place on the north of the military guard house.[৮]" খুব সম্ভবতঃ এরপরেই স্কুলটি নেতাজী চৌমুহনী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি স্কুল প্রাঙ্গণেই একটি কলেজ চালু করা হয়। স্কুলের 'ভিজিটরস্ বুক'-এ একই সনের ১১ই সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে লিখিত আছে— "The school has had two college classes. ...... The college at that time was running in 5 thatched mat sheds. .... A pucca building for the college is in contemplation ... with so ..... a staff the college should have live future.[৯]" কলেজটির শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে একটি নাশকতার ষড়যন্ত্রের বীজ বপন হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হিসেবে কলেজটির আয়ুষ্কাল খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি এর বিলোপ ঘটে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে স্কুল ও কলেজগৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই নাশকতার পেছনের আসামীদের ধরার জন্য একটি গেজেট-বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়—[১০]

গত পরশ্ব রাত্রিতে অত্রস্থ কলেজ ও স্কুলগৃহসমূহ মনুষ্যকর্তৃক অগ্নিসংযোগ হেতু ভস্মীভূত হইয়াছে। যে-কোনো ব্যক্তি অপরাধীকে ধৃত করিতে অথবা তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিলে এবং যে পুলিশ কর্মচারী নিপুণতার সহিত অনুসন্ধান দ্বারা আসামী ধৃত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে সরকার হইতে ২৫০্ আড়াইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। পুলিশ কর্মচারী ও সন্ধানকারী উভয়ের মধ্যে পুরস্কারের টাকা সমভাবে বিভক্ত হইবে, ইতি।

সন ১৩১৩ ত্রিপুরা, তারিখ ২৮শে কার্তিক।

A. CHAUDHURY
পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট

এরপর ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের Adm. Report-এ দেখা যায় যে, হাই স্কুলটির জন্য একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল, যার মোট ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ২৫,০০০ টাকা ঐ বছরে পরিশোধ করা হয়।[১১] ঐ সময়ে এই অট্টালিকার পশ্চিমদিক ঘেঁষে অবশ্য ছন-বাঁশেরও একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। ঐ সনেই 'উমাকান্ত একাডেমী' নতুন নামকরণ সহযোগে হাইস্কুলটি অট্টালিকায় উঠে যায় এবং ছন-বাঁশের ঘরে এর বাংলা বিভাগটি স্থানান্তরিত হয়। একথা বলা প্রয়োজন যে, আগে থেকেই স্কুলটিতে ইংরেজী বিভাগ ও বাংলা বিভাগ নামে দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। বাংলা বিভাগ অংশের ছাত্ররা বাংলাতেই লেখাপড়া করত, ইংরেজী বিভাগের ছাত্ররাই কেবলমাত্র ইংরেজী পড়ার সুযোগ পেত। পূর্ব কুমিল্লার ইনস্‌পেক্টর অব্ স্কুলস্ দীননাথ সেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট স্কুলটি পরিদর্শন কালে এই স্কুলে দুটি বিভাগ দেখতে পান। একটি ইংরেজী বিভাগ, যাতে ৩৫ জন ছাত্র পড়ত— যাদের মধ্যে ৬ জন ঠাকুর বংশজাত, ২৫ জন বাঙালী হিন্দু, ২ জন ত্রিপুরী এবং ২ জন মুসলমান। অপরটি বাংলা বিভাগ, যাতে ৮৩ জন ছাত্র ছিল — এদের মধ্যে ২১ জন ঠাকুর, ১২ জন ত্রিপুরী, ১৫ জন বাঙালী হিন্দু, ২ জন মণিপুরী, ৩ জন গোর্খা এবং ২৮ জন মুসলমান।[১২(i)] ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদের নিয়েই আগরতলা হাই স্কুলটির ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু হয় এবং বাংলা বিভাগটি আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। এটি প্রথমে উচ্চ বাংলা স্কুল নামে পরিচিত হতে থাকে এবং পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তা মধ্য ইংরেজী স্কুলে রূপান্তরিত হয়।[১২(ii)] তবে শেষ পর্যন্ত ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে স্কুলটি বিলুপ্ত হয় এবং এর উপরের ক্লাসগুলি উমাকান্ত একাডেমীর সংশ্লিষ্ট ক্লাসগুলিতে মিশে যায়— "..... the Middle English School at Agartala was disolved. The upper classes of the Institution were amalgamated with the corresponding classes of the Umakanta Academy, the Infant classes only being maintained as a seperate institution under the direct supervision of the Headmaster of the Academy."[১৩] উমাকান্ত একাডেমী শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থে প্রাক্তন ছাত্র শ্রী গোষ্ঠবিহারী দত্ত লিখেছেন যে, এই মাইনর স্কুলটি ছিল স্কুলের পশ্চিমদিকে এবং এই স্কুল থেকেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সিংহ ও উমেশলাল সিংহ ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করে উমাকান্ত একাডেমীতে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন।[১৪]

১৩১৪ ত্রিং সনের ৮ই ফাল্গুন (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১/২২ ফেব্রুয়ারী) তারিখে নতুন অট্টালিকায় স্কুলটির স্থানান্তরণের সময় থেকেই তা 'উমাকান্ত একাডেমী' নামে পরিচিত হতে থাকে।

এই নতুন নামকরণ সম্পর্কে গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি নিচে দেওয়া হল—

১৩১৪ ত্রিং, তাং ২৯শে ফাল্গুন, মেমো নং ১৪[১৫] — শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের অভিপ্রায় অনুসারে বিগত ৮ই ফাল্গুন তারিখ হইতে আগরতলা হাই স্কুল মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের নামানুসারে উমাকান্ত একাডেমী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর এই বিদ্যালয় "উমাকান্ত একাডেমী" নামে পরিচিত হইবে এবং অফিসিয়েল কাগজপত্রে উক্ত নাম ব্যবহার হইবে।

A. CHAUDHURI
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
শিক্ষা বিভাগ

এ প্রসঙ্গে সেই সময়ের 'অরুণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩১৫ ত্রিং, ১লা বৈশাখ) লেখা হয়েছে— "আগরতলার স্থানীয় এন্ট্রান্স স্কুলটি এতদিন খড়ের ঘরে ছিল। কিয়ৎকালের পূর্বে স্কুলগৃহটি বৈশ্বানর কৃপায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহার পর স্কুলের জন্য একটি অতি মনোহর পাকাবাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। বাড়ির প্ল্যান ও প্রস্তুতকার্য নিপুণতার পরিচায়ক। উপকরণও উৎকৃষ্ট। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আলোক ও বায়ুর প্রবেশ নির্গতের সুব্যবস্থা আছে। স্কুলগৃহে একটি সুবৃহৎ হল আছে। যতদিন আগরতলায় টাউনহল প্রতিষ্ঠিত না হয় এই হলে তাহার কার্য অনায়াসে চলিতে পারিবে। অনেক হলে উচ্চস্বরে কথা কহিলে প্রতিধ্বনি বশতঃ শ্রোতৃবর্গের অসুবিধা ঘটে। কিন্তু এই হলে সে দোষ নাই। সম্প্রতি স্কুলটি নতুন দালানে আসিয়াছে। নূতন দালানে প্রতিষ্ঠার দিনে স্কুলটির নামেরও পরিবর্তন হইয়াছে। এখন হইতে স্কুলটির নাম ত্রিপুরার মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাশ বাহাদুরের নামানুসারে 'উমাকান্ত একাডেমী' হইল"। (উমাকান্ত একাডেমীর শত বৎসর উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে— রমাপ্রসাদ দত্ত) ।[১৬]

উমাকান্ত একাডেমীর শতবর্ষ স্মরণিকায় উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের তালিকায় হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.-এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই স্মরণিকার অন্যত্র যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে এই দাবীর পেছনে কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। Visitor's Book-এ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মার্চ জনৈক Re-Gure-এর রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে উমাপদ বসু, এম. এ. নিযুক্ত ছিলেন— "The Headmaster was not found at the time of my visit. I learn that his salary has been fixed at Rs. 100/- and that Umapadya Basu, M.A., the Headmaster of the school is a competent man, B.

Satyendranath Rai, B.A., The second master, was in charge of the school.[১৭]"

স্কুলটির ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে হাই স্কুলে রূপান্তরের আগে একই সনের ২৮শে আগস্ট দীননাথ সেন স্কুল পরিদর্শনকালে 'ভিজিটরস্' বুক'-এ লিখেন— "It is proposed to appoint a Headmaster in Rs. 100, a second Master on Rs. 50, & so on." তাই ধরে নেওয়া যায় যে, এই প্রস্তাবের পরেই মাসিক ১০০ টাকা বেতনে উমাপদ বসুকে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, যার উল্লেখ ১৮৯১ সনের ২৬ শে মার্চ Re Gure ভিজিটরস্ বুক-এ করেন। তাই উমাপদ বসুকে হাইস্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না। একই তথ্য আমরা পাই ১৮৯১ সনের ৫ই অক্টোবর মন্ত্রী উমাকান্ত দাসের স্কুল পরিদর্শনকালে ভিজিটরস্ বুক-এ লিপিবদ্ধ রিপোর্টে— "The Headmaster of this institution Babu Umapada Bose M.A. B.L. has been particularly instructed to pay due attention to these rules." তথ্যের এই ত্রুটির প্রতি তখনই উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক ও শতবর্ষ স্মরণিকার আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয় তার মূল্যবান প্রবন্ধ "Going through the Visitor's Book'-এর মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন— "A point must be take note of that in the list of Headmasters of Umakanta Academy the Headmaster during the period of 1891 was shown as "Sri Debendranath Rai, M.A.. This visitors report was supported by Sri Umakanta Das, the next visitor in regard to the name of the Headmaster. It is not known on which basis the list was prepared." তাই শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর আগের প্রধান শিক্ষকের যে নামের তালিকা উমাকান্ত একাডেমীতে শোভা পাচ্ছে, তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে স্কুলে ১ জন এম. এ, ২ জন বি. এ, সহ সর্বমোট ১৪ জন শিক্ষক স্কুলটিতে ছিলেন বলে জানা যায়।

হাই স্কুলে রূপান্তরের পর আগরতলার বাইরের পার্বত্য ত্রিপুরার অন্যান্য অংশের ছাত্রদের ও আগরতলার নিকটস্থ বৃটিশ শাসনাধীন ত্রিপুরা জেলার ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে স্কুলে বাঙালী ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং খোলা হয়। কখন এই বোর্ডিং খোলা হয় তা জানা না গেলেও ১৩০৯ ত্রিং (১৮৯৯ - ১৯০০ ইং) সনের Administration Report-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়— "The Boarding House for Bengali boys attached to the school has much added to the usefulness of the institution.[১৮]" এই বোর্ডিং-এর ছাত্রদের কেবলমাত্র খাওয়ার খরচ দিতে হত, চিকিৎসা, ওষুধপত্র, থাকার জায়গা, চাকরবাকরের সুবিধা বিনা পয়সায় মিলত।[১৯] ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫-০৬ইং) সনের Administration Report-এ দেখা যায় যে, ঐ সময়ে বাঙালী হিন্দুদের জন্য

নির্ধারিত ঐ বোর্ডিং ছাড়াও মণিপুরী ও ত্রিপুরীদের জন্য আরেকটি বোর্ডিং ছিল — "The other boarding houses in which charges for board only are paid by the students. were under the direct supervision of the Head master of the Umakanta Academy, and were intended, one for the benefit of Bengali Hindus and the other of Tipperas and Manipuris.[২০]" এই দুটি বোর্ডিং-এ সব মিলিয়ে বছরের শুরুতে ২৮ জন ছাত্র থাকলেও বছরের শেষে তা কমে ২৩-এতে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৩১৮ ত্রিং (১৯০৮-০৯ইং) সনের রিপোর্টে দেখা যায়, হাই স্কুলটির জন্য একটিই বোর্ডিং চালু আছে। এই বোর্ডিংটি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "The Boarding institution attached to the High School students who have no guardians or relatives in this place generally live in this institution. Here the boaders have to pay only for their food. ...... It is looked after by a superintendent (hitherto honorary. now paid) who is a teacher in the High School, the Headmaster exercising a general control."[২১]– অর্থাৎ দুটো বোর্ডিং মিলে একটি বোর্ডিং-এ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তবে বোর্ডিং-এ ছাত্রসংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিল, ১৩১৯ ত্রিং সনে বোর্ডিং-এ ২৩ জন ছাত্র থাকলেও ১৩২০ ত্রিং সনে তা কমে ১৪ জনে দাঁড়ায়।[২২] ১৩২২ ত্রিং (১৯১২-১৩ইং) সনে চাহিদার কারণে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি মণিপুরী বোর্ডিংও খোলা হয়।[২৩] তবে খুব সম্ভবত, সাধারণ বোর্ডিং হাউসটি স্কুল-সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল না। স্কুল পরিদর্শনকালে (৬.১১.১৯১১) কমিটির সভাপতি B. K. Burman ভিজিটরস্ বুক-এ বোর্ডিংটির দুরবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন— "He pointed out the wretched condition of the boarding house and he suggested to remove it from the present position to some-where attached to the school compound in order to facilitate constant inspection of the discipline of the mates.[২৪]"

পার্বত্য ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে ১৩৩৬ ত্রিং (১৯২৬-২৭ইং) সনে একটি বোর্ডিং হাউস (ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস) খোলা হয়— 'In order to attract hill boys to higher education, as an experimental measure, a Boarding House (attached to the U. K. Academy) was opened at Agartala last year accommodating ten hill boys, all of whom got admitted to the school. The boys received free boarding and lodging having a Superintendent Tutor to look after their studies as well as the boarding management. This institution received encouraging support from leading head man of Tippera Villages.[২৫]" ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মার 'জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা' গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে, এই ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসটি ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দের ১৩ই পৌষ স্থাপিত হয়। এই বোর্ডিং হাউসটি প্রধানত খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরের রামকুমার

ঠাকুর এবং সদরের পেকুয়াজলা গ্রামের ওয়াখী রায়ের উদ্যোগেই গড়ে উঠার সুযোগ পায়।[২৬] এই বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের মধ্য থেকে পরবর্তী সময়ে নব চেতনার উন্মেষে ঐতিহাসিক জনমঙ্গল সমিতির সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা বোর্ডিং-এর প্রতিষ্ঠাতাদের একটি গ্রুপ ফটোও এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। রামকুমার ঠাকুর ও ওয়াখীরায় ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা হচ্ছেন গোপাল ঠাকুর, শ্রীরামঠাকুর, টিকেন্দ্র ঠাকুর এবং রবি ঠাকুর। ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ইং) সনের Administration Report থেকে জানা যায় যে, স্থানাভাবের কারণে ঐ বছর আরেকটি নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং খোলা হয়— "For want of accommodation in the old Tripura Boarding house there was in addition a newly started boarding house with 27 Tripura boys of lower classes in the year.[২৭]"

১৩৩৬ ত্রিং সনে প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরা বোর্ডিংটির পরিচালনার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন, যিনি ছাত্রদের লেখাপড়ার কাজেও সাহায্য করতেন। নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং-এর জন্যও ছেলেদের একজন শিক্ষক এসে সকাল-বিকেল পড়াতেন এবং বোর্ডিং পরিচালনার ভারও তার হাতে ছিল। পুরানো ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী (Matriculation class)-এর ছাত্ররাই কেবলমাত্র জায়গা পেত। তাদের দেখাশুনার জন্য সারাক্ষণের জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছাড়াও ছেলেদের সকালবেলায় পড়াবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বোর্ডিং-এ একটি ছোটখাট লাইব্রেরীও ছিল। নতুন বোর্ডিং-এ নিচের ক্লাসের ছেলেরাই কেবল সুযোগ পেত। উভয় বোর্ডিং-এর ছাত্রদের জন্যই বোর্ডিং এলাকায় ছেলেদের চাষবাসে উদ্বুদ্ধ করতে জমি নির্ধারিত ছিল।[২৮] শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মার জবানীতে, ঐ সময়ে পুরানো বোর্ডিং-এর সুপার ছিলেন আনন্দ দাস এবং নতুন বোর্ডিং-এর সুপার ছিলেন বংশীঠাকুর ওরফে অমরেন্দ্র দেববর্মা।[২৯] নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ১৮ই বৈশাখ বলে শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা তথ্য দিলেও এ বিষয়ে তিনি গ্রন্থের অন্যত্র ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। এই তথ্য অনুসারে ওয়াখীরায় প্রথমে বিশালগড় M. E. School-এ একটি ত্রিপুরা বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করলেও পরবর্তী সময়ে আগরতলার রাজকীয় গেস্ট হাউসের পশ্চিমাংশে তা স্থানান্তরিত হয়। আগুনে গেস্ট হাউস পুড়ে যাওয়ার পরই তা উমাকান্ত একাডেমীর পুরানো বোর্ডিং-এর পাশে স্থানান্তরিত হয়। এই দুটি বোর্ডিং পাশাপাশি বেশ কিছুদিন চলার পর খুব সম্ভবত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে (শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মার বয়ান অনুসারে) এদের একত্রে করে উমাকান্ত বোর্ডিং নামে নতুন নামকরণ হয়।[৩০]

উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে ২০০০ ইং সনের ২৬শে অক্টোবর লেখকের সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বর্তমান সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-

এর পূর্বদিক ঘেঁষে দুটি তরজার ঘরে বাঙালী বোর্ডিং হাউসটি ছিল, কিন্তু পরে ছাত্রের অভাবে তা উঠে যায়। বস্তুত, ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩ - ২৪ইং) সনের রিপোর্টে R.K.I., B.K.I এবং B.B.I হাই স্কুলে বোর্ডিং-এর বিবরণ দেওয়া থাকলেও উমাকান্ত একাডেমীর কোনো বোর্ডিং-এর উল্লেখ নেই।[৩১]

এই বোর্ডিংগুলি ছাড়াও উমাকান্ত একাডেমীর সঙ্গে আরো দুই-একটি বোর্ডিং যুক্ত ছিল। ঠাকুর পরিবারগুলির সন্তানদের জন্য ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে যে ঠাকুর বোর্ডিং হাউস প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে সুযোগপ্রাপ্ত ঠাকুর ছাত্রেরা উমাকান্ত একাডেমীতে পড়ত এবং এই স্কুল থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেত। বোর্ডিংটি বর্তমান দুর্গাবাড়ি এলাকায় অবস্থিত ছিল ; এর পরিচালনার ভার সরাসরি সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল, রাজাই-এর পরিচালনা কমিটি নিযুক্ত করতেন, তবে উমাকান্ত একাডেমীর শিক্ষকদের মধ্য থেকেই ছাত্রদের কোচিং-এর শিক্ষক নিযুক্ত করা হতো। উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিধুলাল চক্রবর্তীর জবানীতে জানা যায় যে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঠাকুর বোর্ডিং-এর আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ চলে আসে। তিনি আরো জানান, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি বর্তমান বোর্ডিং সুপার-এর কোয়ার্টারের পশ্চিমাংশে লস্কর ছাত্রদের একটি বোর্ডিং দেখেছেন। এই বোর্ডিং-এ থাকার জায়গা ও রান্নার ঠাকুর বিনামূল্যে দেওয়া হলেও আবাসিকদের নিজ খরচে খাবারের সংস্থান করতে হতো। তবে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই লস্কর বোর্ডিং উঠে যায়।

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের উদ্যোগে ১৩৪২ ত্রিং সনে (১৯৩২-৩৩ইং) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু হয়। এর ফলে ঐ বছরের ১লা মাঘ থেকে আগরতলার উমাকান্ত একাডেমী, তুলসীবতী, বিজয়কুমার ও ঠাকুরপল্লী স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু হয়। এই প্রাথমিক স্কুলেরই শিক্ষক মোঃ কালা মিঞা জানিয়েছেন যে, উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিমাংশে, যেখানে আগে উমাকান্ত একাডেমীর নিম্নশ্রেণীর ক্লাসগুলি হতো, সেখানে লাল দালানটিতে (বর্তমানে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে) তৃতীয় শ্রেণী (দুটি সেকশন) ও চতুর্থ শ্রেণী ছিল এবং এর সবচেয়ে পূর্বদিকের ঘরটিতে শিক্ষকরা বসতেন। এর পশ্চিম ঘেঁষে একটু পেছনে একটি লাল টিনের হাফ-ওয়াল ঘরে এবং দালানঘরটির সমান্তরালে সামান্য দক্ষিণে একটি তরজার ঘরে অন্য শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস হতো। পরে এই বিদ্যালয়টি ১নং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বর্তমানে তা 'উমাকান্ত একাডেমী জুনিয়র বেসিক স্কুল' হিসেবে উমাকান্ত একাডেমীতে সকালবেলায় পরিচালিত হচ্ছে।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

১নং উমাকান্ত একাডেমী

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বালকের সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	কুমারগণ	ঠাকুর	ত্রিপুরী	বাঙালী হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ ইং)	১০১	৮৩	১৮৪	১	২	৪	১৬০	১৭	-
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ ইং)	১৫৭	১২৫	২৮২	১	৬	২	২৫৫	১৮	-
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ ইং)	১৮২	১৪৩	৩২৫	১	১০	৫	২৮০	২১	৮
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ইং)	১৬০	১২০	২৮০	০	৯	২০	২৩৩	১৮	-
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ইং)	২১৯	৯৬	৩১৫	০	১৪	০	২৭৭	২৪	-
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ ইং)	২৩০	১১৬	৩৪৬	০	১৭	০	২৯৭	৩০	২
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ ইং)	১৯৩	১০১	২৯৪	০	৭	২	২৫৩	৩১	৩
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ইং)	২৩৭	১২৮	৩৬৫	০	১০	১	৩১৭	৩৫	২
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ইং)	২৫০	১৩৯	৩৮৯	০	১৯	৪	৩৪১	২০	৫
১৩৫১ (১৯৪১ - ৪২ ইং)	২৪১	১২১	৩৬২	০	১৬	১	৩২২	-	৩
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ ইং)	১৮৯	১২৯	৩১৮	০	১০	-	২৮৩	২২	৩
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ ইং)	১৮৩	১২১	৩০৪	০	৮	১	২৭০	২০	৫
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ ইং)	১৯৭	১৩০	৩২৭	১	১৫	৩	২৯০	১৭	১
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ ইং)	২১১	১৪৯	৩৬০	০	১০	২	৩২৪	২৪	-

* তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড়মিনিস্ট্রাশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

সংযোজন

Notice

১.

WANTED an assistant teacher for the U. K. Academy Agartala on Rs. 40 p.m. in the grade of Rs. 40-2-60. Preference will be given to a graduate having previous experience in the teaching line. Application should reach the undersigned on or before the 25th Agrahayan, 1338, T.E.

সপ্তবিংশ ভাগ, ষোড়শ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ- ২য় পক্ষ, ১৩৩৮ ত্রিং

S. C. Deb Barman
18.8.38
Officer - in - charge
Education Department
Tripura State.

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা - ১৯৪)

২. এন্ট্রান্স পরীক্ষা ঃ রাজন্য আমলে উমাকান্ত একাডেমীর সাফল্যের খতিয়ান

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সাফল্যের হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট	
১৩০২ (১৮৯২ - ৯৩ ইং)	২	NA	NA	NA	১	৫০
১৩০৩ (১৮৯৩ - ৯৪ ইং)	১০	NA	NA	NA	৮	৮০
১৩০৪ (১৮৯৪ - ৯৫ ইং)	৯	১	৪	২	৭	৭৭৮
১৩০৭ (১৮৯৭ - ৯৮ ইং)	৬	NA	NA	NA	৫	৮৩৩
১৩০৮ (১৮৯৮ - ৯৯ ইং)	৮	৪	২	২	৮	১০০
১৩০৯ (১৮৯৯-১৯০০ ইং)	৮	NA	NA	NA	৭	৮৭৫
১৩১২ (১৯০২ - ০৩ ইং)	NA	১	২	২	৫	?
১৩১৩ (১৯০৩ - ০৪ ইং)	১৩	১	৩	৪	৮	৬১৫
১৩১৪ (১৯০৪ - ০৫ ইং)	১৭	২	৩	৬	১১	৬৪৭
১৩১৫ (১৯০৫ - ০৬ ইং)	১৬	NA	NA	NA	৭	৪১২
১৩১৬ (১৯০৬ - ০৭ইং)	২১	৩	৮	৫	১৬	৭৬২
১৩১৭ (১৯০৭ - ০৮ ইং)	৩১	১	৭	৮	১৬	৫১৬
১৩১৮ (১৯০৮ - ০৯ ইং)	৪০	৬	১২	৪	২২	৫৫
* ১৩১৯ (১৯০৯ - ১০ ইং)	১৫	২	৫	২	৯	৬০
	১১	৪	১	০	৫	৪৫৫

উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (২)

১৩২০ (১৯১০ - ১১ইং)	১৯	১০	৬	১	১৭	৮৯৫
১৩২১ (১৯১১ - ১২ইং)	১৮	৯	০	১	১০	৫৫৬
১৩২২ (১৯১২ - ১৩ ইং)	২১	১৬	৩	০	১৬	৭৬২
১৩২৩ (১৯১৩ - ১৪ ইং)	২৫	১৩	১১	০	২৪	৯৬
১৩২৪ (১৯১৪ - ১৫ ইং)	৩১	১৩	১০	০	২৩	৭৪২
১৩২৫ (১৯১৫ - ১৬ ইং)	৩৩	১২	৪	১	১৭	৫১৫
১৩২৭ (১৯১৭ - ১৮ইং)	৩৭	১১	৪	২	১৭	৪৫৯
১৩২৮ (১৯১৮ - ১৯ ইং)	২৬	১৪	৪	০	১৮	৬৯২
১৩২৯ (১৯১৯ - ২০ ইং)	৩০	৭	১০	২	১৯	৬৩৩
১৩৩০ (১৯২০ - ২১ইং)	১৮	১১	৫	০	১৬	৮৮৯
১৩৩১ (১৯২১ - ২২ ইং)	২১	১১	৭	৩	২১	১০০
১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ ইং)	১৯	১০	৩	১	১৪	৭৩৭
১৩৩৪ (১৯২৪ - ২৫ ইং)	২২	১৩	৭	০	২০	৯০৯
১৩৩৫ (১৯২৫ -২৬ ইং)	১৬	৩	৯	০	১২	৭৫
১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	১৪	৯	২	০	১১	৭৮.৬
১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	১৪	৭	৫	০	১২	৮৫.৭
১৩৩৮ (১৯২৮- ২৯ খ্রিঃ)	২৯	১০	৫	২	১৭	৫৮.৬
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	১৭	৪	৪	০	৮	৪৭
১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	২৪	১৩	৫	১	১৯	৭৯.২
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ খ্রিঃ)	২৮	৩	১৫	৪	২২	৭৮.৬
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	৩০	৬	১৩	২	২১	৭০
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	২৩	৭	১৩	০	২০	৮৬.৯
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	২৩	৫	১২	১	১৮	৭৮.৩
১৩৪৬ (১৯৩৭৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	১৭	৬	৬	১	১৩	৭৬.৫
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিঃ)	২২	১০	৮	১	১৯	৮৬.৪
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ খ্রিঃ)	২৮	১০	৪	৫	১৯	৬৭.৯
১৩৪৯ (১৯৩৯- ৪০ খিঃ)	৩০	০	৩	১৬	১৯	৬৩.৩
১৩৫০ (১৯৪০-৪১ খ্রিঃ)	৩১	৩	৭	১৫	২৫	৮০.৬
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ খ্রিঃ)	৩৫	৩	৫	১৮	২৬	৭৪.৩
১৩৫৩ (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ)	২২	৩	৩	১২	১৮	৮১.৮
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৩১	৪	৪	১১	১৯	৬১.৩
১৩৫৫ (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ)	৪৫	৩	৭	২৩	৩৩	৭৩.৩

(তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।)

* ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো এন্ট্রান্স পরীক্ষার বদলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নতুন সিলেবাস পরীক্ষা শুরু হয়।

ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমে Supplimentary Entrance Examination হয় এবং এরপর নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ Matriculation Examination বসে।

* * ১৩১৮ ত্রিং সন থেকে ১৩২৫ ত্রিং সন পর্যন্ত কৈলাসহরের R.K.I এবং বিলোনীয়ার BKI ব্রাঞ্চ স্কুল হিসেবে উমাকান্ত একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত থাকে ।

* ১) ১৩২৫ ত্রিং সনে একাডেমীর একজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'কীর্তিচাঁদ ম্যাকেঞ্জি স্বর্ণপদক' পায়।

২) ১৩৪৪ ত্রিং সনে রাজ্যে পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান পায়।

৩) ১৩৪৫ ত্রিং সনে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান একাডেমীর একজন ছাত্র দখল করে।

৪) ১৩৪৬ ত্রিং সনে দুইজন ছাত্র রাজ্যে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান পায়।

৫) ১৩৪৭ ত্রিং সনে রাজ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্থান দখল করে।

৬) ১৩৪৮ ত্রিং সনে রাজ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পায়।

৭) ১৩৫০ ত্রিং এবং ১৩৫২ ত্রিং সনে রাজ্যে যথাক্রমে তৃতীয় ও প্রথম স্থান দখল করে।

৮) ১৩৫৩ ত্রিং সনে রাজ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্থান পায়।

৯) ১৩৫৪ এবং ১৩৫৫ ত্রিং সনে রাজ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় স্থান পায়।

৩. ছাত্রবৃত্তি

স্বাধীন ত্রিপুরা ১১৫নং সেহা, ৪নং ১২৯৩ ত্রিপুরাব্দ সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের সার্টিফিকেট — শ্রী জগত চন্দ্র লস্কর, ১২৯৩ ত্রিং সনের নতুন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে পাঠশালার পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে পরীক্ষাত্তীর্ণ হওয়াতে তোমাকে ১২৯৪ ত্রিং সনের আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ২ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য বৃত্তি দেয়া গেল।

স্বাক্ষর
কামিনী কুমার মুখোপাধ্যায়
বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক

(সূত্র : Centenary Souvenir, Umakanta Academy.)

৪. ছাত্রবৃত্তি

১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা (২)

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
৪.	শ্রী মুকুন্দ চন্দ্র দাস	নতুন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়	উচ্চ বাঙ্গালা	৪	চারি বৎসর
৫.	শ্রী আলি আহাম্মদ	ঐ	ঐ	৪	ঐ

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক

৫. ছাত্রবৃত্তি

সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ৩১ শে শ্রাবণ

মেমো নং ৩ — এ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত হারে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের বৃত্তি	বার্ষিক বৃত্তির হার	মন্তব্য
২।	শ্রী আলীমুদ্দীন	আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী	বীরচন্দ্র বৃত্তি	১০	
৩।	শ্রী রামাকিঙ্কর সাহা	— ঐ —	স্থানীয় বৃত্তি	৮	

উপরোক্ত ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ১৩৩৬ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্ব স্ব বৃত্তি ভোগ করিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কলেজে ভর্তি হইয়া এ অফিসে রিপোর্ট করিলে সংসৃষ্ট প্রিন্সিপালের যোগে তাহাদের বৃত্তির টাকা প্রেরিত হইবে।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষা বিভাগ

শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা
প্রেসিডেন্ট

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ - ১৮৯)

৬. **১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উমাকান্ত একাডেমী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং 'ভিজিটরস্ বুক'-এ স্বহস্তে মন্তব্য লিখে (ইংরেজীতে) স্বাক্ষর করেন।**

সূত্র ঃ

১. Report on the Administration of the state of Tipperah (1890-91), Page - 35
২. Centenary Souvenir, U. K. Academy.
৩. — ঐ —
৪ রাজমালা, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ — ১২৯
৫. Tripura District Gazetteers. p - 317
৬ — do —, p - 313
৭ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ — ১৬
৮ Centenary Souvenir, Umakanta Academy
৯. — ঐ —
১০. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ — ১১
১১ Tripura State Administration Report, page - 23
১২. (i) Centenary Souvenr, U. K. Academy.
১২. (ii) Tripura State Administration Report, Page - 110
১৩. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, Page - 1056
১৪. Centenary Souvenir. U. K. Academy
১৫. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ — ১৬
১৬. Centenary Souvenir. U. K. Academy.
১৭. — ঐ —
১৮. Administration Report of Tripura State, Ranjit Kr. De, p - 44
১৯. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, p - 123
২০. — do — p - 152
২১. — do — p - 208
২২. — do — p - 334
২৩. — do — p - 477
২৪. Centenary Souvenir, U. K. Academy
২৫. Adm. Report, Mahadeb Chakraborty, p - 1197
২৬. জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা, পৃ — ১
২৭. Adm. Report, M. Chakraborty, p - 1611
২৮. — do —, p - 1695
২৯. জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা, পৃ ২
৩০. — ঐ — পৃ - ৫
৩১. Adm. Report, M. Chakraborty, p - 1611

রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (R. K. I.) কৈলাসহর (১)

কৈলাসহরের রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন অথবা সংক্ষেপে আর. কে. আই. স্কুলটি প্রাচীনত্বের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয়। ত্রিপুরায় প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডবলিউ. বি. পাওয়ার-এর প্রথম বার্ষিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টেই (১৮৭২ খ্রিঃ) আগরতলার স্কুলটির (বর্তমান উমাকান্ত একাডেমী) সঙ্গে কৈলাসহরের একটি স্কুলের উল্লেখ দেখা যায়। পাওয়ার সাহেব এই স্কুলটি কৈলাসহরের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট দ্বারা স্থাপিত হয় বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছেন— 'Another school was opened by the Deputy Superintendent at Koilashur.'[১] এই ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল কোর্টের আমিন ছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছায় ১৮৭২ সালে কৈলাসহর উপ-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২] পাওয়ার সাহেব ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে ঐ অঞ্চলে পরিদর্শন কালে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ঐ স্কুলে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন— 'I visited it several times while in that part of the country .....[৩]। কাজেই স্কুলটিকে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি যে যথেষ্ট ঔৎসুক্য নিয়েই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তা তাঁর দুটি রিপোর্ট থেকেই বুঝা যায়। প্রথম রিপোর্টটিতে তিনি আরো লিখেছেন— 'It promises well, and the number of scholars is on the increase. It opened with eight or nine, which number was trebled in a few months."

১৮৭২ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে স্কুলটির কখন প্রতিষ্ঠা হয় তা জানা না গেলেও ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে স্কুলটি ঠিক কখন থেকে চালু হয়েছিল, পাওয়ার সাহেব তা জানিয়ে দেন— "The school at Koilashur was opened in Aghran, 1282 T.E.[৪]" অর্থাৎ স্কুলটির জন্মকাল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাস। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, স্কুলটির জন্য মাসিক ১৫ টাকা করে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৮৭৪-৭৫ খ্রিঃ বর্ষে ক্যাপ্টেন ই. জি. লিলিংস্টোনের রিপোর্ট থেকে স্কুলটি সম্পর্কে আরো কিছু জানা যায়। ঐ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন ঐ স্কুলে কেবলমাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন —

'There is a school well attended and the master appeared to take pains with his pupils, but as there is only one master for the English and Vernacular Departments, it seemed to me that he could not alone do his duty by all the scholars, and I suggested to the Raja the advisibility of allowing a second master or a pandit.'[৫] স্কুলটি যে অবৈতনিক ছিল না, তারও উল্লেখ এই রিপোর্টে পাওয়া যায়— 'The school is supported by a contribution from the state of Rupees 180 per annum, which only serves for the payment of the school master's salary. The other expenses are met by what is obtained on account of schooling fees.'[৬]
পাওয়ার সাহেবের প্রথম রিপোর্টে স্কুলটি খোলার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা তিনগুণ হওয়ার সংবাদে স্কুলটির জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে। কিন্তু পরবর্তী বছরের রিপোর্টে আমরা স্কুলটি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পাই। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে পাওয়ার সাহেব উল্লেখ করেন যে, স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার সময়ে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টান করার আশঙ্কা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছিল।[৭] ফলে স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার সময়ে মাত্র ৮-৯ জন ছাত্র ছিল। এ কথা সত্যি যে, খ্রিস্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারে শিক্ষাকে একটা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। উইলিয়াম কেরী পরিচালিত শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন এই সুদূর চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যালয় চালাতেন। তাছাড়া কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ইয়ং বেঙ্গলের কার্যকলাপের কথাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। তাই ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের আশঙ্কা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তবে নব্যযুগের প্রতিভূ দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যে এই প্রতিবন্ধকতা খুব শীঘ্রই দূর হয়, তা ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ৪৬ জন হওয়া থেকেই বুঝা যায়। কৈলাসহরের কোথায় এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল, তা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিবরণীতে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর— কৈলাসহর বিভাগ' নামক গ্রন্থে। এতে তিনি লিখেছেন— 'এই বিদ্যালয় প্রথমতঃ দত্তগ্রাম মৌজায় স্থাপিত হইয়াছিল।'[৮] তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে আরো জানা যায় যে, ঐ স্কুলের প্রথম শিক্ষক ছিলেন চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
তবে স্কুলটি প্রথমে কি নামে অবহিত হতো, তা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের রিপোর্ট থেকে মেলে না। ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে স্কুলটিকে Kailashur Bengali and English School বলে দেখানো হয়েছে[৯]। আবার ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ খ্রিঃ) সনের একটি ছাত্রবৃত্তি সম্পর্কিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে স্কুলটিকে 'কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১০] তাই মনে হয় যে, দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার সময় যুবরাজের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেছিলেন এবং স্কুলটি যে স্থানে অবস্থিত তা যুবরাজনগর নামে পরিচিত হতে থাকে। অবশ্যি এটা নিতান্তই অনুমান মাত্র, এর স্বপক্ষে কোনো তথ্য মেলে না। যাই হউক, পরবর্তী সময়ে, খুব সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সনে, বর্তমানে রবীন্দ্রকানন তথা

পূর্বের টাউন মাঠের উত্তরপার্শ্বের ছোট পুকুরটির দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩২৭ ত্রিং (১৯১৭ খ্রিঃ) সনে জনৈক কানু মিঞার দান করা জমিতে বর্তমান অবস্থানে (বৌলপাশা মৌজা) চলে আসে।[১১] কৈলাসহরের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ দেব এই তথ্যটি সেটেলমেন্ট থেকে সংগৃহীত করেছেন বলে দাবী করেছেন।

কৈলাসহরের এই স্কুলটি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই তথ্য ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও স্কুলটির অস্তিত্ব এর আগেও ছিল বলে জনশ্রুতি বিদ্যমান। এ বিষয়ে শ্রী বিক্রমজিৎ দেবের বিবরণ এই যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কৈলাসহরের যুবরাজনগরে 'যুবরাজনগর এল. ই. স্কুল' নামে একটি স্কুল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সৌকত আলী চৌধুরী ও টুকু মিঞা স্থাপন করেন। স্কুলটি ইনফ্যান্ট ক্লাস দিয়ে শুরু হয় এবং প্রথম অবস্থায় পাঁচজন ছাত্র পাওয়া গিয়েছিল। পরে যখন দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত কৈলাসহরের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই স্কুলটিকে সরকারী স্কুল বলে ঘোষণা দেন (অর্থাৎ ঐ বছরের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাসে)। শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ দেব স্কুলটির প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাস ঁরবীন্দ্রনাথ ঘোষ (যিনি এই স্কুলে ১৯০৩ থেকে ১৯১১ খ্রিঃ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন) এবং ঁ মনীন্দ্রনারায়ণ বোস (যিনি এই স্কুলে ১৯০৪ থেকে ১৯১২ খ্রিঃ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন)-এর কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেন বলে দাবী করেন।[১২]

এই জনশ্রুতির পেছনে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি আছে কিনা, তা তলিয়ে দেখা যাক। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর - কৈলাসহর বিভাগ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির রচনাকাল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনি লিখেছেন — '(কৈলাসহর বিভাগে) প্রাচীন বসতিযুক্ত কোনো মৌজা নাই, ... বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত কৈলাসহর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিযুক্ত হওয়ার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতে হিন্দু মাহিষ্যদাস, মালী, ঢুলি, নমঃশূদ্র, পাটনী, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি শ্রেণীর বহুলোক নিকটবর্তী শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে কৈলাসহরে আসিয়া এই বিভাগে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে'[১৩]। এ থেকে মনে হতেই পারে যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগে কৈলাসহরে কোনো বসতি ছিল না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৈলাসহরে মোটামুটি একটা উন্নত বসতি না থাকলে সেখানে ঐ বিভাগের সদরকেন্দ্র স্থাপন করা হতো না। ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট লিলিংস্টোনও সেখানে একটি ক্ষুদ্র জনবসতি দেখেছেন— 'Koilashur is a very small, unpretending village, prettily situated at the foot of the lower range of the hills.[১৪]' ঐ সময়ে এখানে শুধু অফিসঘর, স্কুল অথবা জেলখানাই নয়, এই জনবসতির জন্য একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডিসপেনসারিও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। এটা অনস্বীকার্য যে, শুধুমাত্র কৈলাসহর অঞ্চলই নয়, সমগ্র উপ-বিভাগটির সর্বাত্মক উন্নতির একমাত্র রূপকার ছিলেন এই ব্রিটিশ কর্মচারী দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও কৈলাসহরে প্রাচীন বসতির উল্লেখ করেছেন। তিনি কৈলাসহর টাউনে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বসতির

অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যার মধ্যে চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয়রা দুইশত বছর আগে থেকেই এখানে আছেন। এছাড়াও তিনি কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত কিছু ক্ষত্রিয় পরিবারেরও উল্লেখ করেছেন।
ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট সি. ডবলিউ. বোল্টন (২৬/৪/১৮৭৭-২৮/১০/১৮৭৮) কৈলাসহরকে রাজ্যের অন্যতম একটি গ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২] তাই বলা যেতেই পারে যে, কৈলাসহরে রাজ্যের উত্তরাঞ্চল বিভাগের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগেই জনবসতি ছিল। পাওয়ার সাহেবের ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে স্কুলের ছাত্রদের জাতিগত পরিসংখ্যান না থাকলেও দ্বিতীয় রিপোর্টে (১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ) এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ঐ বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ বর্ষে কৈলাসহরের এই স্কুলটিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৬ জন। এদের মধ্যে ২২ জন হিন্দু, ১৬ জন মণিপুরী, ৬ জন মুসলমান, ১ জন গোর্খা এবং ১ জন অসমিয়া ছাত্র। এ থেকে আমরা কৈলাসহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জনবসতির গোষ্ঠীভিত্তিক একটা চিত্র পাই। ঐ সময়ে বাঙালী হিন্দু ও মণিপুরী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাই প্রধান ছিল, তা এই পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়। তবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও তুলনায় যে কম ছিল তা নয়, বরং বেশিই ছিল। এদের নিজস্ব মক্তব থাকায় স্বাভাবিক কারণেই স্কুলে মুসলমান ছাত্র কম ছিল। ১৮৭৫-৭৬ সালের জনগণনা থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে সমগ্র কৈলাসহর বিভাগে ১৮১৫ জন হিন্দু, ২১৬৯ জন মুসলমান ও ১৭১০ জন মণিপুরী ছিলেন।[১৩] এই জনগোষ্ঠীরা প্রধানতঃ কৈলাসহর, কমলপুর ও ধর্মনগরে সীমাবদ্ধ ছিল। কৈলাসহরে যে যথেষ্ট পরিমাণে মণিপুরী সম্প্রদায়ের বাস ছিল, তা ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের গ্রন্থে সমর্থন মেলে। এই মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ সচেতন ছিলেন, ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ মেলে। কৈলাসহরের হরিপদ ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে আনুমানিক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কৈলাসহরেরই বিদ্যানগর গ্রামে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে মণিপুরী গোষ্ঠীভুক্ত বিদ্যানুরাগিণী শ্রীমতী জানকী দেবীর একটি পাঠশালা চালু করার কথা শুনিয়েছেন, যা পরিবর্তিত রূপে বর্তমানে বিদ্যানগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত।[১৪]

এছাড়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেরও আগে থেকেই এই কৈলাসহর জনপদ ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে পার্বত্য ত্রিপুরার আমদানি-রপ্তানির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তাই ১৮৭২ সালের আগেও এখানে দেশীয় পাঠশালা থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস না থাকার কারণে কৈলাসহরের এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাস বলে ধরে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কৈলাসহরের এই স্কুলটি ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকায় দিন দিন এই স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি যে ঘটছিল তা পলিটিক্যাল এজেন্টদের প্রতিটি বিবরণীতেই পাওয়া যায়। ১৮৭৯-৮০ বর্ষের বিবরণীতে স্পষ্ট লেখা আছে— "The next important institution

(অর্থাৎ আগরতলার স্কুলটি বাদে) is that of Koilashar, in which the sub-divisional officer takes considerable interest and in which therefore work is done regularly and with care.[১৮]"

আগরতলার স্কুলটির মতোই সূচনালগ্ন থেকে কৈলাসহরের এই স্কুলটিতে বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মোট ৪৬ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৬ জন ছাত্র ইংরেজী পড়ত। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই ইংরেজী শিক্ষার্থীদের সবাই স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবার ও অফিসের কর্মচারীদের সন্তান। পরবর্তী বছরের বিবরণীতে ইংরেজী বিদ্যার্থীদের সংখ্যা বেড়ে ১০ জন হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, ঐ অঞ্চলে ইংরেজী ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল।

১৮৮৬-৮৭ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে আগরতলা, সোনামুড়া ও কৈলাসহরের স্কুল এই তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল— 'The Agartala school and the sub-divisional schools of Koylashar and Sonamura are held with regularity. The rest of the institutions are ephemeral patshalas'.[১৯]

অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরায় কেবলমাত্র একটি স্কুলই ছিল যাতে ছাত্ররা তুলনায় বেশি পড়তে পারত। ফলে স্বাভাবিক কারণেই স্কুলটিকে অন্ততঃ মাইনর পর্যায়ে উন্নত করার দাবী এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে উঠে আসে।

সূত্র ঃ

১. Administration Report of political Agency, Hill Tipperah, Vol - I, page — 29
২. — do — , page - 30
৩. — do —, page - 29
৪. — do —, page - 46
৫. — do —, page - 56
৬. — do —, page - 67
৭. — do —, page - 46
৮. ত্রিপুরা রাজ্যে দশ বছর — কৈলাসহর, পৃ - ১২
৯. Administration Report of Pol. Agency, Hill Tipperala, Vol-I, page - 89
১০. রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১
১১. আর. কে. আই. — এর শতবর্ষ ঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, বিক্রমজিৎ দেব, দৈনিক সংবাদ, ১৯/১/০২ ইং
১২. — ঐ —
১৩. ত্রিপুরা রাজ্যে দশ বছর, কৈলাসহর, পৃ - ৩
১৪. Administration Report of pol. Agency, Hill Tipperah, Vol - I, page - 56.
১৫. — do — page - 121
১৬. — do — page - 96
১৭. কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণী (১), হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, ৯ / ৮ / ০৩ইং
১৮. Adm. Report of pol Agency, Hill Tipperah, Vol-II, page - 58
১৯. — do —, page — 207

রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (R.K.I), কৈলাসহর (২)

১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ বর্ষ থেকে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা শিক্ষাব্যবস্থাকে মারাত্মক ভাবে ব্যাহত করে, যার কারণে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে অন্ততঃ ১৮৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত কৈলাসহর স্কুলটির মাইনর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সহকারী ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসের মন্ত্রীপদে নিযুক্তি এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রক্রিয়া আবার চালু হয়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর — কৈলাসহর বিভাগ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে— '১৩০২ ত্রিপুরাব্দের ১৯শে চৈত্র (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শুরুতে) হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র কর ঐ স্কুলের হেড মাস্টার পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১] ত্রিপুরা রাজ্যে তখন পাঠশালা এবং এল. ভি. স্কুলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকলেও সরকারী ভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত কোনো প্রধান শিক্ষক পদের সংস্থান ছিল না। মধ্য ইংরেজী (M. E.) অথবা উচ্চ ইংরেজী (H.E.) স্কুলেই হেড মাস্টার পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হত। তাই শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের প্রদত্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, স্কুলটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শুরুতে মধ্য ইংরেজী অর্থাৎ মাইনর স্কুলে রূপান্তরিত হয়। হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যখন একবার কৈলাসহরে আসেন, তখন স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধে অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি অঞ্চলে অর্থাৎ বৌলপাশায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়।[২] আবার শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ দেবের মতে, বর্তমান রবীন্দ্রকানন তথা পূর্বের টাউন মাঠের উত্তর পার্শ্বে ছোট পুকুরটির দক্ষিণদিকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজনগর থেকে স্কুলটির স্থানান্তরিত হওয়ার সময়েই তা এম. ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়।[৩] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই তথ্যের সঙ্গে পূর্বের অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিলে যায়।

মাইনর পর্যায় অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ গড়ে উঠায় কৈলাসহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আরো উচ্চশিক্ষা লাভের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু ঐ সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে

আগরতলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি (বর্তমান উমাকান্ত একাডেমী) ছাড়া অন্যত্র আর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে আগরতলার সঙ্গে কৈলাসহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্ট প্রতিকূল। আগরতলা থেকে কৈলাসহরে ব্রিটিশ ভারতের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হতো। তাই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানত, শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লার উপরই অধিক নির্ভর করতে হতো। ফলে উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ ছিল নিতান্তই সংকুচিত, সাধারণের নাগালের বাইরে। তাই কৈলাসহরের এই স্কুলটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে উন্নীত করার দাবীও ক্রমশ গড়ে উঠে।

১৩১৩ ত্রিং সনের এড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরের শেষভাগে ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কৈলাসহর ভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণের দাবীতে স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী (Higher English) School-এ উন্নীত করা হয় এবং স্কুলটিতে সরকারী অনুদান (বার্ষিক) ৭৭৪টা থেকে বাড়িয়ে ১২০০ টাকা করা হয়।[৪]

১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে এই স্কুল প্রসঙ্গে লেখা আছে—"During the year under report the Middle English School at Kailashahar was raised to the status of a High Englsih School." ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে এ বিষয়ে লেখা হয়— "The latter (Kailashahar Higher English School) was formerly a Middle English School and its status was raised last year in response to the earnest wishes of the local residents. There were, however, no student in the entrance class last year and the school has not yet been affiliated to the Calcutta University.[৫]" এই প্রসঙ্গে শ্রী বিক্রমজিৎ দেব জানিয়েছেন যে, বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাস তাকে একটি পুরাতন নথি দেখান, যাতে 'স্থাপিত ১৩১৩ ত্রিং' লেখাযুক্ত একটি সীল (seal) ছিল। সম্ভবত এই প্রাচীন নথিটিকে ভিত্তি করেই ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে আর. কে. আই-এর শতবর্ষ পালন করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন না পাওয়ার কারণেই স্কুলটি পরবর্তী বছরগুলিতে রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমীর ব্রাঞ্চ স্কুল হিসেবে কাজ করতে থাকে।

১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায়, স্কুলটিতে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে— "The branch school at Kailashahar is the former Entrance school in reduced condition. It now teaches upto the 3rd class standard of an Entrance School.[৬]" অর্থাৎ উৎসাহী ছাত্রদের আগরতলার উমাকান্ত একাডেমীতে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হতো। ১৩১৯ (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে কৈলাসহরের স্কুলটির সঙ্গে ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস যুক্ত ছিল— "Both the Bilonia and Kailashahar Branches also had

boardings attached to them.[৭]”

কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে অভিপ্রেত না হওয়ায় ধীরে ধীরে স্কুলটিতে প্রথমে নবম শ্রেণী এবং পরে দশম শ্রেণী চালু করা হয়। ১৩২৫ ত্রিং (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায়— “To meet the local demand for higher education. matriculation classes have been opened in the branch schools at Bilonia and Kailashahar.[৮]” কিন্তু তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন পত্র পাঠানো হয়নি। ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় ঐ বছর বিলোনীয়ার B.K.I স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহরের ব্রাঞ্চ স্কুলটিকেও উচ্চ ইংরেজী (H.E.) স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং এইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য আবেদনও করা হয়ে গেছে। স্কুলটির উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীতকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটির ‘রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন’ নামকরণ যে একই সঙ্গে করা হয়েছে, তার প্রমাণ হয় ১৩২৬ ত্রিং সনের রিপোর্টে এই নামের সর্বপ্রথম ব্যবহারে।

পরবর্তী বছরে স্কুলটি দুই বছরের জন্য সাময়িক অনুমোদন পেলেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী পাঠাতে সক্ষম হয় নি। ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮ - ১৯ খ্রিঃ) সনেই রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্বপ্রথম পরীক্ষার্থী পাঠায়। ঐ বছরে স্কুলটি থেকে ১২ জন ছাত্র পাঠানো হয়, যার মধ্যে ৩ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে।[৯] ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আশেপাশের অঞ্চলের ছাত্রদের জন্য আর. কে. আই. স্কুলে হিন্দু, মণিপুরী এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি বোর্ডিং খোলা হয়। এছাড়াও এই স্কুলের তত্ত্বাবধানে কুকী ছাত্রদের জন্য একটি প্রাইভেট বোর্ডিং কৈলাসহরে চালু করা হয়।[১০] কয়েক বছর সাময়িক অনুমোদন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টরের স্কুল-পরিদর্শনের পর ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদন লাভ করে।[১১]

১৩৪৫ ত্রিং (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্ট থেকে একটি বিশেষ ঘটনার খবর পাওয়া যায়। ঐ বছর কৈলাসহর স্কুলটি থেকে একজন মহিলা-পরীক্ষার্থী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে— “Besides these two female candidate - one private and the other from Kailashahar B. K. Institution, where co-education was allowed, sat for the same.[১২]” এক্ষেত্রে B. K. Institution না হয়ে অবশ্যিই R. K. Institution হবে, ভুলটি নিশ্চিত ভাবেই মুদ্রণজনিত, কারণ কৈলাসহরের H.E. স্কুল একটিই— এবং তার নাম রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি থেকে জানা যায়, কৈলাসহরের স্কুলটিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যা রাজ্যের অন্য কোথাও, এমন কি রাজধানীতেও ঐ সময়ে চালু ছিল না। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন

ছাত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্তী লিখেছেন— "ত্রিশ দশকের শেষদিকে রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশনে মেয়েদেরও শিক্ষা চালু করা হয়। ফলে প্রচুর সংখ্যক মেয়ে এই স্কুলে ভর্তি হয়ে মেট্রিক পাশ করে বিভিন্ন সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাস করা হত।[১৩]"

পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, তবে প্রাইভেট মহিলা-পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উল্লেখ আছে। তাই মনে হয়, এই চেষ্টা সম্ভবত ছিল অনেকটা বেসরকারী স্তরের, ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল এই মহিলা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের মূল ভিত্তি। এই উদ্যোগের ফলে কৈলাসহরে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী মজুমদার মেয়েদের মধ্যে প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন।

আর. কে. আই স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় প্রথম প্রধান শিক্ষক কে ছিলেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, ১৩২৬ ত্রিং সনে (১৯১৬ - ১৭ খ্রিঃ) স্কুলটি যখন এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয় তখন শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন।[১৪]

এন্ট্রান্স পরীক্ষা ঃ রাজন্য আমলে আর. কে. আই-এর সাফল্যের খতিয়ান

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সাফল্যের হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট	
১৩২৮ (১৯১৮ - ১৯ ইং)	১২	৩	৩	০	৬	৫০
১৩২৯ (১৯১৯ - ২০ ইং)	১১	৯	২	০	১১	১০০
১৩৩০ (১৯২০ - ২১ ইং)	১২	১১	১	০	১২	১০০
১৩৩১ (১৯২১ - ২২ ইং)	১৪	১১	৩	০	১৪	১০০
১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ইং)	১২	৯	৩	০	১২	১০০
১৩৩৪ (১৯২৪ - ২৫ ইং)	১৮	১১	৫	০	১৬	৮৮৯
১৩৩৫ (১৯২৫ - ২৬ ইং)	১১	১	৪	১	৬	৫৪৫
১৩৩৬ (১৯২৬ - ২৭ ইং)	১০	৬	১	০	৭	৭০
১৩৩৭ (১৯২৭ - ২৮ইং)	৯	২	৩	২	৭	৭৭৮
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ ইং)	১২	৭	২	০	৯	৭৫
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ ইং)	১১	৪	২	২	৮	৭২৭
১৩৪১ (১৯৩১ - ৩২ ইং)	১৪	৭	৫	১	১৩	৯২৯
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ ইং)	১০	৫	২	০	৭	৭০
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ ইং)	১০	৫	৩	১	৯	৯০
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ ইং)	১২	৩	৭	১	১১	৯১৭
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ ইং)	২০	৪	২	৪	১০	৫০
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ ইং)	১১	২	৭	১	১০	৯০৯

১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ ইং)	২৬	৩	১৬	৪	২৩	৮৮৫
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ ইং)	১৮	৪	৫	১	১০	৫৫৫
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ ইং)	৭	০	১	৩	৪	৫৭১
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ ইং)	১৩	৪	১	১	৬	৪৬২
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ ইং)	২৪	১	৩	১৬	২০	৮৩৩
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ ইং)	১২	২	২	৬	১০	৮৩৩
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ ইং)	১৫	১	২	৮	১১	৭৩৩
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ ইং)	১৬	৪	৪	৫	১৩	৮১৩

দ্রঃ উপরোক্ত তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

* ১৩৪৩ — এই স্কুলের একজন ছাত্র রাজ্যে তৃতীয় হয়।
* ১৩৪৬ — একজন ছাত্র দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।
* ১৩৪৭— একজন ছাত্র দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।
* ১৩৪৮— একজন ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে।
* ১৩৫০ — রাজ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পায়।
* ১৩৫৩ — দ্বিতীয় স্থান পায়।
* ১৩৫৫ — একজন ছাত্র প্রথম স্থান লাভ করে।

সংযোজন

ছাত্রবৃত্তি

১. ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১.	শ্রী কৈলাস চন্দ্র সেন	কৈলাসহর যুবরাজ্য স্কুল	মাইনর ছাত্রবৃত্তি	৫	তিন বৎসর
৯.	শ্রী প্যারীমোহন দাস	কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল	নিম্ন বাঙ্গালা	৩	দুই বৎসর

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

(উৎস ঃ রাজন্যী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (R. K. I.) কৈলাসহর (২)

ADVERTISEMENT

2. WANTED a Game teacher for R. K. Institution, Kailashahar on Rs. 20/- per mensem who will also be required to perform the clerical duties of the school.

The candidate must be a good sportsman having knowledge of Scouting and Drill. Applications should reach the undersigned on or before the 25th Ashadh, 1339 T.E.

S. C. Dev Barman
Officer in-charge
Education Department
Tripura State.

অষ্টাবিংশ ভাগ, পঞ্চম সংখ্যা,
আষাঢ় - ১ম পক্ষ, ১৩৩৯ ত্রিং
(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৯৯)

ছাত্রবৃত্তি

৩. **সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ৩১ শে শ্রাবণ**

মেমো নং ৩ — এ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত হারে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের বৃত্তি	বার্ষিক বৃত্তির হার	মন্তব্য
৪.	শ্রী উপেন্দ্র কুমার দাস	কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন	স্থানীয় বৃত্তি	৮্	

উপরিউক্ত ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ১৩৩৬ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্ব - স্ব বৃত্তি ভোগ করিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কলেজে ভর্তি হইয়া এ অফিসে রিপোর্ট করিলে সংসৃষ্ট প্রিন্সিপালের যোগে তাহাদের বৃত্তির টাকা প্রেরিত হইবে।

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষাবিভাগ

শ্রী নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা
প্রেসিডেন্ট

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৮৯)

ছাত্রবৃত্তি

ম্যাট্রিকুলেশন বৃত্তি

মেমো নং - ৫

৪.

১৯৩৪ ইং সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এই রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করায় নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা যায়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ ১৩৪৪ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরকাল উক্ত বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে। কলেজে ভর্তি হইয়া প্রিন্সিপালের যোগে আবেদন প্রেরিত হইলে বৃত্তির টাকা যথারীতি মঞ্জুরক্রমে প্রেরিত হইবে। ইতি। সন ১৩৪৪ ত্রিং তারিখ ২৮ শে শ্রাবণ।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	মাসিক বৃত্তির হার	যত বৎসর	মন্তব্য
৩.	শ্রী শম্ভুচন্দ্র মজুমদার	কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন	৮	দুই বৎসর	সাধারণ

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান, শিক্ষাবিভাগ
২৮/৪/৪৪ ত্রিং

শ্রী জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন,
মন্ত্রী
১৪/৪/৪৪ ত্রিং

তথ্যসূত্র ঃ

১. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর, কৈলাসহর বিভাগ, পৃ - ১২
২. কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (১), হরিদপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, ৯ / ৮ / ২০০৩ ইং
৩. আর কে. আই-এর শতবর্ষ, বিক্রমজিৎ দেব, দৈনিক সংবাদ, ১৯ / ১/ ২০০২ ইং
৪. Administration Report of Tripura State, Edited by Mahadeb Chakraborty, Vol - 1, page - 107
৫. — do —, page - 151
৬. — do —, page - 206
৭. — do —, page - 268
৮. — do —, Vol - II, page - 588
৯. The Administration Report of Tripura State (for the year 1894 - 95, 1914 - 15 & 1918 - 19), page - 157.
১০. Adm. Report of Tripura State (Mahadeb Chakraborty) Vol - II, page - 894
১১. — do —, Vol - III, page - 994
১২. — do —, Vol - IV, page - 1864.
১৩. শতবর্ষের আলোকে কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন, স্যন্দন পত্রিকা, ৩ / ১ / ২০০২ ইং
১৪. — ঐ —

নবদ্বীপ চন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন (N.C.I), সোনামুড়া

সোনামুড়ার নবদ্বীপচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন রাজ্যের স্কুলগুলির মধ্যে চতুর্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এর চেয়ে অর্বাচীন বেশ কিছু স্কুলের শতবর্ষ পালিত হলেও এই স্কুলটির প্রাচীনত্ব এখনও সরকারীভাবে মেনে নেওয়া হয় নি।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যে হস্তক্ষেপের ফলে যে সংস্কার ক্রিয়া শুরু হয়, তারই জের ধরে পার্বত্য ত্রিপুরাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। ১৮৭২ সালে সমগ্র উত্তর ত্রিপুরাকে একটি বিভাগে পরিণত করে কৈলাসহরে এর সদর কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং এই বিভাগের দায়িত্ব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্মরত ব্রিটিশ কর্মচারী শ্রীযুক্ত দুগাপ্রসাদ গুপ্তকে এনে তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয়। দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ব্রিটিশ এলাকার মতই প্রতিটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে শিক্ষা প্রসারণ নীতি অনুসারে অফিস, আদালত, জেলখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন, যা বর্তমানে আর. কে. আই নামে খ্যাত। একই ভাবে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার সাব-রেজিস্ট্রার নীলমণি দাস ত্রিপুরার দেওয়ান হওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে উদয়পুর বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। এ প্রসঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর 'রাজমালা'-য় লিখেছেন— "তিনি (অর্থাৎ নীলমণি দাস) দেওয়ানী ও ফৌজদারি সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে 'উদয়পুর' বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, বাবু উদয়চন্দ্র সেনকে তাহার শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন।"[১] ১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে ক্যাপ্টেন ই. জি. লিলিংস্টোন এ বিষয়ে লিখেছেন— "and I am happy to report that the Raja has lately caused a new sub-division to be created, having its head-quarters at Odeypoor, a days journey due east of Comillah, and has appointed to the charge of it a late Government servant, a man well spoken of.[২]" ক্যাপ্টেন লিলিংস্টোন তার রিপোর্টে এই বিভাগের সদরকেন্দ্র হিসেবে উদয়পুরকে উল্লেখ করলেও পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে সোনামুড়াকে সদরকেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়। এর কারণ আমরা কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থে পাই— 'কিন্তু উদয়পুর বর্ষাকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য সোনামুড়া নামক স্থানে সদর

স্টেশন স্থাপন করা হইল।"[৩] লিলিংস্টোনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে এই বিভাগটি সৃষ্টি করা হয়। শীতকালে উদয়পুরের আবহাওয়া অনুকূল থাকায় প্রথমে উদয়পুরেই সদর কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, কিন্তু বর্ষাকালে অবস্থা প্রতিকূল দেখে তা সোনামুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয় বলে মনে হয়। তবে শীতকালে উদয়পুরে যে, অন্ততঃ প্রথমভাগে, তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তার প্রমাণ ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টবর্ষে পলিটিক্যাল এজেন্ট টি. ই. কক্সহেড-এর বার্ষিক বিবরণীতে মেলে— 'A dispensary is to be opened at Udaypore on the removal there of the Deputy Magistrate from Sonamura at the commencement of the cold season.[৪]" এই অবস্থা চালু থাকলেও সদরকেন্দ্র মূলত সোনামুড়াতে থাকার কারণে পরবর্তী কালে এই বিভাগটিকে উদয়পুর বিভাগের পরিবর্তে 'সোনামুড়া বিভাগ' বলে উল্লেখ করা হতে থাকে।

সোনামুড়ায় সদরকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে কৈলাসহরের মত এখানেও যে একটি পাঠশালা গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিবরণীতে এই পাঠশালাটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য মেলে না। ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে রাজ্যে মাত্র দুটি স্কুল এবং দুটি পাঠশালা ছিল। স্কুল দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে আগরতলার ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয়টি এবং অপরটি হচ্ছে কৈলাসহরে। দুটি পাঠশালার একটি আগরতলায়, যেটি যুবরাজ বাহাদুর রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে কেবলমাত্র ঠাকুর সম্প্রদায় এবং রাজভৃত্যদের জন্য চালু করেন। এই রিপোর্টে দ্বিতীয় যে পাঠশালার উল্লেখ আছে, তা হল ফেণী নদীর তীরে আমলিঘাটের পাঠশালাটি, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেওয়ান নীলমণি দাস যার দ্বারোদঘাটন করেন।[৫] কিন্তু এইখানেই খট্‌কা লাগে এই যে, বিভাগীয় সদরকেন্দ্রে কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠা না করেই অন্যত্র কিভাবে পাঠশালার প্রতিষ্ঠা গুরুত্ব পায় ?

এই বিবরণীতে শিক্ষা-সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের শেষভাগে দেখা যায়— "The Udaypore Deputy Magistrate will, he says, make efforts to introduce plough cultivation in some parts of his jurisdiction, and if his efforts are attended with success, the establishment of a hill pathsala or two may follow."[৬] নব্যযুগের মন্ত্রে দীক্ষিত, ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত এই উদয়চন্দ্র সেন ত্রিপুরার পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের চাবিকাঠি যে জুমচাষের পরিবর্তে লাঙলচাষের মধ্যেই নিহিত আছে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং সম্ভবত তিনিই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, লাঙলচাষের মাধ্যমে উপজাতিদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম, যিনি তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে যার এত আগ্রহ, তিনি বিভাগীয় কেন্দ্র সোনামুড়ায় কোনো

বিদ্যালয় অথবা নিদেনপক্ষে একটি পাঠশালাও স্থাপন করবেন না, তা কি সম্ভব ? এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী লাইনেই আমরা দেখি— "In course of the ensuing cold weather a new school is to be opened at Udaypore, besides two pathsalas in the plains, within the Udaypore Sub-divisional Officer's jurisdiction." এ থেকে বুঝা যায় যে, উদয়পুরে তখনও পাঠশালা চালু হয় নি, অথচ উদয়পুর বিভাগের সমতল অঞ্চলে দুটি পাঠশালা চালু হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি আমলিঘাটে, কাজেই এটা নিশ্চিত যে, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সোনামুড়ায় সদরকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহরের মতো এখানেও একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত একটি পরিসংখ্যানগত তথ্যে উদয়পুর বিভাগে একটি বাংলা পাঠশালা দেখানো হয়েছে। এই পাঠশালাটি সোনামুড়ার পাঠশালা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমলিঘাটের পাঠশালাটি সবেমাত্র খোলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টরা সাধারণত শীতকালেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের শেষভাগে, অর্থাৎ মার্চ মাসে তিনি সোনামুড়া পরির্শন করেন।[৭] শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি সরাসরি বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হওয়ায় পরিসংখ্যান সারণীতে উদয়পুর বিভাগের যে স্কুলটির অর্থাৎ বাংলা পাঠশালার উল্লেখ আছে, তা সোনামুড়ায় অবস্থিত পাঠশালা বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পাঠশালাটিতে মাত্র ১২ জন ছাত্র ছিল এবং তারা সবাই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।[৮] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে সোনামুড়ার কোনো হিন্দু বসতিই ছিল না। এখনও সোনামুড়া শহরের আশেপাশে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যথেষ্ট।

পরবর্তী বছরগুলিতে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যেতে থাকলেও আগরতলা ও কৈলাসহরের স্কুল ছাড়া অন্য কোনো স্কুলের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সোনামুড়ার এই পাঠশালাটির সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮০-৮১ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে— 'Of the schools of the state, those of Agurtollah, Kailashar, and Sonamura are slowly improving ; the rest are more or less ephemeral.[৯]" অর্থাৎ রাজ্যে তখন রাজধানী এবং দুটি বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুল — তিনটিই প্রধান ছিল। বিবরণীর সঙ্গে পরিসংখ্যানগত তথ্য খুঁজে না পাওয়ার কারণে স্কুলটি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তবে বিভাগীয় কেন্দ্রে থাকায় এর উপর যে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট নজর ছিল তা ১৮৮২-৮৩ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে পাওয়া যায়— "The Kailashar and Sonamura schools are immediately before the eyes of the Sub-divisional Officers, who take interest in them.[১০]"

আগরতলা ও কৈলাসহরের স্কুলের মত সোনামুড়ার এই স্কুলটিতেও ইংরেজী পড়ানোর ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে দেখা যায়—"with the exception

of the schools at Agartala, Sonamura and Koylashar, in which some English is taught, all of these institutions are elemenatary vernacular patshalas.[১১]" অর্থাৎ সোনামুড়ার এই স্কুলটি আগরতলা ও কৈলাসহরের স্কুলদুটির সমকক্ষ না হলেও বিভাগীয় স্কুল হওয়ার কারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে স্কুলের সংখ্যা ১৬-তে নেমে এলেও রাজধানী ও বিভাগীয় সদরকেন্দ্রের স্কুলগুলির কোনো সমস্যা ছিল না। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা কমে ১৬-তে পৌছায়, তখন এই স্কুলগুলি সম্পর্কে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'The Agartala school and the Sub-divisional schools of Koylashar and Sonamura are held with regularity.[১২]" ১৮৯৮-৯৯ সনের বার্ষিক বিবরণী এবং তার পরবর্তী রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ের আগেই সোনামুড়ার এই স্কুলটি এম. ই. (মধ্য ইংরেজী) অর্থাৎ মাইনর পর্যায়ে (বর্তমান কালের ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) উন্নীত হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত এই সাত বছরের বিবরণীর মধ্যে কেবলমাত্র ১৮৯৪-৯৫ (১৩০৪ ত্রিং) বর্ষের বার্ষিক বিবরণী পাওয়া গেছে। তাই ঐ সময়ের মধ্যে কখন সোনামুড়ার স্কুলটি এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়।

অন্ততঃ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্কুলটির অগ্রগতির ধারা মোটামুটি ভাবে ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু এরপর থেকেই অন্যান্য বিভাগের সদরকেন্দ্রের স্কুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সোনামুড়ার এই স্কুলটি যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে।১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৈলাসহর ও বিলোনীয়ার স্কুল দুটি রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমীর ফিডার স্কুল হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করে। সম্ভবত ব্রিটিশ শাসনাধীন কুমিল্লা শহর সোনামুড়ার খুব কাছাকাছি থাকায় উচ্চ শিক্ষালাভে উৎসুক শিক্ষার্থীরা সেখানে সহজেই পড়া চালিয়ে যেতে পারতো এবং এই কারণেই অন্যান্য অঞ্চলের মত এলাকার জনসাধারণের দাবী ততটা জোরালো ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চল মুসলমান -প্রধান হওয়ায় তুলনায় মাদ্রাসা স্কুলে পড়ার আগ্রহ ছিল বেশি। যাই হউক, ১৩২২ ত্রিং (১৯১২-১৩ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময় থেকে স্কুলটিকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে আরো শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে—" The teaching staff of the Sonamura Middle English School was strengthened during the year by the appointment of two new teachers.[১৩]" এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) সনে স্কুলটিতে একটি উচ্চতর (অর্থাৎ সপ্তম) শ্রেণী খোলা হয়— "The M. E. School at Sonamura has had a upper class added to it and it is expected the ere long this school will also be a H. E. School.[১৪]" পরের বছর স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণী খোলা হয় এবং তা উমাকান্ত একাডেমীর ফিডার স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় (তৎকালীন সময়ে ফিডার স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্ররা পড়তো) — '..... the M. E. School at Sonamura having been converted into a feeder

school to the U. K. Academy.[১৫]' তিন বছর ফিডার স্কুল হিসেবে থাকার পর স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১ খ্রিঃ) সনে স্কুলটিতে নবম শ্রেণী খোলা হয়— 'Besides these, there were 2 feeder schools teaching upto class VIII at Sonamura and Dharmanagar. Class IX has been added to both of them at the beginning of the academic session of the year.[১৬]' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় পরবর্তী বছরে দশম শ্রেণী খোলা সম্ভব হয় নি। ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩ - ২৪ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছর থেকে স্কুলটি অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ ইংরেজী অর্থাৎ এন্ট্রান্স স্কুল হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে— 'The feeder school at Sonamura was allowed to open the Matriculation class (অর্থাৎ দশম শ্রেণী) and the Calcutta University was pleased to grant it provisional recognition for two year with effect from 1924 A.D. The teaching staff was considerably strengthened so as to suit the requirements of a fullfledged High School.[১৭]' স্কুলটির এন্ট্রান্স স্কুলে উন্নীতকরণের জন্য যে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তার প্রমাণ মেলে স্কুল ও বোর্ডিং-এর নির্মাণকার্যের জন্য খরচের সিংহভাগ তাদের বহন করার মাধ্যমে। ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায়— "The building of the Sonamura High School and the Boarding houses attached thereto were under construction and the expenditure in this connection was mainly bourne by the public.[১৮]'

ঐ বছরেরই শেষভাগে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সোনামুড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম ৭ জন পরীক্ষার্থী পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ৬ জন উত্তীর্ণ হয় (১ জন প্রথম বিভাগে, ৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে)। ১৩৩৫ ত্রিং (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে স্কুলটির নতুন দালানঘর প্রস্তুত না হলেও বোর্ডিং-এর নির্মাণকার্য শেষ বলে জানানো হয়েছে।[১৯] ১৩৩৬ ত্রিং (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ) সনের বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায়— 'The Construction of building of the Sonamura H. E. School was complete. That of a corrugated iron structure for the infant classes and also of a tiffin shed, likewise with corrugated iron roof, was on the verge of completion.[২০]' অর্থাৎ স্কুলটিতে ইন্‌ফ্যান্ট অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই বিবরণীতে আরো জানা যায় যে, ১৩৩৬ ত্রিং (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ) থেকেই স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) স্থায়ী অনুমাদন লাভ করে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭ - ২৮ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছরে স্কুলটির নতুন নামকরণ হয়েছে— 'The H. E. School at Sonamura was named Navadwip Chandra Institution after Maharaj Kumar Navadwip Chandra Deb Barman Bahadur, the president of the council of Administration by

order of the then Member-in-charge of Education with the approval of His Highness the Maharaja Manikya Bahadur.[২১]" সঠিক কত তারিখে স্কুলটির এই নতুন নামকরণ হয়েছিল, তা জানা যায় ত্রিপুরা স্টেট গেজেটের একটি বিজ্ঞপ্তিতে—

সোনামুড়া হাইস্কুলের নামকরণ সম্পর্কে [২২] —

নং ১২৭৫— সন ১৩৩৭ ত্রিং, তাং ১৩ই ভাদ্র।

শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রায় মতে ১লা ভাদ্র হইতে মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুরের নামানুসারে সোনামুড়া হাইস্কুলটিকে "নবদ্বীপচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন" নামে অভিহিত করা হইল।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক — শিক্ষাবিভাগ

শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
মেম্বর
৩২/৪/৩৭ ত্রিং

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা ঃ

রাজন্য আমলে নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের সাফল্যের খতিয়ান

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	মোট. পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সাফল্যের হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	সর্বমোট	
১৩৩৪ (১৯২৪ - ২৫ খ্রিঃ)	৭	১	৫	০	৬	৮৫·৭
১৩৩৫ (১৯২৫ - ২৬ খ্রিঃ)	৭	১	০	০	১	১৪·৩
১৩৩৬ (১৯২৬ - ২৭ খ্রিঃ)	৬	৪	১	০	৫	৮৩·৩
১৩৩৭ (১৯২৭ - ২৮ খ্রিঃ)	৫	০	১	২	৩	৬০
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ খ্রিঃ)	১২	২	৩	০	৫	৪১·৭
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	১০	২	৩	০	৫	৫০
১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	৮	২	২	১	৫	৬২·৫
১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	৬	৩	১	১	৫	৮৩·৩
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	৫	০	২	১	৩	৬০
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	৯	১	৪	১	৬	৬৬·৭
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	৯	২	৩	০	৫	৫৫·৬
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	১২	১	৫	১	৭	৫৮·৩
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিঃ)	১১	১	৬	৩	১০	৯০·৯
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ খ্রিঃ)	২০	১	২	৬	৯	৪৫
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ খ্রিঃ)	৭	১	০	২	৩	৪২·৯
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ খ্রিঃ)	৬	১	০	৩	৪	৬৬·৭

১৩৫২ (১৯৪২-৪৩ খ্রিঃ)	৯	০	১	২	৩	৩৩৩
১৩৫৩ (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ)	২	০	১	১	২	১০০
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৪	২	০	১	৩	৭৫
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ খ্রিঃ)	১০	০	০	৬	৬	৬০

সূত্র ঃ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট অব্ ত্রিপুরা স্টেট, ১৩৩৪ - ৫৫ ত্রিপুরাব্দ।

*** ১৩৩৯ ত্রিং সনে স্কুলের একজন ছাত্র গণিতে 'লেটার' পায়।**

*** ১৩৪৫ ত্রিং সনে স্কুলের একজন ছাত্র রাজ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পায়।**

*** * * ১৩৪৯ ত্রিং সনে একজন ছাত্র রাজ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পায়।**

*** * * * ১৩৫৫ ত্রিং সনে দু'জন ছাত্র যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান পায়।**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতকের ষাটের দশকের শেষভাগে শহরতলীতে অবস্থিত মধুবন টিলাতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে স্কুলটি বর্তমানে শহরের যে স্থানে বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত, সেখানেই অবস্থিত ছিল। এন. সি. আই. স্কুলটি মধুবন টিলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর বালিকা বিদ্যালয়টি স্কুলটির পুরানো দালানঘরে চলে আসে। আবার বিগত শতকের শেষভাগে সোনামুড়ায় কলেজ স্থাপন করা হলে এন. সি. আই. বিদ্যালয়টি আবার তার ঠিকানা পাল্টায়। কলেজটি মধুবন টিলাতে জায়গা করে নেয় এবং এন. সি. আই শহরে বর্তমান স্থানে চলে আসে।

সংযোজন

ছাত্রবৃত্তি

১. ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
৬।	শ্রী ইউসুফ আলী	সোনামুড়া মধ্য ইং স্কুল	নিম্ন বাঙ্গালা	৩	দুই বৎসর
৭।	শ্রী বদরুদ্দীন	— ঐ —	— ঐ —	৩	

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

২.

ছাত্রদের পুরস্কার প্রদানে সহায়তা

সন ১৩২৩ ত্রিং, তাং ১লা শ্রাবণ

সোনামুড়া আফিসের গত ১৪/১৯ শে আষাঢ় তারিখের ১২৩৭ / ১৭ - ৪ নং রিপোর্ট উপলক্ষে ; — উক্ত রিপোর্ট বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বার্ষিক পরীক্ষার ফলানুসারে সোনামুড়া মাইনর স্কুলের ছাত্রগণকে ১০ দশ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়া তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ কিশোর পাল মহাশয় শিক্ষা বিভাগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অপরন্তু অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত মুন্সী দৌলত আহাম্মদ, নায়েব শ্রীযুক্ত সোনাগাজি মজুমদার এবং এসিঃ ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কুলচন্দ্র দাস বি. এল. মহাশয় উক্ত উদ্দেশ্যে পার্শ্বোক্ত প্রকারের দান প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহারাও তজ্জন্য এ আফিসের ধন্যবাদের পাত্র বটেন। উক্ত উকীল মহাশয়ের অঙ্গীকৃত 'ফুলজান পুরস্কার' নামে এবং নায়েব মহাশয়ের প্রতিশ্রুত পুরস্কার "সোনাগাজী পুরস্কার" নামে অভিহিত হইবে।

শ্রীযুক্ত উকীল দৌলত আহাম্মদ তাঁহার মাতা শ্রীমতি ফুলজান বিবির জীবিতকাল পর্যন্ত বার্ষিক ১২্ টাকা এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পর তদুদ্দেশ্যে এক কাণি জোত জমি প্রদান।

শ্রীযুক্ত সোনাগাজী মজুমদার আজীবন বার্ষিক ১২্ টাকা করিয়া প্রদান।

শ্রীযুক্ত বাবু কুলচন্দ্র দাস আগামী বর্ষের পুরস্কার বাবত ১০্ টাকা প্রদান।

শ্রী বিজয়কুমার সেন
দেওয়ান

(উৎসঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৪০)

৩.

পুরস্কার প্রদান

সন ১৩২৮ ত্রিং, তাং ২৭শে জ্যৈষ্ঠ

সোনামুড়া ব্রাঞ্চ হাই স্কুলের ছাত্রগণকে বর্তমান বর্ষে পুরস্কার দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ১ম দফার ভদ্র মহোদয়গণ প্রত্যেকে ১২্ টাকা হিসাবে মং ৪৮্ প্রদান করিয়াছেন এবং এই হারেই

প্রতি বর্ষেই সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গত ৩১ শে বৈশাখ বর্তমান বর্ষের পুরস্কার বিতরণ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পুরস্কার বিতরণী সভায় ২য় দফার ভদ্রমহোদয়গণ নিম্নোক্ত হারে চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের এবম্প্রকার বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতার দরুণ তাঁহারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১ম দফা

১।	শ্রীযুক্ত মুন্সী দৌলত আহাম্মদ উকীল	সাং কুলবাড়ী .... ১২্
২।	শ্রীযুক্ত সোনাগাজি মজুমদার	সাং দুর্গাপুর .... ১২্
৩।	শ্রীযুক্ত মনু মহিষাণ	সাং সোনামুড়া ..... ১২্
৪।	শ্রীযুক্ত মৈধর আলী	সাং খেদাবাড়ী ... ১২্

২য় দফা

১।	শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ জমাতিয়া	সাং দুর্লভনারায়ণ .... ১২্
২।	শ্রীযুক্ত কাজিম আলী মহিষাণ	সাং নবদ্বীপচন্দ্রনগর ..... ১২্
৩।	শ্রীযুক্ত জিন্নত আলী মহিষাণ	সাং ঐ ...... ১২্
৪।	শ্রীযুক্ত আবদুল ছোবান চৌধুরী	সাং ঐ ..... ৬্
৫।	শ্রীযুক্ত আনছর আলী	সাং সোনামুড়া ..... ৬্
৬।	শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আস্কর আলী	সাং ঐ ...... ৬্
৭।	শ্রীযুক্ত ঝাড়ু মিঞা মজুমদার	সাং গাজীপুর .... ৬্

শ্রী বিশ্বেশ্বর গুহ
ইং ভারপ্রাপ্ত
সোনামুড়া বিভাগ

শ্রী অসিতচন্দ্র চৌধুরী
এঃ চিফ দেওয়ান

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৮৮)

ছাত্রবৃত্তি

সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ৩১ শে শ্রাবণ

৪. মেমো নং ৩ — এ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত হারে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের বৃত্তি	বার্ষিক বৃত্তির হার	মন্তব্য
৮.	শ্রী হিমাংশু মোহন রায়	সোনামুড়া হাই স্কুল	স্থানীয় বৃত্তি	৮	

উপরিউক্ত ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ১৩৩৬ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্ব - স্ব বৃত্তি ভোগ করিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কলেজে ভর্তি হইয়া এ অফিসে রিপোর্ট করিলে সংসৃষ্ট প্রিন্সিপালের যোগে তাহাদের বৃত্তির টাকা প্রেরিত হইবে।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষাবিভাগ

শ্রী নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা
প্রেসিডেন্ট

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৮৯)

সূত্র ঃ

১. রাজমালা, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ - ১১৭
২. Administration Report of the political Agency, Hill Tipperah, Vol- I, page - 54
৩. রাজমালা, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ - ১১৭
৪ Adm. Report of Pol. Agency. Vol - I, page - 83
৫ — do —, page - 78
৬ — do —, page - 79
৭. — do —, page - 84
৮ - - do —, page - 89
৯. — do —, Vol - II, page - 75
১০. — do —, page - 114
১১. — do —, page -131
১২. — do —, page - 207
১৩. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, Vol - II. P - 477
১৪. — do —, page - 644
১৫. — do —, page - 707
১৬. — do —, page - 831
১৭. —do—, Vol-III, page -994
১৮. — do —, page - 1056
১৯. — do —, page -1125
২০. — do —, page - 1194
২১. — do —, page - 1268
২২. ত্রিপুরা গেজেট সংকলন — পৃষ্ঠা - ১৯২

বোধজং বয়েজ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা

বোধজং বয়েজ স্কুলটির পূর্ব নাম ঠাকুরপল্লী স্কুল। এর সর্বপ্রথম উল্লেখ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে পাওয়া যায় ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২ - ৩৩ খৃঃ) সনে, যখন আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়— "Consequently 4 free primary schools were started, the U. K. Academy building, Tulsibati Girl's school building, Bejoy Kumar M.E. school house and Thakurpalli L.V. school house providing for their accomodation, each for each, during the morning hours.[১]" কাজেই এর অস্তিত্ব আরো আগে ছিল, প্রথমে পাঠশালা এবং পরে নিম্নবাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিজয়কুমার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত পারীন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, তিনি ১৯১০ খ্রিঃ সনে বিজয়কুমার স্কুলে (তখন পাঠশালা) ভর্তি হওয়ার আগে তার হাতেখড়ি হয়েছিল বর্তমান পাওয়ার হাউসের নিকটস্থ 'ঠাকুরপল্লী পাঠশালায়'। ঐ পাঠশালায় একজন মুসলমান শিক্ষক পড়াতেন। বাড়ী থেকে দূরত্ব বেশি হওয়ায় তিনি পরে বিজয়কুমার পাঠশালায় চলে আসেন।[২] তবে তিনি তখনকার ঠাকুরপল্লী স্কুল, বাংলা স্কুল আজ হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ প্রকাশও করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার বর্ণিত পাঠশালা ও পরবর্তী কালের (১৯৩২ খ্রিঃ) 'ঠাকুরপল্লী নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ে'র অবস্থান মোটামুটি একই জায়গায়। এমন কি , বিদ্যালয় দুটির নামও এক। বনমালীপুরে 'পাওয়ার হাউস' সংলগ্ন দীঘিটির উত্তর পাড়ে, যেখানে বর্তমান বোধজং বালিকা বিদ্যালয়টি অবস্থিত, সেখানেই ঠাকুরপল্লী নিম্ন-বাংলা স্কুলটি অবস্থিত ছিল। তাই এটা নিশ্চিত, শ্রীযুক্ত পারীন্দ্র দেববর্মা স্মৃতির ফাঁদে পড়েছেন।

অন্যান্য সূত্র থেকেও ঠাকুরপল্লী পাঠশালাই যে পরবর্তী বোধজং স্কুল, তার সমর্থন মেলে। এ প্রসঙ্গে 'আগরতলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত লিখেছেন— "১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তুলসীবতী স্কুলটি বর্তমান স্থানে আসে। সে সময় বর্তমান উজীরবাড়ির সংলগ্ন আর একটি পাঠশালা ছিল যার নাম ছিল ঠাকুরপল্লী পাঠশালা[৩]" (পৃষ্ঠা - ১৭)। ত্রিপুরার ইতিহাসকার ডঃ জগদীশচন্দ্র গণ চৌধুরীর এই স্কুলটি সম্পর্কে বক্তব্য আরো স্পষ্ট। তিনি 'আগরতলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'ঠাকুরপল্লী পাঠশালা' মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা

করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা - ১২৩)। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন— "রাজকুমার ও ঠাকুরকুমারদের জন্য আগরতলায় দুটি পৃথক ছাত্রাবাস এবং উভয়ের জন্য একটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেন[৪]"। ঠাকুরপল্লী পাঠশালার অবস্থিতি সম্পর্কে ডঃ গণ চৌধুরী লিখেছেন— "সেই হাজারী বাড়ীর স্থলেই বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বলরাম ও শ্রীদাম হাজারীর বাড়ীর পশ্চিমে নিকটেই ছিল ঠাকুরপল্লী পাঠশালা। এই ঠাকুরপল্লী পাঠশালার নির্মাতা রাধাকিশোর। ইহাকে ১৯৪৫ সালে স্থানান্তর ও নামান্তর করেন বীরবিক্রম রানা বোধজং-এর নামে। ইহাই আজকের বোধজং বিদ্যালয়।[৫]"। তাই ঠাকুরপল্লী পাঠশালার একটানা বেঁচে থাকা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠে না।

রাধাকিশোর মাণিক্য এই 'ঠাকুরপল্লী পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠাতা হলেও এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ডঃ গণচৌধুরী বর্ণিত ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাধাকিশোর মাণিক্য মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই যুবরাজ হিসেবে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট T. E. Coxhead ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ সনের বিবরণীতে লিখেছেন— "The one at Agurtollah was opened by the Joobraj, for the children of thakoors and of servents of the Rajah.[৬]" ঠাকুরদের ছেলেদের জন্য মূলত এই স্কুলটি ছিল এবং ঠাকুরদের পল্লীতেই এই স্কুলটি ছিল বলেই স্কুলটির নাম 'ঠাকুরপল্লী পাঠশালা' দেওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় স্কুলটিতে মোট ২৮ জন ছাত্র ছিল, যার মধ্যে ১৬ জন ঠাকুর, ৮ জন ত্রিপুরী, ১ জন মণিপুরী, ২ জন বাঙালী হিন্দু এবং ১ জন দেশোয়ালী ছাত্র ছিল [৭]"।

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের আমলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাণা বোধজং-এর স্মৃতিচারণে শ্রীযুক্ত অঞ্জন বণিক এই ঠাকুরপল্লী নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ের বোধজং স্কুলে রূপান্তরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন— "সে সময়কার উমাকান্তের শিক্ষক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী রাণা বোধজং বাহাদুরকে অনুরোধ করলেন এই নিম্ন প্রাইমারী স্কুলটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে। রাণা বোধজং মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অনুমতি নিয়ে স্কুলটিকে উন্নীত করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাণা বোধজং বাহাদুরের নামে স্কুলটি সে সময়কার মরা চৌমুহনীতে স্থানান্তরিত হয়।[৮]" বিদ্যালয়টি প্রথমে নিম্ন-বাংলা থেকে মাইনর পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৩ খ্রিঃ সনে উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক নিধুলাল চক্রবর্তী (হাসপাতাল রোড এক্সটেনসনে বাড়ী) ৩ মাসের জন্য ঠাকুরপল্লী মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন বলে বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন। এরপরই বিদ্যালয়টি প্রথমে ব্রাঞ্চ হাইস্কুল এবং পরে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় বলে আমরা ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং (১৯৪৩-৪৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানতে পারি— "In the year 1354 T.E., One branch H. E. School for boys was established. In the year 1355 T.E., the total number of

H.E. schools was 9, 8 for boys and 1 for girls.[৯]" এই নতুন হাইস্কুলটি যে ঠাকুরপল্লী স্কুল সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না, কারণ ঐ বছরে আর কোনো স্কুল হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় নি। স্কুলটির নতুন নামকরণ প্রসঙ্গে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী হয়---[১০]।

মেমো নং - ৩

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী আগরতলাস্থ "ঠাকুরপল্লী হাইস্কুল' 'বোধজং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়' নামে অভিহিত হইবে, ইতি। ২৭/২/৫৫ ত্রিং।

শ্রী কামিনীকুমার সিংহ
প্রধানমন্ত্রী, ইনচার্জ (শিক্ষা বিভাগ)

অথচ ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং সনের একই অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্টের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে— "A new High school named "Bodhjung H.E. school" was established at Agartala on 8.10.54 T.E.[১১]" এই বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন স্কুল, এর আগে নিম্ন পর্যায়েও এর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথমে স্কুলটি ব্রাঞ্চ হাই স্কুল ছিল এবং রাণা বোধজং-এর নামানুসারে স্কুলটির নামকরণের আগে এর নাম ছিল ঠাকুরপল্লী হাই স্কুল। দ্বিতীয়ত, স্কুলটি সম্পূর্ণ নতুন হলে তা ঠাকুরপল্লী স্কুলের নাম ব্যবহার করবে কেন? তাই এটা স্পষ্ট যে, ঠাকুরপল্লী স্কুলটিই হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পর বোধজং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নতুন ভাবে মরা চৌমুহনী এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। একথা মেনে নিলে যে প্রশ্নটি উঠে আসে, তা হল এই যে, বোধজং বয়েজ দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রবেশ মুখে 'স্থাপিত ১৯৪৫' কথাটি লেখা রয়েছে, তা বিদ্যালয়টির প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি কি চরম অবহেলার পরিচায়ক নয়? বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে কিভাবে স্বীকৃত হয়? এরফলে বিদ্যালয়টির একশত বছরেরও বেশি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসই উপেক্ষিত হয় এবং শ্রীযুক্ত পারীন্দ্র দেববর্মার আক্ষেপই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়।

মরা চৌমুহনীতে ঠাকুরপল্লী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীগুলিকে সরিয়ে নিয়ে নতুন নামকরণ করলেও প্রাথমিক অংশটি মণিদীঘি অঞ্চলেই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে নানা বিবর্তনের পর বর্তমানে বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে চালু আছে। পুরানো জায়গায় ছিল বলে একে আগে Old Bodjung স্কুলও বলা হত। তাই এই বালিকা বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রাথমিক অংশটির বয়সও যে আলোচ্য স্কুলটির সমান, তা মেনে নিতেই হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Administration Report of Tripura State, Vol-III, page - 1609
২. শতবর্ষ স্মরণিকা, বিজয়কুমার বিদ্যালয়, পৃষ্ঠা - ৬৬
৩. আগরতলার ইতিবৃত্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত, পৃষ্ঠা - ১৭
৪. আগরতলার ইতিবৃত্ত, জগদীশ গণ চৌধুরী, পৃষ্ঠা - ৩৪
৫. —ঐ — , পৃষ্ঠা - ৯১
৬. Administration Report of the Political Agency, Vol - I, Page 78
৭. — do — , page - 89
৮. স্যন্দন পত্রিকা, ১৮ / ১/ ০৭ ইং
৯. Report on Administration of the Tripura State, Page - 144
১০. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃষ্ঠা - ২২৩
১১. Report on Adm. of the Tripura State, page - 77

কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (K. B. I.), উদয়পুর

যে সব স্কুলের প্রাচীন ইতিহাস জানা গেছে, তার মধ্যে উদয়পুরের কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন বা সংক্ষেপে কে. বি. আই প্রাচীনত্বে নবম। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলের অনেক আগে থেকেই ব্রিটিশ এলাকা সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে (যেমন কৈলাসহর, কমলপুর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া ইত্যাদি) নদী-উপত্যকায় বেশ কিছু সমৃদ্ধশালী গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অভ্যন্তরে উদয়পুর, বিশালগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্টে নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডবলিউ. বি. পাওয়ার গোমতী নদীর উচ্চ ভাগে চাকমা বসতি পরিদর্শনকালে উদয়পুরের উল্লেখ করেছেন— '........ on my return journey from Oodeypore across country to Agurtollah.[১]' আবার ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্ট বর্ষের বিবরণীতে T.E.Coxhead ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে পাঁচটি প্রধান বাজারের মধ্যে একটি উদয়পুর বলে উল্লেখ করেছেন— 'Five markets , viz. at Udaypore, Bishalgarh, Devi Bazar, Farnah Dharm Nagar and Kamalpore, are held in the interior of the hill country.'[২] ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট সি. ডবলিউ. বোল্টন ত্রিপুরা রাজ্যের নদী-উপত্যকা অঞ্চলগুলির উর্বরতার কারণে উন্নত কৃষিজ অর্থনীতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন— 'The principal of these valleys already contain the most flourishing sections of the population. They include the largest villages of the State, namely, Koilashar, Kamalpoor, Agartala, Bishalgarh, Udaypur and Bilonia.[৩]'

১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ তৃতীয় বিজয় মাণিক্যের আমলে সমসের গাজীর ত্রিপুরা আক্রমণের পর রাজধানী উদয়পুর পরিত্যক্ত হয়[৪] এবং মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন আগরতলায় রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে ঐ সময় থেকেই উদয়পুর তার গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা উদয়পুর পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী ব্রিটিশ এলাকায়

আশ্রয় গ্রহণ করে।[৫] তবু এরপরও যে উদয়পুরে একটি মিশ্র বসতি ছিল তা ব্রজেন্দ্রকুমার দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরকে ঘিরে কিছু ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতিও ছিল। 'চন্দ্রপুর মৌজার লস্করগণ এই স্থানের পুরাতন বাঙালী হিন্দুপ্রজা।[৬]' এছাড়াও একই মৌজায় বেশ কয়েকঘর কায়স্থ, শূদ্র ও শীল জাতি হিন্দুর পুরুষানুক্রমে বাস ছিল। খিলপাড়া অঞ্চলে পানের ব্যবসায়ী 'বারুই'-রা বহুকাল যাবৎ বসবাস করছেন বলে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন। এছাড়া সোনামুড়া অঞ্চলে মৃধা বংশ, দক্ষিণ চন্দ্রপুরের ভুএগ্রা বংশ, খিল পাড়ার পালোয়ান বংশও যথেষ্ট প্রাচীন ছিল। একই সঙ্গে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এইসব অঞ্চলের বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত প্রাচীন মুসলমান পরিবারেরও উল্লেখ করেছেন। এদের পেশার পরিচয়ে জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলে কৃষিকার্যই প্রধান ছিল, তবে মুষ্টিমেয় দুই-একটি পরিবার স্বর্ণ-রৌপ্য ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারের নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত থাকত। তাই এখানে বাংলাদেশের অনুকরণে দেশীয় পাঠশালা থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। এইসব দেশীয় পাঠশালাগুলি একজন গুরুমশাই দ্বারা পরিচালিত হতো, পড়ুয়ারাই গুরুমহাশয়ের বেতন মেটাতেন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে রাজ্যের দক্ষিণভাগকে আলাদা করে যে বিভাগের সৃষ্টি করা হয় তার সদর দপ্তর যে উদয়পুরেই প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল, তা বিভাগের নামকরণ থেকেই বুঝা যায়— "The Raja has lately caused a new sub-division to be created, having its head-quarters at Odeypoor, a days journey due east of Comillah and has appointed to the charge of it a late Government servant, a man well spoken of.[৭]" কিন্তু বর্ষাকালে উদয়পুর অস্বাস্থ্যকর বিধায় প্রশাসনিক সদর দপ্তর সোনামুড়ায় স্থানান্তরিত হয়। তবে শীত ঋতুতে অর্থাৎ শুকনো মরসুমে প্রশাসন-কেন্দ্রটি সোনামুড়া থেকে উদয়পুরে স্থানান্তরিত হত— "A dispensary is to be opened at Udaypore on the removal there of the Deputy Magistrate from Sonamura at the commencement of the cold season.[৮]" (১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষ)।

যাই হউক, মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র উদয়পুর থেকে সোনামুড়ায় চলে যাওয়ার কারণে ঐ সময়ের শিক্ষানীতি অনুসারে সরকারী পাঠশালা উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সোনামুড়ায় স্থাপিত হলো। উদয়পুর একটি অস্থায়ী বিভাগীয় কেন্দ্র হয়ে উঠার কারণে সেখানেও একটি পাঠশালা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলো— 'Orders have been issued for the estblishement of a new school at Udaipur, but those orders have not as yet been carried out.[৯]' অর্থাৎ উদয়পুরে একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ছিল। এক্ষেত্রে 'a new school'— এই কথাটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর মানে এই দাঁড়ায় যে, ঐ সময়ে উদয়পুরে আরেকটি স্কুল ছিল, যাতে পুরানো ধাঁচে অর্থাৎ দেশীয় পাঠশালার পাঠ্যক্রম পড়ানো হত, যাতে সরকারী কোনো উদ্যোগ বা অনুদান ছিল না।

যদি উদয়পুরে ঐ সময়ে কোনো স্কুলের অস্তিত্ব না থাকতো, তবে রিপোর্টে 'a new school'— এর উল্লেখ না থেকে 'a school' কথাটি থাকতো। পরবর্তী রিপোর্টে (১৮৭৭ - ৭৮ খ্রিঃ) জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত উদয়পুরে কোনো নতুন স্কুল আর প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, পুরানো স্কুলটিকেই সংস্কার করা হয়েছে— 'The school at Udaypur and the Persian Maktab and Sanskrit Tole at Agartala are really old institutions revised this year.[১০]'

এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট C.W. Bolton-এর এই রিপোর্টে 'really old institution' এই তিনটি শব্দের মধ্যেই উদয়পুরের স্কুলটির প্রাচীনত্বের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। এই শব্দ তিনটি প্রমাণ করে যে, উদয়পুরের কে. বি. আই.-এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ নয়, এর বহু আগে থেকেই স্কুলটি চালু ছিল। তবে কত বছর আগে থেকে, তা অনুমান করা দুরূহ। মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আমলে (১৬৮৫-১৭১২ খ্রিঃ) আসাম রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের দুই দূত রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগী তাদের পান্ডুলিপি 'ত্রিপুর দেশের কথা'-য় রাজধানী উদয়পুরকে যেভাবে একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর-নগরী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, অথবা ঐ নগরের অধিবাসীদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে উদয়পুরে যে ঐ সময়ে বাংলাদেশের মতো একাধিক দেশীয় পাঠশালা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'অ্যাডাম'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে এদেশে যথেষ্ট দেশীয় পাঠশালা ছিল, যাতে প্রচুর পরিমাণে নিম্ন-বর্গের মানুষও অংশগ্রহণ করতো। অ্যাডাম-এর মতে, ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র বাংলা ও বিহারের দেড় লক্ষ গ্রামের মধ্যে এক লক্ষ গ্রামে দেশজ পাঠশালা ছিল গরীব শ্রেণীর শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া ও অংক শেখার জন্য।[১১] অথচ ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণীর জন্য। তাই প্রতিযোগিতায় অক্ষম এই পাঠশালাগুলি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল—'শিক্ষা হয়ে উঠল উঁচু শ্রেণীর একচেটিয়া কারবার। আর নীচু বর্গের শ্রেণীর শিশুরা শিক্ষার আঙ্গিনার বাইরে চলে গেল।[১২]' ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের (Hunter Commission) সিদ্ধান্তে ৫০ হাজার দেশীয় পাঠশালাকে ব্রিটিশ প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাঠশালাগুলির পূর্বতন ইতিহাসও বিলুপ্ত হয়ে গেল। উদয়পুর রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হবার পরও একটি দেশীয় পাঠশালা, দেখা যাচ্ছে, কায়ক্লেশে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল, কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে সেই পাঠশালাটিতে ব্রিটিশ আদলে পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে এরও পূর্বতন ইতিহাস কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

উদয়পুর বিভাগের প্রশাসনিক কেন্দ্র সোনামুড়ায় থাকলেও উদয়পুর রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় উদয়পুরের মাধ্যমেই পার্বত্য দুর্গম এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল।

তাই ১৮৮০-৮১ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে দেখা যায়— '..... and for the better administration of the hills in the interior an additional office will be established at Udoypore and placed in charge of a Sub-Deputy Magistrate at a total expense of Rs. 100 a month.[১৩]'

পরবর্তী সময়ের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের বিবরণীগুলি থেকে জানা যায় যে, রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে উদয়পুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং সড়কপথে আগরতলা, সোনামুড়া ও বিলোনীয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ সোজা কথায়, উদয়পুর বিভাগীয় কেন্দ্র না হলেও তা একটি উপ-প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

১৮৮২-৮৩ খ্রিঃ বর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ঐ সময়ে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ৩১ এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ৬১৫ জন ছিল। কিন্তু উপযুক্ত তদারকি ও আর্থিক সংকটের কারণে পরের বছর বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে ১৫-তে নেমে আসে ও ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৪২৫ হয়। ছাত্রসংখ্যার হ্রাসের হার এটাই প্রমাণ করে যে, লুপ্ত স্কুলগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণ ছিল এবং এগুলি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৬-৮৭ বর্ষের বিবরণীতে দেখা যায়— 'Nine of the schools and pathshalas belong to Koylashar division and the remaining seven to the other divisions of the state.[১৪]' এটা বুঝে নিতে মোটেও কষ্ট হয় না যে, আগরতলা, বিলোনীয়া, সোনামুড়া, উদয়পুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতেই এই বাকি সাতটি স্কুল ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে উমাকান্ত দাস মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রাজ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরে এবং রাজ্যে আবার স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরপর যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের হাতে শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কৈলাসহর ও সোনামুড়া বিভাগীয় কেন্দ্র হওয়ায় সেখানকার স্কুল দুটি মাইনর পর্যায়ে উন্নীত হয়, কিন্তু উদয়পুর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও সেখানকার স্কুলটি পাঠশালা পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে। স্কুলটির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে, যখন উদয়পুরকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে একটি পৃথক বিভাগে উন্নীত করা হয়। স্কুলটি প্রথমে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে একটি নিম্ন-বাংলা স্কুলে পরিণত হয়। এ বিষয়ে স্টেট গেজেটে বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ—[১৫]

পাঠশালার রূপান্তর

১৩১৩ ত্রিং, তাং ২৫শে শ্রাবণ, মেমো নং ৪ — শ্রীযুক্ত মন্ত্রী বাহাদুরের আদেশানুসারে উদয়পুর পাঠশালাটি নিম্নবাঙ্গালা স্কুলে পরিণত হইল। ১লা ভাদ্র হইতে এই আদেশানুসারে কার্য চলিবে, ইতি।

P. C. RAY
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

মাত্র দুই বছরের মধ্যেই উদয়পুরের এই স্কুলটি মধ্য ইংরেজী (M.E) অর্থাৎ মাইনর স্কুলে পরিণত হয়। ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫ - ০৬ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে দেখা যায়— 'During the year the Lower Vernacular School at Udaipur was raised to the status of a Middle English School, thus increasing the total number of such schools from 3 to 4.[১৬]' বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে ১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি হাইস্কুলে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ১৩৩৮ ত্রিং (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'Representations were received from the local public of Udaipur Division for raising the status of the local M. E. School to that of an H. E. School. The Department accepted the proposal and as a preliminary step, it was decided to add one higher class every year. Accordingly class VII was added to the Radhakishorepur M. E. School during the year and a graduate teacher was appointed from the beginning of the new session after X'mas holidays. The local public offered to contribute for the building and equipments and actually raised about Rs. 3000. It is hoped that the fund will gradually increase and meet the estimated expenditure for a suitable building and necessary equipments.[১৭]'

এই রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, উদয়পুরের M. E. স্কুলটি 'রাধাকিশোরপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৩৩৯ ত্রিং (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ) সনের কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষে প্রকাশিত একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে স্কুলটির নতুন নামকরণ হয়—[১৮]

রাধাকিশোরপুর হাইস্কুলটি উদয়পুর ব্রাঞ্চ
হাইস্কুল নামে অভিহিত হওয়ার বিষয়
নং ১৩১৮ - ১৯—

রাধাকিশোরপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টি গত বৎসরের শেষ ভাগে ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে পরিণত করা হইয়াছে। বর্তমান সন হইতে উক্ত বিদ্যালয়টি দ্বিরাদেশতরে 'Udaipur Branch H. E. School" নামে অভিহিত হইবে।

অষ্টাবিংশ ভাগ, চতুর্দশ সংখ্যা
কার্তিক - ২য় পক্ষ, ১৩৩৯ ত্রিং

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষাবিভাগ

১৩৪১ ত্রিং (১৯৩১- ৩২ খ্রিঃ) সনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ১৩৪০ ত্রিং সনে স্কুলটিতে নবম শ্রেণী খোলা হয়— 'Class IX was opened in the previous year provisionally in the Branch H.E. School at Udaipur, on condition that the public would agree to bear the additional cost of maintaining extra staff.[১৯]' এ থেকে বুঝা যায় যে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ কতটা উন্মুখ ছিলেন। এই অবস্থা ১৩৪৭ ত্রিং (১৯৩৭-৩৮ খ্রিং) সন পর্যন্ত চলতে থাকে। সেই সময়ে উদয়পুরের ব্রাঞ্চ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আগরতলায় এসে উমাকান্ত একাডেমীতে দশম শ্রেণী পড়তে হতো এবং এই বিদ্যালয় থেকেই মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হতো। তবে ১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনে স্কুলটিতে দশম শ্রেণী খোলা হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়ে উদয়পুর হাইস্কুলের ছাত্ররা প্রথম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। ১৩৪৭-৪৯ ত্রিং (১৯৩৭-৪০ খ্রিঃ) সনের বার্ষিক বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই স্কুল থেকে ৭ জন ছাত্র পাঠানো হয় এবং ৫ জন ছাত্র (৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ২ জন তৃতীয় বিভাগে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

স্কুলটির বর্তমান নাম অর্থাৎ 'কিরীট বিক্রম ইন্স্টিটিউশন অর্থাৎ যুবরাজ কিরীট বিক্রমের নামে কখন নামকরণ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো গেজেট বিজ্ঞপ্তি সংকলন গ্রন্থে নেই। আবার, ১৩৪৭-৪৯ ত্রিং সনের বার্ষিক বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল ১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সন থেকেই দেওয়া হয়েছে।[২০] তাতে মনে হতে পারে যে স্কুলটির নতুন নামকরণ ১৩৪৮ ত্রিং সনেই হয়েছিল। কিন্তু উদয়পুর থেকে শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কিরীট বিক্রমের টীকা উৎসবের পর তাঁর নামে স্কুলটির নামকরণ হয়।[২১] ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কিরীট বিক্রম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।[২২] তাই সম্ভবতঃ ঐ বছরের অন্তিমলগ্নে অথবা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে স্কুলটির নামকরণ কিরীট বিক্রম ইন্স্টিটিউশন হয়। ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সনে স্কুলটি হাইস্কুল হিসেবে স্থায়ীভাবে অনুমোদন লাভ করে।[২৩] তাই নতুন নামকরণের আগে স্কুলটি 'উদয়পুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়' নামেই অভিহিত হত, তা বলা যায়।

শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য আরো জানিয়েছেন যে, উদয়পুরের এই স্কুলটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে বর্তমান নাগবাড়ীতে অবস্থিত ছিল এবং ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের পর তা বর্তমান অবস্থানে চলে আসে। উদয়পুরের এই কে. বি. আই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে যে বির্তক চলে আসছিল, তার অবসানকল্পে ২০০৪ ইং ২৯শে নভেম্বর শহরের বিভিন্ন গণমান্য ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক সভায় ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ বলে মেনে নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ[২৪]—

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন
চতুর্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা
কার্তিক, ১৩১৫ ত্রিং

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

উদয়পুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের জন্য মাসিক মং ২০্ বিশ টাকা বেতনে একজন হেড মাস্টার নিযুক্ত করা হইবে, কর্মপ্রার্থীগণ স্ব-স্ব যোগ্যতার নিদর্শন সহ্ আগামী ৭ই্ অগ্রহায়ণ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় আবেদন প্রেরণ করেন ; অতঃপর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না, ইতি। সন ১৩১৫ ত্রিং, তাং ১৭ই কার্তিক।

স্বাধীন ত্রিপুরা,
উদয়পুর আফিস,
পোঃ কুমিল্লা

B. C. DUTTA
এসিঃ কালেক্টর

সভায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল তা মেনে নিলেও তা পরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ১৯০৫ সালে উদয়পুরে মধ্য ইংরেজী স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা ঐ সময়ে ত্রিপুরায় চালু শিক্ষানীতির পরিপন্থী। রাজন্যযুগে এমন একটিও স্কুলের উদাহরণ দেখানো যাবে না, যা সরাসরি মধ্য ইংরেজী স্কুল অথবা হাইস্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি স্কুলই পাঠশালা পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে উন্নীত করা হয়েছিল। উদয়পুরের এই স্কুলটিও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা আমরা উপস্থাপিত তথ্যের মাধ্যমেই দেখতে পাই। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগে উদয়পুরে কোনো পাঠশালা বা স্কুল ছিল না, সভার এই ধরনের সিদ্ধান্ত তথ্যের পরিপন্থী। কারণ, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সোনামুড়া থেকে উদয়পুর বিভাগ আলাদা হওয়ার পর ১৩১২ ত্রিং (১৯০২ - ০৩ খ্রিঃ) সনের Education Return-এ দেখা যায়, ঐ সময়ে উদয়পুর বিভাগে ৫টি স্কুল ছিল যাতে ৭৭ জন ছাত্র পড়তো। এদের মধ্যে ৩১ জন ত্রিপুরী, ৯ জন কুকী, ৬ জন বাঙালী হিন্দু, ২৯ জন বাঙালী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য ২ জন ছিল। ত্রিপুরী ও কুকী সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যার আধিক্য থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে শুধু উদয়পুরেই নয়, বিভাগের অন্যত্র, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগেও যে উদয়পুরে পাঠশালা ছিল তার আরেকটি প্রমাণ ১৩১২ ত্রিং সনের রিপোর্টে পাওয়া যায়— 'At the headquarters of the other divisions there were primary schools or patsalas.[২৫]" এর আগে উদয়পুর একটি বিভাগীয় উপকেন্দ্র এবং রাজ্যের

দক্ষিণাংশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়ার কারণে এখানে সরকারী উদ্যোগে চালু পাঠশালাটির কোনো পরিস্থিতিতেই অবলুপ্তি সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের আগেই সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে উদয়পুরে একটি দেশীয় পাঠশালা জনসাধারণের উদ্যোগে যেখানে চালু ছিল, সেখানে তারা পরবর্তী সময়ে স্কুলটিকে বিলুপ্ত হতে দেবেন কেন ?

রাজন্য যুগে কে. বি. আই-এর সাফল্যের খতিয়ান (মেট্রিকুলেশন)

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	মোট পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সাফল্যের হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	সর্বমোট	
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯খ্রিঃ)	৭	০	৩	২	৫	৭১৪৩
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ খ্রিঃ)	৭	০	০	৫	৫	৭১৪৩
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ খ্রিঃ)	৭	০	১	১	২	২৮৫৭
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ খ্রিঃ)	৬	১	০	৫	৬	১০০
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ খ্রিঃ)	৮	০	০	৪	৪	৫০
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৯	০	২	২	৪	৪৪৪৪
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ খ্রিঃ)	৭	০	২	৩	৫	৭১৪৩

* সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলি থেকে গৃহীত।

সংযোজন

১. আর্থিক সাহায্য প্রদান

উল্লিখিত ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত টাকা রাধাকিশোরপুর মধ্য ইং স্কুলের বিগত পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্রগণকে সাহায্য করায় এ আফিসের বিশেষ ধনবাদার্হ হইয়াছেন, ইতি সন ১৩৩৬ ত্রিং। তাং ১৭ই শ্রাবণ।

১। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত D.O. — ৪্

২। শ্রীযুত কাজী আলী আহাম্মদ (রৌপ্য পদক ৫্ + নগদ ১্) — ৬্

৩। শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস ডাক্তার — ৩্

৪। শ্রীযুত কালাচাঁদ সাহা মন্ডল (মার্চেন্ট) — ৫্

৫। শ্রীযুত মুন্সী মোতারক আলী ভুঞা — ৫্

৬। শ্রীযুত ফজলদ্দিন আহাম্মদ সরকার — ২্

কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (K. B. I.), উদয়পুর

৭।	শ্রীযুত আলী মিঞা কাজি	২৲
৮।	শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দাস পন্ডিত	১৲
৯।	শ্রীযুত রাজপ্রাসাদ চৌধুরী, তালুকদার	৫৲
১০।	শ্রীযুত কেরামত আলী মুন্সী	২৲
১১।	শ্রীযুত রমিজদ্দি প্রধানায়া	২৲
১২।	শ্রীযুত কলিমদ্দি সিকদার	২৲
১৩।	শ্রীযুত আমজদ আলী মিঞা	৩৲
১৪।	শ্রীযুত ললিতচন্দ্র ভৌমিক	৩৲
১৫।	শ্রীযুত আশক মিঞা	২৲
১৬।	শ্রীযুত রোস্তম আলী	২৲
১৭।	শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র নমঃ	১৲
১৮।	শ্রীযুত ভারতচন্দ্র চৌধুরী	১
	মোট -	৫২

শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়
ইনচার্জ,
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষাবিভাগ

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন পৃ - ১৯১)

২. উদয়পুর হাইস্কুলে ছাত্র বেতন আদায়

সারকুলার নং - ২

১৩৩৯ সনের ১নং সারকুলারের মর্ম্মমতে এ রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র বেতন আদায় করা হইতেছে। কিন্তু উদয়পুর ব্রাঞ্চ হাইস্কুলের ছাত্রগণ হইতে উক্ত সারকুলারের বিধান অনুযায়ী এ যাবৎ কোনোপ্রকার বেতন আদায় করা হয় নাই।

অতএব অন্যান্য হাইস্কুলের ন্যায় এ বৎসর ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩৩৯ ত্রিং সনে ১নং সারকুলারের নিয়মানুযায়ী উদয়পুর ব্রাঞ্চ হাইস্কুলের ছাত্রগণ হইতেও নিম্নলিখিত হারে বেতন আদায়ক্রমে বিভাগীয় ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে, ইতি। সন ১৩৪৩ ত্রিং, তারিখ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান, শিক্ষা বিভাগ
৪/২/৪৩

শ্রী জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন
মন্ত্রী
৪/২/৪৩

ত্রিপুরার ৪০টি শতবর্ষপ্রাচীন বিদ্যালয়

শ্রেণীর নাম	রাজকুমার, ঠাকুর, মণিপুরী এবং পার্বত্য প্রজা	রাজকর্মচারীবৃন্দের পুত্রাদি ও স্কুল বিশেষে নির্ভরশীল সহোদর ভ্রাতাদের এবং স্থায়ী এ রাজ্যবাসী প্রজাদের	অন্যান্য বৃটিশ প্রজাদের
Class X	ফ্রি	১৷৷০	২৷০
Class IX	ফ্রি	১৷৷০	২৷০
Class VIII	ফ্রি	১৷ ০	১৸৵
Class VII	ফ্রি	১৷০	১৸৵
Class VI	ফ্রি	১৲	১৷৷০
Class V	ফ্রি	১৲	১৷৷০
Class IV	ফ্রি	৸৹	১৷০
Class III	ফ্রি	৸৹	১৷০

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ- ২১০)

৩. ভলান্টিয়ার কোর গঠন করা সম্পর্কে

No. 2837-45 / 7-20 Dated 12.11. 1947

Headmaster,

1. Kailashar R. K. Institution
2. Agartala U. K. Academy
3. Agartala Bodjung H. E. School.
4. Sonamura N. C. Institution
5. Beloniya B. K. Institution
6. Khowai H. E. School
7. Dharmanagar B. B. Institution
8. Udaipur K. B. Institution.

I feel it is necessary to organise a Volunteer Corp out of the school boys to help the State Administration in case of necessity , during any troubles.

Please therefore take every possible steps towards that. Our aim in main will be to encourage communal harmony amongst us.

N. L. DEB BARMA
Minister
Education Department
Tripura State

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ- ২৩৬)

সূত্র ঃ

১. Administration Report of political Agency, Hill Tipperah, Vol - I, page - 36
২. — do —, page - 77
৩. — do —, page - 121
৪. ত্রিপুরার ইতিহাস, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোঃ, পৃ - ১৮
৫. উদয়পুর বিবরণ, পৃ — ৫৬
৬. — ঐ —, পৃ - ৫৭
৭. Administration Report of Tripura State, Vol - I, page - 54
৮. — do —, page - 83
৯. — do —, page - 104
১০. — do —, page - 135
১১. বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, পৃ - ১১
১২. — ঐ —, পৃ - ১১৩
১৩. Adm. Report of Hill Ti pperah, Vol - II, page - 68,
১৪. Adm. Report of Hill Ti pperah, Vol - II, page - 207
১৫. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৮
১৬. Administration Report of Tripura State, Vol - I, page - 152
১৭. — do —, Vol - III, page - 1346
১৮. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৯৯
১৯. Administration Report, Vol - III, page - 1501
২০. — do —, Vol - IV, page - 2061
২১. অবশেষে সত্যের জয়, স্বপন ভট্টাচার্য, স্যন্দন পত্রিকা, ৩০ নভেম্বর, ২০০৪ ইং
২২. ত্রিপুরার ইতিহাস, ডঃ গণচৌধুরী, পৃ - ১৯০
২৩. Administration Report, Vol- IV, page - 2060
২৪. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৩১
২৫. Administration Report of Tripura State, Vol-I, page - 67

বিশালগড় টাউন গার্লস হাইস্কুল

পূর্বতন সদর মহকুমায় বিশালগড় (বর্তমানে বিশালগড় একটি পৃথক মহকুমা) একটি বহু প্রাচীন সমৃদ্ধশালী গ্রাম। ত্রিপুরায় প্রথম বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট A.W.B. Power তার ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ সনের রিপোর্টে বিশালগড়ের উল্লেখ করেছেন।[১] ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে পলিটিক্যাল এজেন্ট T. E. Coxhead তার রিপোর্টে রাজ্যের যে পাঁচটি বাজারের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে বিশালগড় একটি— "Five markets, viz. at Udaypore, Bishalgarh, Devi Bazar,Farnah Dharm Nagar, and Kamalpore, are held in the interior of the hill country.[২]" আবার ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ সনে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট C.W. Bolton তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন— "They include the largest villages of the state, namely, Koilashar, Kamalpoor, Agartala, Bishalgarh, Udaypur and Bilonia.[৩]" একই বছরে রাজ্যে শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন— "Many new schools have been opened during the year, particularly in Pergunnah Bishalghar, and there has been a real advance in the matter of primary education.[৪]" অর্থাৎ বিশালগড়েই নয়, সমগ্র বিশালগড় পরগণাতেই বেশ কয়েকটি বসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল। তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে, ১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ সনে যখন রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা সর্বনিম্নে নেমে আসে, তখনও বোল্টন বর্ণিত এই ছয়টি গ্রামে অর্থাৎ বিশালগড়েও স্কুলটি নিঃসন্দেহে চালু ছিল। ১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে জানা যায় যে, বিশালগড়ের স্কুলটি বেশ ভালই চলছিল— "The Bishalgar school is also doing pretty well in its way, but the rest of the institutions are more or less irregular and of a temporary character.[৫]" ঐ সময়ের রিপোর্টে তাই দেখা যায় যে, আগতলা ও কৈলাসহরের স্কুলটির পরেই বিশালগড় স্কুলটির স্থান ছিল। এই তথ্যে পূর্বের অনুমানটি নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

বেশ কিছু বছরের জন্য কোনো রিপোর্টেই বিশালগড়ের এই স্কুলটির কোনো উল্লেখ নেই। তবে ১৩১২ ত্রিং (১৯০২ - ০৩ খ্রিঃ) সনে বিশালগড়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্থাপনায় প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে বিশালগড় একটি উল্লেখযোগ্য বসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল— 'The

increase is due (1) to the fact that many hill-people took the benifit of dispensaries, as their prejudice against English medicines is dying out gradually and (2) to the establishment of the additional permanent dispensary at Bishalgarh.[৬]" ঐ সময়ে সারা রাজ্যে মাত্র ১০টি (আগরতলা সহ) দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। তাই বিশালগড়ের স্কুলটির জনপ্রিয়তাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং তা পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা (L.V) পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে স্কুলটির নিম্ন বাংলা পর্যায়ে উন্নীতকরণ কখন ঘটে, তা জানা যায় নি। কালক্রমে বিশালগড় এলাকায় উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে স্কুলটি মধ্য ইংরেজী বা এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়— "In response to the demand of the local people, a new M. E. school was opened at Bishalgarh and conducted on the same line as other M.E. Schools of the state. The new school building will be erected by the local public.[৭]"

এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে, বিশালগড়ে একটি নতুন M.E. স্কুলের পত্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা নয়, রাজন্য আমলে সরাসরি কোনো উচ্চ পর্যায়ের স্কুল স্থাপিত হয় নি। পাঠশালা থেকে প্রথমে নিম্ন-বাংলা, নিম্নবাংলা থেকে মধ্য ইংরেজী এবং মধ্য ইংরেজী থেকে উচ্চ ইংরেজী বা হাই স্কুল— এভাবেই প্রতিটি স্কুলের ক্রমে ক্রমে উন্নতিসাধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় হয় নি। একই বছরের রিপোর্টেই নিম্নবাংলা স্কুলের সংখ্যা একটি কমিয়ে দেখানো হয়েছে— " The number of Lower Vernacular schools for boys was 22 against 23 in the previous year.[৮]" স্পষ্টতই এই কমে যাওয়া স্কুলটি বিশালগড়ের নিম্নবাংলা বিদ্যালয়, যেটি ঐ বছরে মধ্য ইংরেজী বা এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে ঐ বছরে রাজ্যের মোট এম. ই. স্কুলের সংখ্যা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। কারণ, ঐ বছরই আগরতলার এম. ই. স্কুলটি, যেটি উমাকান্ত একাডেমীর মূল দালানের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল সেটি লুপ্ত হয়। একই বছরের রিপোর্টে এ বিষয়ে বলা হয়েছে— "In the year under report, the Middle English School at Agartala was dissolved. The upper classes of this institution were amalgamated with the corresponding classes of the Umakanta Academy, the Infant classes only being maintained as a seperate institution under the the direct supervision of the Headmaster of the Academy.[৯]" ফলে রাজ্যে এম. ই. স্কুলের সংখ্যা আগের বছরের মতোই ৫-এ থেকে যায়।

২০০০ খ্রিস্টাব্দ জাঙ্গালিয়াস্থিত "বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়" নামক বেসরকারী স্কুলটির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকায় ইতিহাসচারণে এই এম. ই. স্কুলের কোনো উল্লেখ না করায় বিশালগড়ের শিক্ষার ইতিহাসের প্রতি অবিচার হয়েছে। এই এম.ই. স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে

উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যই যে বেসরকারী স্কুলটির উদ্ভব সে কথার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। এম. ই. স্কুলটিকে আশ্রয় করেই যে সর্বপ্রথমে বেসরকারী স্কুলটি গড়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে এই বেসরকারী স্কুলের প্রথম যুগের শিক্ষক এ. এম. শামসুল আলম মহাশয়ের লেখনীতে— "বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ বর্তমান বিশালগড় টাউন গার্লস হাইস্কুলের পূর্বপ্রান্তে নদীর তীরে একখানা ছন-গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০]" কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যেও বিশালগড়ের এম. ই. স্কুলের পাশেই যে বেসরকারী স্কুলটি গড়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট হয় না। এই স্মরণিকাতেই বেসরকারী স্কুলটির প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ বিজয় দেব লিখেছেন— "সেই ৫০-এর দশকে যখন আমি বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম, তখন .... মাঠ বলতে বিশালগড় এম. ই. স্কুল মাঠ যা বর্তমানে টাউন গার্লস নামে পরিচিত। বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি তার পাশেই ছিল।[১১]" এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, পঞ্চাশের দশকেও রাজন্য আমলের এম. ই. স্কুলটির অস্তিত্ব এবং তা কোথায় অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত এই এম. ই. স্কুলটিই পরবর্তীকালে বিশালগড় টাউন গার্লস হাইস্কুলে পরিবর্তিত হয়।

ষাটের দশকের প্রথমভাগেও বিশালগড় এম. ই. স্কুল হিসেবে স্কুলটির অস্তিত্ব ছিল। বিশালগড়ের প্রবীণ বাসিন্দা শ্রীযুক্ত গয়াচরণ সাহা ১৯৬০-৬৪ সন পর্যন্ত এই স্কুলের ইন-চার্জ ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর আমলেই আনুমানিক ১৯৬৩ সাল নাগাদ স্কুলটির ষষ্ঠ শ্রেণী লুপ্ত করে দেওয়া হয় এবং স্কুলটি এম. ই. স্কুল থেকে নিম্নবুনিয়াদী স্কুলে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে স্কুলটি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরিত হয়। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ে বিশালগড়ে সব স্কুলেই কো-এডুকেশন ব্যবস্থা ছিল, ছাত্রীদের জন্য পৃথক কোনো বিদ্যালয় না থাকায় এই স্কুলটিকে পরে গার্লস হাই স্কুলে পরিণত করা হয়।

এইভাবেই ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বিশালগড়ের পাঠশালাটি কালের প্রভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বর্তমানে 'বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল' রূপ ধারণ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর বিদ্যালয়টির এই ধরনের রূপান্তর যথেষ্ট জটিল হওয়ায় সাধারণ্যে বিদ্যালয়ের ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে।

সংযোজন ঃ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ খ্রিঃ বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

আবদুল আলীম রচিত 'বিশালগড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে (পৃষ্ঠা - ১৩০)। এতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৫ইং বলা হলেও সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, স্কুলটি বেসরকারী ভাবে অনেক আগে শুরু হয়েছিল। আবদুল আলীম মহাশয় এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন, তা জানা না গেলেও আমরা দেখেছি যে, বিদ্যালয়টি প্রথম থেকেই সরকারী

ভাবে অনুমোদিত ছিল। স্পষ্টতই স্থানীয়ভাবে স্কুলটির এম. ই. স্কুলে রূপান্তরের সময় থেকেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত, এই ধারণা গেঁথে আছে, এর আগের ইতিহাস অস্পষ্ট। অন্যান্য স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও এই ধরনের নজীরের যে অভাব নেই তা আমরা 'পরিশিষ্ট'-এ দেখতে পাব।

আলীম মহাশয়ের তথ্যানুসারে, এম. ই. পর্যায়ে স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আলী মহাশয়। বিদ্যালয়টি ১৯৮১ সনে উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) ও ১৯৮৯ সনে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, বিদ্যালয়টি অতীতে মাঠের পূর্বদিকে নদীর তীরে ছিল।

সূত্র ঃ

১. Administration Report of political Agency, Vol - I, D. K. Choudhuri, page - 35

২. — do — , page - 77

৩. — do —, page - 121

৪. — do —, page - 135

৫. — do — Vol - II, page - 58

৬. Administration Report of Tripura State, M. Chakraborty, Vol. - I, page - 67

৭. — do — , Vol - III, page - 1058

৮. — do — , page - 1058

৯. — do — , page - 1056

১০. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা - ২০০০, বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, পৃ - ২৭

১১. — ঐ, পৃ - ৫০

ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (B.K.I), বিলোনীয়া

১৮৭২ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে A.W.B. Power (ত্রিপুরায় ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট) সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র দুটি বিদ্যালয়ের (আগরতলা ও কৈলাসহরে) অস্তিত্বের উল্লেখ করেন।[১] ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে এছাড়াও আরো দুটি স্কুলের (একটি আগরতলায় এবং আমলিঘাটে) সরাসরি উল্লেখ এবং একটি স্কুলের (সোনামুড়ায়) পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়।[২] পরবর্তী বছরে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৬ হলেও তা বিশালগড়, আগরতলা ও কৈলাসহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণীতে C.W. Bolton ১৮টি স্কুলের উল্লেখ করেন।[৩] অর্থাৎ ঐ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২টি স্কুল খোলা হয়েছিল, যার সিংহভাগই ছিল বিশালগড় পরগণায়, তবে বাকি স্কুলগুলি অবশ্যই ঐ সময়ে ত্রিপুরার বৃহৎ জনসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রামগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বছরের রিপোর্টেই বোল্টন সাহেব উল্লেখ করেছেন— 'The principal of these valleys already contain the most flourishing sections of the population. They include the largest villages of the state, namely, Koilashar, Kamalpoor, Agartala, Bishalghar, Udaypur, and Bilonia.[৪]" তাই ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দেই বিলোনীয়ায় যে অন্তত পক্ষে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে বিলোনীয়াকে কেন্দ্র করে একটি নতুন বিভাগের পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিলোনীয়া বিভাগের উদ্বোধন হয়— 'The proposal I made sometime ago for opening a small magisterial office at Bilonia was carried out during the year under report. ...... The office was opened in July last.[৫]" ফলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটি সরাসরি বিলোনীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। তাই পরবর্তী সময়ে রাজ্যে আর্থিক দুরবস্থা হেতু রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ৩১ থেকে ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ বর্ষে ১৬-তে নেমে এলেও[৬] বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুল হওয়ায় এই পাঠশালাটির

একটানা অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এই অনুমান যে নিছকই অনুমান নয়, তার প্রমাণ মেলে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ বর্ষে সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসের বিবরণীতে— 'Except the sub-divisional schools, which have made some progress, all the other institutions are mere patshalas for primary instruction.[৭]' ঐ সময়ে সমগ্র ত্রিপুরায় মোট চারটি সাব-ডিভিশন ছিল— আগরতলা, কৈলাসহর, সোনামুড়া (প্রথমদিকে তা উদয়পুর বিভাগ নামে পরিচিত ছিল) এবং বিলোনীয়া। তাই এই রিপোর্টে এই চারটি বিভাগের সদরকেন্দ্রের স্কুলগুলির কথাই যে বলা হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ১৩০০ ত্রিং (১৮৯০-৯১ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে বিলোনীয়া বিভাগে ১টি মাত্র স্কুলের উল্লেখ দেখা যায়।[৮] এই স্কুলটি যে বিভাগীয় কেন্দ্র বিলোনীয়াতেই ছিল তা এই রিপোর্ট থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।

১৮৯০ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৮ খ্রিঃ-এর মধ্যে স্কুলটি কোনো এক সময়ে নিম্ন বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৩০৯ ত্রিং (১৮৯৯ - ১৯০০ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরেই বিলোনীয়ার এই স্কুলটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়— 'One vernacular school, that of Belonia, has been raised to the standard of Middle English ....[৯]'. ঐ বছরের বিবরণী থেকে আরো জানা যায় যে, ঐ বছরে সমগ্র বিলোনীয়া বিভাগে মোট ৬টি স্কুল ছিল যাতে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫২ জন, যার মধ্যে ৫২ জন হিন্দু, ৯০ জন মুসলমান, ১০ জন ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।[১০]

১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ - ০৫ খ্রিঃ) সনের আগে সমগ্র ত্রিপুরায় রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমী একমাত্র হাইস্কুল ছিল। অন্যান্য বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলগুলি মধ্য ইংরেজী বা মাইনর পর্যায়ের ছিল। কিন্তু বিভাগীয় কেন্দ্রগুলিতেও ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সনেই কৈলাসহরের স্কুলটিকে আগরতলার উমাকান্ত একাডেমীর ব্রাঞ্চ স্কুলরূপে উন্নীত করা হয়। ১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ) সনেই বিলোনীয়ার মধ্য ইংরেজী স্কুলটি আগরতলার হাইস্কুলটির ব্রাঞ্চস্কুল রূপে স্বীকৃতি পায়— 'The people of Belonia have long been asked for an Entrance school. The general condition of Belonia being, however, similar to that of Kailashahar. It has been decided to raise the Belonia Middle English School to the status of the school at Kailashahar.[১১]'

১৩১৮ ত্রিং (১৯০৮ - ০৯ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বিলোনীয়ার এই ব্রাঞ্চ স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো— "The Branch Schools teach up to the standard of the 3rd class of the High English School.[১২]" অর্থাৎ স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর ছাত্রদের আগরতলায় এসে উমাকান্ত একাডেমীতে

পড়তে হতো। ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯ - ১০ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বিলোনীয়া বিভাগের অন্যান্য অংশের উৎসুক ছাত্ররা যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, তার জন্য বিলোনীয়ার এই ব্রাঞ্চস্কুলটিতে বোর্ডিং হাউস ছিল— 'Both the Bilonia and Kailashahar branches also had boardings attached to them.[১৩]'

এই ব্যবস্থা কিছুদিন চলার পর ১৩২৪ ত্রিং (১৯১৪ - ১৫ খ্রিঃ) সনের মধ্যে স্কুলে নবম শ্রেণী খোলা হয় এবং ১৩২৫ ত্রিং (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ) সনে স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দশম শ্রেণী খোলা হয় ও এই সঙ্গে হাইস্কুল হিসেবে অনুমোদন লাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করে— 'To meet the local demand for higher education, matriculation classes have been opened in the branch school at Bilonia and Kailashahar, and application for the affiliation of the Bilonia school has been made to the university.[১৪]' পরবর্তী বছরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, স্কুলটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে— 'The Belonia school obtained provisional recognition by the University for 2 years.[১৫]' অর্থাৎ বিলোনীয়ার এই স্কুলটি রাজ্যের দ্বিতীয় হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, ঐ বছর বিলোনীয়া হাইস্কুল থেকে ৩ জন পরীক্ষার্থী মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্বপ্রথম পাঠানো হয়, কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়— '33 students were sent up to sit for the Matriculation Examination (of these 30 students belonged to U. K. Academy and the rest to the Bilonia School) of the year 1916-17, but owing to the leakage of questions the holding of the examination has been postponed.'

বিলোনীয়ার এই স্কুলটির হাইস্কুলে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন নামকরণও ঘটে। 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন' গ্রন্থে 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে ১৩২৪ ত্রিং (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ) বিলোনীয়া হাইস্কুলের 'ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন' নামে নামকরণের উল্লেখ থাকলেও বইয়ের মূল অংশে এই বিজ্ঞপ্তিটি না থাকায় স্কুলের নতুন নামকরণের সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। তবে একই সনের ৯ ই পৌষ একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরের ১লা মাঘ থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের সেশন শুরু করতে হবে।[১৬]' তাই মনে হয়, নতুন সেশনে ঐ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী খোলার সাথে সাথেই অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়।

আগের বছর প্রশ্ন ফাঁসের কারণে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রথম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার সুযোগ হাতছাড়া হলেও পরবর্তী বছরে কিন্তু বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন ছাত্র মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসে, যার মধ্যে মাত্র ৮ জন উত্তীর্ণ হয় (৫ জন প্রথম বিভাগে ও ৩ জন দ্বিতীয়

বিভাগে)।[১৭] এই বিদ্যালয়টি যে বিলোনীয়া বিভাগ ও অন্যান্য আশেপাশের অঞ্চলের উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী ছাত্রদের উৎসাহিত করে তুলছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) বর্ষের বিবরণীতে বোর্ডিং হাউস নির্মাণের সংবাদে— 'Two similar Boarding Houses were built for Brajendrakishore and Birbikram Institution.[১৮]' এক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে কয়টি বোর্ডিং হাউস আছে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি স্কুলের জন্যই দুটি করে বোর্ডিং হাউস— একটি হিন্দু এবং আরেকটি মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা ছিল।[১৯] ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন বিদ্যালয়টি ইতিমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদন লাভ করেছিল— 'All the High English Schools excepting the Sonamura High School, were permanently affiliated to the Calcutta University.[২০]'

অতি সম্প্রতি অর্থাৎ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারী ভাবে এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে যে 'স্মরণিকা' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা গেছে যে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যে তিনজন ছাত্র মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন, তাদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন বিপিনবিহারী দত্ত এবং অশ্বিনীকুমার কর।[২১] স্মরণিকাতে ডঃ অবণীমোহন মজুমদারের লেখা থেকে আরো জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ অঞ্চল থেকেও অনেক ছাত্র এই স্কুলে পড়তে আসতো। ডঃ মজুমদার নিজেও সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশ গ্রাম থেকে এই স্কুলে পড়তে আসতেন।[২২]

স্মরণিকাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিবেদন থেকে জানা যায় যে, অনেক পুঁথি-দলিল ও তথ্য ঘেঁটে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ নির্ণয়করা হয়।[২৩] কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ একথা বলে না। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দেই যে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই, তবে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিলোনীয়া বিভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়টি যে বিভাগীয় স্কুলের মর্যাদা লাভ করে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই পরোক্ষ প্রমাণে নিতান্তই আপত্তি থাকলে সেক্ষেত্রে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিলোনীয়া বিভাগ সৃষ্টির সময় থেকেই স্কুলটি যে তার অস্তিত্ব নিয়ে বহাল তবিয়তে চলছিল, তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।

রাজন্য আমলে ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশনের সাফল্য (মেট্রিকুলেশন)

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	মোট পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সফলতার হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	সর্বমোট	
১৩২৭ (১৯১৭ - ১৮ খ্রিঃ)	১৬	৫	৩	০	৮	৫০
১৩২৯ (১৯১৯ - ২০ খ্রিঃ)	১৩	৭	৪	১	১২	৯২৩
১৩৩০ (১৯২০ - ২১ খ্রিঃ)	২১	৯	৮	২	১৯	৯০৪৮
১৩৩১ (১৯২১ - ২২ খ্রিঃ)	১১	৪	৫	১	১০	৯০৯
১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ খ্রিঃ)	১২	৭	৫	০	১২	১০০
১৩৩৪ (১৯২৪ - ২৫ খ্রিঃ)	১৩	৭	৩	১	১১	৮৪৬২
১৩৩৫ (১৯২৫ - ২৬ খ্রিঃ)	১০	৩	৩	১	৭	৭০
১৩৩৬ (১৯২৬ - ২৭ খ্রিঃ)	১৪	৪	৫	০	৯	৬৪২৯
১৩৩৭ (১৯২৭ - ২৮ খ্রিঃ)	১৭	৫	১০	০	১৫	৮৮২৪
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ খ্রিঃ)	১২	১	১	২	৪	৩৩৩৩
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	১৬	২	৬	২	১০	৬২৫
১৩৪১ (১৯৩১ - ৩২ খ্রিঃ)	১৯	৪	৩	৪	১১	৫৭৮৯
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ খ্রিঃ)	২০	৩	৭	০	১০	৫০
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	১০	৭	৩	০	১০	১০০
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	১৪	৬	৭	১	১৪	১০০
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	১৬	২	৩	১	৬	৩৭৫
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	২১	৪	৮	৩	১৫	৭১৪৩
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিঃ)	২১	১	১৩	১	১৫	৭১৪৩
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ খ্রিঃ)	২৫	২	৮	৮	১৮	৭২
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ খ্রিঃ)	১৫	১	১	৮	১০	৬৬৬৭
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ খ্রিঃ)	১৭	৪	১	১	৬	৩৫২৯
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ খ্রিঃ)	২১	২	১	১০	১৩	৬১৯
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ খ্রিঃ)	১৪	০	১	৭	৮	৫৭১৪
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৯	০	৪	১	৫	৫৫৫৬
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ খ্রিঃ)	১০	২	২	৪	৮	৮০

*** পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত**

* ১৩৩৯ ত্রিং সনে স্কুলের একটি ছাত্র সংস্কৃতে লেটার পায়।

১৩৪৭ ত্রিং সনে একজন ছাত্র রাজ্যে তৃতীয় স্থান পায়।

১৩৪৯ ত্রিং সনে একজন ছাত্র রাজ্যে তৃতীয় হয়।

১৩৫২ ত্রিং সনে একজন ছাত্র রাজ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

সংযোজন

ছাত্রবৃত্তি

১. ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
২।	শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে	বিলনীয়া মধ্য ইং স্কুল	উচ্চ বাঙ্গালা	৪৲	চারি বৎসর
৩।	শ্রীভারতচন্দ্র দে	ঐ	ঐ	৪৲	ঐ

C. K. Bose

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১) ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

২. **বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের তালিকা**

সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ৩১শে শ্রাবণ।

মেমো নং ৩ — এ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত হারে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

ক্রমিক নঃ

৬।	শ্রী হারাণচন্দ্র বিশ্বাস	বিলোনীয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন	স্থানীয় বৃত্তি ৮৲ ৬/৭ নং ছাত্র একই স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্মধ্যে Compulsory বিষয়ে ৬নং ছাত্র প্রথম হওয়াতে বিধানানুযায়ী তাহাকেই বৃত্তি প্রদত্ত হইল।
৭।	(শ্রী আলী আজ্জম)		

উপরিউক্ত ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ১৩৩৬ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্ব-

স্ব বৃত্তি ভোগ করিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কলেজে ভর্তি হইয়া এ অফিসে রিপোর্ট করিলে সংসৃষ্ট প্রিন্সিপালের যোগে তাহাদের বৃত্তির টাকা প্রেরিত হইবে।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক,
শিক্ষা বিভাগ

শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা
প্রেসিডেন্ট

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৮৯)

সূত্র ঃ

১. Administration Report of the political Agency. Vol - I, page - 29
২. — do —, page - 78
৩. — do — , page - 135
৪. — do —, page - 121
৫. — do — Vol - II, page - 106
৬. — do — , page - 255
৭. — do — , page - 152
৮. Report on the Adm. of the State of Tipperah, page - 35.
৯. Report on Adm. of the Tripura State, Ranjit Kr. De, page - 44
১০. — do — , page - 55
১১. Tripura State Administration Report - page - 58
১২. Adm. Report of Tripura state, Vol - I, page - 206
১৩. — do — , page - 268
১৪. — do —, Vol - II, page - 588
১৫. — do — , page - 643
১৬. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৫৭
১৭. Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 767
১৮. — do — , page - 894
১৯. — do — , Vol - III, page - 994
২০. — do — , page - 1056
২১. হে অতীত কথা কও, ব্যোমকেশ দত্ত, স্মরণিকা, বি. কে. আই. পৃষ্ঠা - ২১
২২. আমার স্মৃতিতে বি. কে. আই, ডঃ অবনীমোহন মজুমদার, স্মরণিকা, পৃ ২৩
২৩. তোমার পতাকা যারে দাও, কল্যাণ ভদ্র, স্মরণিকা। পৃ - ১৮

বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

সময়টা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কোনো একটা দিন। ঐ দিনেই বর্তমান এডভাইজার চৌমুহনীর উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রখ্যাত সমাজসেবিকা অনুরূপা মুখার্জির বাড়ির সামনে একটি বড় পুকুরের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত এক তেঁতুলগাছের তলায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের দুই শিক্ষানুরাগী দৌহিত্র নবকৃষ্ণ ঠাকুর এবং ঠাকুর আনন্দমোহন দেববর্মার উদ্যোগে একটি পাঠশালা শুরু হয়।[১] সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও তাতে মহারাজের অনুমোদন ছিল। পাঠশালাটির স্থাপনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেবী লিখেছেন— 'শিক্ষানুরাগী আনন্দকৃষ্ণ মোহন ঠাকুর মহারাজের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে না পারার দুঃখও মনে জাগরুক ছিল। নিজে পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতেন ; হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত সুন্দর ; পঞ্জিকা এবং পুস্তক সংরক্ষণ তাঁর অভ্যাস ছিল। এই উন্নতমনা মানুষটি তাই নিজের বাড়িতেই বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। প্রথমে নিজের পরিজনকে দিয়েই শুরু করেন। নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে সামিল করেন। পরে পার্শ্ববর্তী এলাকার সব ছেলেমেয়েরাই আসতে লাগল।[২]'

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নতুন হাবেলী ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয় (বর্তমানে উমাকান্ত একাডেমী) হাই স্কুল পর্যায়ের ছিল। স্কুলটি প্রধানত ঠাকুর সম্প্রদায় এবং রাজকর্মচারীদের সন্তানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এবং উচ্চশ্রেণীর ঠাকুর পরিবাররা এই স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে দ্বিধা করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতেন। আলোচ্য স্কুলটিও অনেকটা এই ধরনের মানসিকতারই প্রতিফলন।

অনুরূপা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে শ্রীযুক্ত সতীশ চক্রবর্তীকে সুদূর চাঁন্দপুরের মেহেরপুর গ্রাম থেকে এনে মাস্টারমশাই নিযুক্ত করে এই স্কুলের সূচনা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে মাসিক ৫০্ টাকা বেতন শিক্ষক হিসেবে অনেক বেশি। ঐ সময়ে পাঠশালায় শিক্ষকের বেতন ১০ টাকাও থাকার কথা নয়। কারণ, ১৩৩৯ ত্রিং (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ) সনেই সমতল এলাকায় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের হার ছিল ৮ – $\frac{১}{২}$ – ১০ টাকা।[৩] এ প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মী দেবী লিখেছেন— "বিদ্যালয়ের শুরুতেই

মহারাজের অনুমোদন ছিল। শোনা যায়, ৫০ টাকা হিসেবে বিদ্যালয়টি সরকারী অনুদান লাভ করত।[৪]" এই অনুদান বার্ষিক হওয়াই সম্ভব।

বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় বিদ্যালয়ের যেসব প্রাক্তন ছাত্র বেঁচেছিলেন, তার মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন শ্রীযুক্ত পারীন্দ্র দেববর্মা। তিনি এই স্কুলে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, প্রথমদিকে এই স্কুলে সতীশ চক্রবর্তী একমাত্র শিক্ষক থাকলেও পরে পুরোহিত শ্রীযুক্ত বরদা চক্রবর্তী যোগ দেন। তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং এরপর উমাকান্ত একাডেমীতে ভর্তি হন।[৫] তাই দেখা যাচ্ছে যে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্কুলটি নিম্নবাংলা পর্যায়ের ছিল। তবে শুরুতে যে স্কুলটি পাঠশালা পর্যায়ের ছিল তা মহেন্দ্র দেববর্মা ও অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রের জবানীতেই পাওয়া যায়।

শুরুতে স্কুলটির নাম 'কৃষ্ণনগর পাঠশালা' ছিল বলে শ্রীযুক্তা করবী দেববর্মণ জানিয়েছেন।[৬] কিন্তু শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী জানিয়েছেন যে, স্কুলটির নাম আদিতে 'কৃষ্ণনগর ঠাকুর পাঠশালা' ছিল। তবে কোন্ সময়ে স্কুলটির নাম তৎকালীন দেওয়ান বিজয়কুমার সেনের নামে ভূষিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে কেউই স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেন নি। শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবীর বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের আমলেই (১৯০৯ -২৩ খ্রিঃ) স্কুলটির বিজয়কুমার সেনের নামে নামকরণ হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি প্রায়ই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে ফল বা মিষ্টি বিতরণ করতেন। প্রথমজীবনে প্রধান শিক্ষক রূপে কর্মজগতে প্রবেশ করার ফলে শিক্ষানুরাগী এই বিজয়কুমার সেন মহাশয় রাজ্যের শিক্ষা উন্নয়নে সচেষ্ট হন এবং তার এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই বিদ্যালয়ের নামকরণ দেওয়ান সাহেবের নামে করা হয়।

প্রাক্তন ছাত্র শ্রী মহেন্দ্র দেববর্মাকে স্কুলটিকে প্রথমে বিজয়কুমার পাঠশালা এবং পরে বিজয়কুমার নিম্নবাংলা স্কুল বলে অভিহিত করতে দেখা গেছে। কিন্তু সুচিন্ত ভট্টাচার্য ও সুদর্শন মুখোপাধ্যায়ের মত ভিন্ন। তাদের মতে, গোলকচন্দ্র ঠাকুরের চারকাণি ধানজমি অধিগ্রহণ ক্রমে বর্তমানে স্থানে বিদ্যালয়টি স্থাপনার সময়েই দেওয়ান বিজয়কুমার সেনের নামে এর নতুন নামকরণ হয়। অপরপক্ষে ঐ বিদ্যালয়ের প্রাচীন ছাত্র শ্রী মহেন্দ্র দেববর্মা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হওয়ার আগেই ঐ স্কুলের নাম বিজয়কুমার নিম্নবাংলা ছিল বলে জানিয়েছেন। স্কুলটি বর্তমান স্থানে আসার সময়েই অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মাইনর অর্থাৎ মধ্য-ইংরেজী (M. E.) স্কুলে উন্নীত হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন— '১৯৩২ সালে আমার পাঠশালার শিক্ষা শেষ। এখন উমাকান্ত একাডেমীতে গিয়ে class-V-এ ভর্তি হওয়ার পালা। তখন উমাকান্ত স্কুলের হেডমাস্টার * রাজেন রায়। দেখা করলাম, তিনি বললেন, তোমাদের স্কুল মাইনর স্কুল হবে, সেখানেই যাও। এদিকে বর্তমান বিজয়কুমার স্কুলের জায়গায়

একটি বড় টিনের ঘর তৈরি হল, মাস্টার নাই। এভাবে কয়েক মাস এ স্কুল সে স্কুল ঘোরাঘুরি করে বিজয় কুমার মাইনর স্কুল আরম্ভ করলাম আমরা। আমরাই ক্লাশ V এর প্রথম ছাত্র।[৭]" স্কুলটি যে এর আগে অ্যাডভাইজার চৌমুহনীর তেঁতুল গাছের তলাতেই ছিল তা ১৯২৭ সালের ছাত্র শ্রী তড়িৎ দেববর্মা এবং ১৯৩০ সালের ছাত্র শ্রী হরিপদ দেববর্মাও সমর্থন করেছেন।[৮] তাই শ্রীযুক্ত সুচিন্ত ভট্টাচার্য এবং সুদর্শন মুখোপাধ্যায়ের স্কুলের নতুন নামকরণের সময় সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্য ভুল বলেই মনে হয়।

প্রবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পারীন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন যে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্কুলটি একটি বড় ছনের ঘরে বসত, ৪০-৫০ জন ছাত্র এতে পড়ত।[৯] শ্রীযুক্তা অনুরূপা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, স্কুলঘরটি তাঁর ছেলেবেলায় ২২ হাত লম্বা দোচালা ছনের ছানিওয়ালা ঘর ছিল।[১০] ১৯৩০ সালের ছাত্র শ্রী মহেন্দ্র দেববর্মার মতে, স্কুলটি আনুমানিক ১৫০-২০০ হাত লম্বা এবং ১৫-২০ হাতের মতো প্রস্থে ছিল। ছনের ছাউনি ও তরজার বেড়া। ৫টি কাঠের দরজা ও ৬টি জানালা। এতে কোনো পার্টিশন ছিল না। লম্বা লম্বা টুল নিয়ে ক্লাসগুলি ভাগ করা ছিল। শিক্ষকদের জন্য একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। ঘরটি ছিল পূর্বমুখী, উত্তর অংশে ক্লাস ওয়ান এবং ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে হেড মাস্টারের অফিস কক্ষ, আলমারি দিয়ে পৃথক করা।[১১]

স্কুলটির বর্ণনা মহেন্দ্র দেববর্মার প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ফুটে উঠলেও স্কুলটির আকার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেববর্মার ধারণা যে অতিরঞ্জিত ছিল, তা স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দেববর্মার জবানীতে জানা যায় যে, তখন স্কুলে তিনজন শিক্ষক ছিলেন— প্রধান শিক্ষক ঁসতীশ চক্রবর্তী, ঁমহেন্দ্র দেববর্মা এবং ভুবনমোহন দেববর্মা ওরফে ফেলু মাস্টার। শ্রীযুক্ত দেববর্মার বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, শিক্ষকরা স্কুলে পড়িয়ে পড়া নিতেন। এছাড়া আরো জানা যায় যে, প্রশাসন থেকে প্রতি বছরই তহশীল কাছারীতে অঙ্ক, নামতা, পাইকিয়া, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ইত্যাদির পরীক্ষা নেওয়া হতো। স্কুলগুলি থেকে সেরা ছাত্রদের নাম পাঠানো হতো। পরীক্ষায় ভালো ফল করলে ৫, ৩, ২ এবং ১ টাকার পুরস্কার দেওয়া হতো। মহেন্দ্র দেববর্মার সহপাঠী ব্রজবিহারী রায় জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়ে পাঁচ টাকা পুরস্কার পান।[১২] এছাড়া মহারাজের পক্ষ থেকে প্রতি বছরে গরীব ছাত্রদের জন্য সাত হাতি ধুতি ও শার্ট দেওয়া হতো। এর ব্যয়ভার মেটানো হতো মহারাজের সংসার তহবিল থেকে এবং স্কুল থেকেই গরীব ছাত্রদের নাম সুপারিশ করা হত।

স্কুলটিতে কি কি পড়ানো হত, তাও প্রাক্তন ছাত্রদের আলোচনায় উঠে এসেছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ছাত্র শ্রী পারীন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, ঐ সময়ে প্রথম শ্রেণীতে তিনি বাল্যশিক্ষা ও ধারাপাত পড়েছেন, এছাড়া সুন্দর করে হাতের লেখাও শেখানো হতো। এরপর বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজী ফার্স্টবুক পড়েছেন (চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত)। তবে, ১৯২৩ সালের ছাত্র মোহিত

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তখন প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল সাহিত্য সোপান, কোমল কবিতা ও ধারাপাত। এছাড়া বাড়ি থেকে হাতের লেখা খাতায় করে আনতে হতো এবং স্কুলে এসে ১ থেকে ১০০ শ্লেটে লিখতে হতো।[১৩] ১৯৩০ সালের ছাত্র মহেন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন যে, তাঁর সময়ে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য ছিল বাল্যবোধ, সরল ধারাপাত ও আদর্শ লিপি। আবার ১৯৪৩-৪৪ সনের ছাত্রী সবিতা দেববর্মণের সময়েও বাল্যশিক্ষা ও ধারাপাত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য ছিল।[১৪]

১৯৪১-৪২ সালের ছাত্র মোঃ কালা মিএগা জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ে স্কুলটিতে ২০০ জনের মতো ছাত্র ছিল। আগরতলা ও তার আশেপাশে একমাত্র উমাকান্ত একাডেমী ও বিজয়কুমার স্কুল ছাড়া বালকদের জন্য আর কোনো মাইনর স্কুল না থাকায় চন্দ্রপুর, ধলেশ্বর, বনমালীপুর, বড়জলা, বড়দোয়ালী ও প্রতাপগড় অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এই স্কুলে পড়তে আসত। এমন কি শহরের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের ধলেশ্বর, কেন্দুয়াই, উমেদপুর, বাউতলা, সোনারবাদী প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও ছাত্ররা পড়তে আসত। ত্রিপুরী ও মণিপুরীদের শিক্ষা অবৈতনিক ছিল, অন্যদের বেতন দিতে হতো।[১৫]

১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরের ১লা মাঘ থেকে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের আদেশক্রমে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে চারটি স্কুলকে কেন্দ্র করে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়— "Free compulsory primary education was introduced under the state Act 2 of 1342 T. E. in the Agartala Municipal area since the 1st Magh under orders of His Highness the Maharaja Manikya Bahadur. Consequently 4 free Primary schools were started, the U. K. Academy building, Tulsibati Girl's School building, Bejoy Kumar M. E. School house and Thakurpalli L. V. School House providing for their accommodation, each for each, during the morning hours.[১৬]" এই প্রাইমারী বিভাগে ছেলে ও মেয়েরা উভয়েই পড়তে আসত, কিন্তু মূল স্কুলটি শুধুমাত্র বালকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। অন্ততঃ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে স্কুলটি মাইনর পর্যায়েরই ছিল তা বিভিন্ন প্রাক্তন ছাত্রদের রচনা থেকেই জানা যায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় বলে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা রাজলক্ষ্মী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় অর্থাৎ হাই স্কুলে পরিণত হয় এবং ১৯৬৫ সাল থেকে বিদ্যালয়টি একাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে স্কুলটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।[১৭] ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার সময় থেকেই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা
নং ৩ বিজয়কুমার স্কুল

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বালকের সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	কুমারগণ	ঠাকুর	ত্রিপুরী	বাঙালী হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ইং)	১২	৯৩	১০৫	০	২১	১৫	৬৭	১	১
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ ইং)	২৬	৭৫	১০১	০	২২	১৫	৫৩	৬	৫
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ ইং)	৩৫	৮৪	১১৯	০	২৬	১৩	৭৬	৪	০
১৩৪৫ (১৯৩৫ -৩৬ ইং)	৩৩	৮৩	১১৬	১	১২	১৮	৭১	১৪	০
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ইং)	৫১	৭৩	১২৪	০	১৬	২১	৭৩	১৪	০
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ ইং)	৫৭	৮৮	১৪৫	০	১৯	০	৭৮	১১	৩৭
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ ইং)	৮৬	৯৩	১৭৯	১	৩২	০	১৩৫	৯	১
১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ ইং)	১০০	৮৭	১৮৭	৩	৪৪	০	১৩০	৯	১
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ইং)	১০৪	৮৫	১৮৯	০	৫১	০	১২৭	১০	১
১৩৫১ (১৯৪১ - ৪২ ইং)	১০৫	৯২	১৯৭	০	৫৩	০	১৩৮	৬	০
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ইং)	৮৩	৭০	১৫৩	০	৩৭	০	১১১	৫	০
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ইং)	৮৮	৭০	১৫৮	০	৩৮	০	১১৬	৪	০
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ইং)	৭৭	৭৮	১৫৫	০	৩৬	০	১১৪	৫	০
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ইং)	৯২	৮৪	১৭৬	০	৪৭	০	১২১	৭	১

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

তথ্যসূত্র ঃ

১. শতবর্ষ স্মরণিকা, বিজয়কুমার বিদ্যালয়, পৃ - ৫২
২. — ঐ — , পৃ - ৫৩
৩. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, সম্পাদকের নিবেদন, (১৩)
৪. শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ৫৩
৫. — ঐ — , পৃ - ৬৬
৬. — ঐ — পৃ - ৬২
৭. — ঐ — পৃ - ১০
৮. — ঐ — পৃ - ৬৭
৯. — ঐ — , পৃ - ৬৬
১০. শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ৫২
১১. — ঐ — , পৃ - ৯
১২. — ঐ — , পৃ - ৩১
১৩. — ঐ — , পৃ - ২২
১৪. — ঐ — , পৃ - ২০
১৫. — ঐ — , পৃ - ১৭
১৬. Administration Report of Tripura State, Mahadev Chakraborty,·Vol - IV, page - 1609
১৭. শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ৫৪

কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কমলপুর

এবার আমরা শতবর্ষ পূর্ত্তি সম্পর্কিত যে বিদ্যালয়টির আলোচনা করতে উদ্যত হয়েছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে ১৩২৯ ত্রিং সনে তার প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। স্কুলটির নাম কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯ - ২০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে বলা হয়েছে— "The Kamalpur L. V. School was raised to be an M. E. School.[১]" এই রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, এর আগে কমলপুরের স্কুলটি নিম্ন-বাংলা স্কুল ছিল। কিন্তু কমলপুরের এই নিম্ন-বাংলা স্কুলটি কবে পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা স্তরে উন্নীত হয়েছিল অথবা কমলপুরের এই স্কুলটি পাঠশালা হিসেবে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা কোনো অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। তাই কমলপুরের এই স্কুলটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা একমাত্র পরোক্ষ তথ্যাদির (collateral evidence) সাহায্যে অনুমান করা সম্ভব।

পাবর্ত্য ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ অথবা তারও আগে যে সকল বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তার মধ্যে কমলপুর অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট A. W. B. Power-এর বিবরণীতে কমলপুরের নাম আছে— "Mr Chennell left Koilashur on the 15th December for Kamalpore where he was delayed about a week.[২]"

১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ সনের রিপোর্টে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে পাঁচটি বাজারের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কমলপুরের নাম আছে—"Five markets, viz, at Udaypore, Bishalgarh, Devi Bazar, Farnah Dharm Nagar and Kamalpore, are held in the interior of the hil country.[৩]" আবার ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ সনের বার্ষিক রিপোর্টে C.W. Bolton লিখেছেন— "They include the largest villages of the State, namely, Koilashar, Kamalpoor, Agartala, Bishalgarh, Udaipur , and Bilonia.[৪]" অর্থাৎ ঐ সময়ে কমলপুর রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বসতির মধ্যে একটি ছিল। তাই স্পষ্টতই ঐ সময়ে রাজ্যের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই বসতিগুলিতেও প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৬-

৭৭ খ্রিঃ সনে রাজ্যে যে ছয়টি স্কুল ছিল, তাতে কমলপুরের নাম ছিল না। স্কুলগুলি আগরতলা ও কৈলাসহরকে কেন্দ্র করেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু ১৮৭৭-৭৮ খ্রি ঃ সনে রাজ্যের স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ১৮-তে দাঁড়ায়।[৫] যদিও এই স্কুলগুলির মধ্যে বেশ কিছু বিশালগড় পরগণায় খোলা হয়েছিল, তবু রিপোর্টে ......"and there has been a real advance in the matter of primary education" এই বক্তব্যে রাজ্যের অন্যান্য অংশেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ইঙ্গিত মেলে। তাই বিশালগড়ের সঙ্গে সঙ্গে কমলপুরেও ঐ সঙ্গে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা যে হয়, তা যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ Bolton উল্লিখিত ছয়টি যে বৃহৎ গ্রামের উল্লেখ আছে, তার বাকি চারটি গ্রামেই (রাজধানী সহ) স্কুল ছিল।

আর্থিক অব্যবস্থার কারণে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা যখন উনিশ শতকের শেষাংশে অর্ধেকে নেমে আসে, তখনও কৈলাসহর বিভাগে স্কুলের সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে রাজ্যে যে মোট ১৬টি স্কুল ছিল তার মধ্যে কৈলাসহর বিভাগেই ৯টি স্কুল ছিল।[৬] ১৮৯০-৯১ খ্রিঃ বর্ষেও দেখা যায় রাজ্যের ১৯টি স্কুলের মধ্যে কৈলাসহর বিভাগে ৮টি স্কুল ছিল।[৭]

ঐ সময়ের পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিভিন্ন বছরের রিপোর্টগুলি থেকে কৈলাসহর বিভাগে উল্লেখযোগ্য বসতি বলতে কমলপুর, চিরাকুটি, ধর্মনগর ও খোজাই-এর নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কমলপুর, চিরাকুটি ও ধর্মনগরে পুলিস থানা ছিল।[৮] এই থানাগুলি কুকীদের আক্রমণ থেকে মণিপুরী ও বাঙালী বসতিগুলিকে রক্ষা করত। কমলপুরের মণিপুরীদের উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৭৮-৭৯ খ্রিঃ সনের রিপোর্টে জানা যায়— "In the state there are Manipuri settlements at Agartala, Bishalgarh, Berjoil, Kamalpur and Koilashur.[৯]" এই কমলপুরের গুরুত্ব যে কতটা বেশি ছিল, তা জানা যায় ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে দেখা যায় যে, তখন রাজ্যে ৮টি দাতব্য ডিসপেন্সারি (চিকিৎসালয়) ছিল। সদর বিভাগে রাজধানীতে, পুরাতন আগরতলা ও খোয়াই-এ ; সোনামুড়া ও বিলোনীয়াতে একটি করে এবং কৈলাসহর বিভাগে কৈলাসহর, কমলপুর ও ধর্মনগরে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি অবস্থিত ছিল।[১০] এদের মধ্যে খোয়াই ও ধর্মনগর পরে আলাদা বিভাগ হয়ে যায়। ঐ সময়ে কমলপুর ডিসপেন্সারিতে ২৬৫ জন, খোয়াই ডিস্পেনসারিতে ৯৬ জন এবং ধর্মনগর ডিস্পেনসারিতে মাত্র ৪৪ জন রোগী চিকিৎসা পায়। তাই বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে খোয়াই ও ধর্মনগর থেকে কমলপুরে জনসংখ্যা বেশি ছিল। কোনো বসতিতে আধুনিক চিকিৎসালয় থাকবে অথচ পড়াশুনার কোনো ব্যবস্থা অর্থাৎ স্কুল থাকবে না, এই ধরনের অনুমান নিতান্তই অসঙ্গত। চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয় বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় অপেক্ষা বেশি হওয়ায় কোনো লোকালয়ে সাধারণত বিদ্যালয়ই প্রথমে গড়ে উঠে। [যেমন, ১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬ - ০৭ খ্রিঃ) সনে কমলপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য

ব্যয় ৪০৩ টাকা অথচ নিম্নবাংলা স্কুলের গড় ব্যয় ১৪০৮৮ টাকা ও পাঠশালার গড় ব্যয় ৫৬৭০ টাকা]। তাই কমলপুরের স্কুলটি যে ১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ সনের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

১৮৭৭-৭৮ রাজ্যে ১৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তা ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বাধিক অর্থাৎ ৩১-এ দাঁড়ায়। তারপরই আর্থিক দুরবস্থার কারণে পরের বছরই স্কুলের সংখ্যা ১৫-তে নেমে আসে। এই লুপ্ত স্কুলগুলি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের। রাজ্যের প্রধান বসতিগুলিতে, প্রধানত, কৈলাসহর বিভাগে উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলিতে (বিশেষ চিরাকুটি, কমলপুর ও ধর্মনগর), এক্ষেত্রে বিশেষত ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত কমলপুরের পাঠশালাটি যে একটানা বেঁচেবর্তে ছিল, তার অনুমানে খুব একটা সমস্যা থাকে না।

মধ্য-ইংরেজী (এম.ই.) স্কুলে উন্নীত হওয়ার পর ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১খ্রিঃ) সনে কমলপুর একটি নতুন বিভাগে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় স্কুল হিসেবে এই স্কুলটির হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হলেও ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪ - ২৫ খ্রিঃ) সন থেকে এই বিভাগটি লুপ্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা এম. এই. স্কুল পর্যায় পর্যন্তই থেকে যায়। রাজন্য আমলের পর স্কুলটি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর অন্যান্য এম. ই. স্কুলগুলির মতই শেষ পর্যন্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৩-৫৪ খ্রিঃ সনে রাজ্যে ছেলেদের জন্য ২৩টি হাইস্কুল ছিল[১১]। বিভাগীয় স্কুল হওয়ায় ঐ সময়ে কমলপুরের স্কুলটি যে হাইস্কুল ছিল, তা নিশ্চিত।

সংযোজন

পুরস্কার বিতরণ

নং ২৮৮৩-৮৪ সন ১৩৩৮ ত্রিং, তাং ২৭শে পৌষ।

		স্কুল লাইব্রেরীর জন্য	পুরস্কার বিতরণের জন্য	
১।	শ্রীযুত বিচিত্রকুমার সিংহ চৌধুরী	৫্	৫্	কমলপুর মধ্য ইং
২।	শ্রীযুত দয়াশঙ্কর তেওয়ারী	০	১০্	স্কুলের পারিতোষিক
৩।	শ্রীযুত আমানদ্দি	১০্	৫্	বিতরণী সভায় পার্শ্ব লিখিত
৪।	শ্রীযুত সেকান্দর মিঞা	৫্	০	বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ
৫।	শ্রীযুত গণ সিংহ	২	০	বালকদের উৎসাহ বর্ধনার্থ
৬।	শ্রীযুত গোপীচাঁদ সিংহ	২	০	সাহায্য প্রদান করিয়া

৭। শ্রীযুত গোকুলচাঁদ সিংহ	২ / ২৬	০ / ২০	এ বিভাগের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন,

ইতি ২১/৯/৩৮ ত্রিং।
শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষাবিভাগ

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৯৪)

তথ্যসূত্র ঃ

১. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, Vol - II, page - 767

২. Administration Report of the Pol. Agency, Dipak Choudhury, Vol- I, page - 18

৩. — do —, page - 77

৪. — do —, page - 121

৫. — do —, page - 135

৬. Adm. Report of Political Agency, Vol-II, page - 207

৭. Report on the Administration of the state of Tipperah, 1890-91, page - 35

৮. Adm. Report of Pol. Agency. Vol - II, page - 27

৯. — do —, page - 16

১০. The Adm. Report of Tripura State (1894-95), page - 53

১১. Tripura District Gazetters, page - 323

খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, খোয়াই

রাজন্য যুগে খোয়াই বিভাগের জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে। এ বিষয়ে ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) সনের প্রশাসনিক রিপোর্টে লেখা আছে— "Towards the close of the year under report, a new Sub-Divisional office was opened at Khowae, and a competent officer of the rank of Sub-Deputy collector has been placed incharge of it.'" 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও জানিয়েছেন যে, ধর্মনগর ও খোয়াই বিভাগ প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৩০৫ / ১৩০৬ ত্রিং সনে স্থাপিত হয়েছিল। তাই এটা নিশ্চিত যে, তৎকালীন শিক্ষানীতি অনুসারে খোয়াই বিভাগীয় কেন্দ্রে একটি পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮-৯৯ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে খোয়াইয়ের এই বিভাগীয় পাঠশালাটি বাদে এই বিভাগে আর কোনো স্কুল ছিল না। এই রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, ঐ স্কুলটিতে মোট ২২ জন ছাত্র ছিল এবং সবাই ছিল মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত।[২] অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, খোয়াই বিভাগীয় কেন্দ্রে মণিপুরী ছাড়া আর অন্য কোনো সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল না।

ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের ১৮৮৫-৮৬ খ্রিঃ বর্ষের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে নদীপথে বনজ সম্পদ বাংলাদেশে রপ্তানির সময় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে ৯টি ঘাট ছিল, তার মধ্যে খোয়াই একটি।[৩] এই ঘাটগুলিকে বনকর ঘাট বলা হতো। এরা বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে নদীর তীরে অবস্থিত হতো। একে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠত। যেমন মুহুরী নদীর তীরে বিলোনীয়া, গোমতী নদীর তীরে সোনামুড়া ইত্যাদি। বিলোনীয়া শহরের উপকণ্ঠে বনকর ঘাট এখনও পূর্বের স্মৃতি বহন করে চলছে। খোয়াই-এ এই বনকর ঘাটকে কেন্দ্র করেও একটি বসতি গড়ে উঠেছিল, যাতে মূলতঃ মণিপুরীরাই কেন্দ্রীভূত ছিল। তবে এই বিভাগের সমতল অঞ্চলগুলিতে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে লোকের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ বর্ষ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল— 'The Sub-Divisional Officer of Koylashar made considerable endeavours to get men from sylhet for reclaming the waste lands in the pargana

Dharmanagar and in Khaiauri. ..... Khaiauri is an extensive tract of fertile lands, bounded on three sides by hills and on one side by the river Khoai, which is navigable for a good portion of the year.[৪]" ১৮৮৬-৮৭ খ্রিঃ বর্ষের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, Khaiauri অঞ্চলে বাইরে থেকে কৃষক এনে বসানোর কাজ ভালোভাবেই এগুচ্ছিল— "the Sub-Divisional Officer of Koylashar is making laudable attempts for getting cultivation extended in the Dharmanagar valley and in the Khaiauri Hakar (হাওড় ?). He is granting for the purpose permanent leases to actual cultivators on progressive jama, with a right to hold free for the first few years. ......[৫] ফলে খোয়াই বিভাগে সদর কেন্দ্র ছাড়াও কিছু অঞ্চলে বাঙালী বসতি গড়ে উঠে। এছাড়া মণিপুরীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে C.W. Bolton লিখেছেন— "It will be observed from the return that the Manipuri pupils , Boys and Girls, are most numerous than those of the other races.[৬]" তাই ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ খোয়াই বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সেখানে পাঠশালাটির অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৩০৯ ত্রিং (১৮৯৯ - ১৯০০ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে খোয়াই বিভাগে দুটি স্কুল ছিল এবং দুটি স্কুলে সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২, যার মধ্যে ১৩ জন মণিপুরী, ১৪ জন ত্রিপুরী ও ৫ জন বাঙালী হিন্দু।[৭]

১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের প্রশাসনিক রিপোর্ট থেকে খোয়াই-এর পাঠশালাটির অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়— "These institutions are situated at the headquarters of some of the divisions of the state. At the headquarters of the other divisions there were primary schools or pastalas.[৮]" এক্ষেত্রে প্রথম লাইনের 'These institutions' বলতে মধ্য-ইংরেজী অথবা উচ্চ-বাংলা স্কুলের কথা বলা হয়েছে। ঐ সময়ে কৈলাসহর, বিলোনীয়া, সোনামুড়া ও ধর্মনগরে মোট ৪টি মধ্য-ইংরেজী স্কুল ছিল এবং সদর আগরতলায় বালকদের জন্য একটি ও বালিকাদের জন্য একটি (বর্তমানের তুলসীবতী স্কুল) উচ্চ বাংলা স্কুল ছিল। কাজেই বিবরণী অনুসারে তখন খোয়াই-এর স্কুলটি পাঠশালা পর্যায়ের ছিল। 'রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা' গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এর সমর্থন মেলে। ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সাকুর্লার নং ৩ থেকে জানা যায় যে, ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় খোয়াই স্কুলের ছাত্র শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ত্রিপুরা মাসিক ২ টাকা হারে দুই বৎসরের জন্য ছাত্রবৃত্তি পায় (পৃষ্ঠা - ৩৪১)। এটি ঐ সময়ে খোয়াই স্কুলের অস্তিত্বের প্রমাণও বটে।

১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছরে খোয়াই বিভাগে স্কুলের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৬ হয় এবং ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ১১৫-তে পৌঁছায়, যার মধ্যে ১১ জন মণিপুরী, ৭৯ জন ত্রিপুরী, ১০ জন বাঙালী হিন্দু, ১৪ জন বাঙালী মুসলমান এবং ১ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত।[৯] এ থেকে বুঝা যায় যে, ত্রিপুরীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টায় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, খোয়াই বিভাগীয় স্কুলটি বাদে বাকি স্কুলগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। খোয়াই বিভাগীয় এই স্কুলটিতে ঐ বছরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮, যার মধ্যে ১০ জন মণিপুরী এবং ৮ জন বাঙালী হিন্দু।[১০] এ থেকে খোয়াই-এ তখনকার জনবসতির বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। খোয়াই বিভাগের অন্যত্র বাকী যে পাঠশালাগুলি অবলুপ্ত হয়েছিল, সেগুলি মূলতঃ ছিল পার্বত্য অঞ্চলের ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য। জুমচাষে অভ্যস্ত পার্বত্য উপজাতিরা কিছুদিন পরপরই নতুন জমির সন্ধানে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটায় স্কুলগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

খোয়াই-এর বিভাগীয় স্কুলটি কখন পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা স্কুলে পরিণত হয়েছিল তা জানা না গেলেও ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬ - ১৭ খ্রিঃ) সনের আগেই যে নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছিল, তা নিশ্চিত। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— "স্থানীয় পাঠশালাটিকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নত করা, সাধারণের জন্য পাঠাগার স্থাপন, টাউন হল নির্মাণ প্রভৃতি অন্যান্য হিতকর কার্যের সূত্রপাতও তৎসময়ে (অর্থাৎ ১৩২০ ত্রিং) চলিতেছিল।[১১]" এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনের অব্যবহিত পরেই পাঠশালাটি নিম্নবাংলা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরই খোয়াই-এর নিম্ন-বাংলা স্কুলটি মধ্য-ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়— "The L.V. School at Khowai was raised to the status of M. E. School.[১২]"

স্কুলটি সম্পর্কে এরপর বেশ কিছু সময় কোনো তথ্য না পাওয়া গেলেও ১৩৩৬ ত্রিং (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ) সনের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে পার্বত্য প্রজাদের জন্য স্কুলটিতে একটি বোর্ডিং হাউস খোলা হয়েছিল— "There was also another Tippera Boarding House attached to Khowai M. E. School which also received due attention of the Department.[১৩]" স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেদের উদ্যোগেই এই বোর্ডিং হাউসটির নির্মাণ খরচ বহন করেছিল— "The local hill people enthusiastically collected funds to provide this Insititution with a permanent house. The Department agreed to sanction all necessary recurring expenditure for this Institution, special grants being made during the year for a cook and a private

Tutor.[১৪]"

এই সময়ে সারা রাজ্যে খোয়াই-এর এই স্কুলটির সঙ্গে যুক্ত উল্লিখিত ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসটি ছাড়া পার্বত্য শিক্ষার্থীদের জন্য শুধুমাত্র আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীতে একটি ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস ছিল। ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনের 'সেন্সাস বিবরণী' থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে খোয়াই বিভাগের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ভাবে দুই-তৃতীয়াংশই ছিল পার্বত্য প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আগেই দেখেছি যে, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের আগ্রহ থাকলেও নানা কারণে এই বিভাগে স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। জুমচাষই এর একটি প্রধানতম কারণ হলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষায় অগ্রগতি যে ব্যাহত হচ্ছিল, তার প্রতি ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— "খোয়াই বিভাগের প্রজাগণ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই অনুন্নত। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও নিম্ন শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু যে শ্রেণীর লোক সামান্য বেতনে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের দ্বারা মোটের উপর বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না। এই শিক্ষা বিতরণের পদ্ধতির উন্নতি বিধান করা কর্তব্য।[১৫]"

তাই এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাবর্ত্য প্রজাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। এই আগ্রহের প্রমাণ আমরা পাই ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে, খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে আরেকটি ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস খোলার সংবাদে।"[১৬]

যাই হউক, স্কুলটিতে ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস যুক্ত হওয়ায় উপজাতি ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে যায়। ১৩৩৮ ত্রিং (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে বোর্ডিং-এর ছাত্রসংখ্যা জানা না গেলেও বোর্ডিংটিকে স্থায়ী ভাবে নির্মাণ খরচের এক-তৃতীয়াংশ P.W.D বিভাগ দিতে সম্মত হয় বলে জানা যায়।[১৭] পরের বছরের বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৩৩৮ ত্রিং সনে বোর্ডিং-এ ১৪ জন উপজাতি ছাত্র ছিল এবং তাদের দেখাশুনা ও কোচিং-এ দায়িত্বে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল— "Two tutors were appointed to coach the boys both in the morning and in the evening, and one of the tutors was engaged to look after the boarding management.[১৮]" পরের বছর এই সংখ্যা বেড়ে ৩২ হয় এবং ১৩৪১ ত্রিং (১৯৩১ - ৩২খ্রিঃ) সনে বোর্ডিং-এর ছাত্রসংখ্যা ৪১-এ পৌছায়।[১৯] ১৩৪৩ ত্রিং (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনে ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে আবাসিক ছাত্রসংখ্যা সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৬১-তে দাঁড়ায়। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার এই আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে বোর্ডিং পরিচালনার জন্য গ্র্যাজুয়েট সুপারিটেন্ডেন্ট রাখা হয় এবং বোর্ডিং-এর আবাসিক ছাত্রসংখ্যা আরো বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরেকটি নতুন গৃহ নির্মাণ করা হয়— "A spacious newly built house was provided at a cost of Rs. 2000 offering accommodation for 100 hill boys. The number on the roll is gradually increasing showing an increasing

interest of the hill people for education.[২০]"

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ ও আশা পূর্ণ হয় নি, পরবর্তী বছরগুলিতে ছাত্রসংখ্যা সামান্য কমেছে বই বাড়েনি।

খোয়াই স্কুলের বোর্ডিং হাউসে উপজাতি ছাত্রসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রসংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রসংখ্যা
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ ইং)	১৪	১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ ইং)	৬০
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ ইং)	১৪	১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ ইং)	৪১
১৩৪০ (১৯৩০-৩১ ইং)	৩২	১৩৪৯ (১৩৩৯ - ৪০ ইং)	৫৫
১৩৪১ (১৯৩১ - ৩২ ইং)	৪১	১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ ইং)	৫৩
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ ইং)	৪৭	১৩৫১ (১৯৪১ - ৪২ ইং)	৪০
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ইং)	৬১	১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ ইং)	৪৯
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ ইং)	৬০	১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ ইং)	৫১
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ ইং)	৪৬	১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ ইং)	৫২
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ইং)	৬০	১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ ইং)	৪৮

* পরিসংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট বছরে অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

যাই হউক, এসব উদ্যোগ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, খোয়াই-এর এই মধ্য ইংরেজী স্কুলটিকে ঘিরে প্রচুর প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ধীরে ধীরে স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীতকরণের প্রয়াস শুরু হয়। খোয়াই-এর মধ্য ইংরেজী স্কুলটির প্রথমে ব্রাঞ্চ হাইস্কুল এবং পরে হাইস্কুলে রূপান্তরের সংবাদ আমরা পাই ১৩৪৭-৪৯ ত্রিং (১৯৩৭-৪০ খ্রিঃ) সনের ত্রিবার্ষিক প্রতিবেদনে— "In the year 1347 T. E. and 1348 T. E. there were 6 permannetly affiliated High Schools and 1 Branch for Boys and in 1349 T. E. 7 permanently affiliated H. E. schools for Boys.[২১]"

প্রথমোক্ত ৬টি হাইস্কুল হচ্ছে উমাকান্ত একাডেমী, আর. কে. আই, কৈলাসহর, বি. কে. আই, বিলোনীয়া, বি. বি. আই, ধর্মনগর, এন. সি. আই. সোনামুড়া এবং কে. বি. আই. উদয়পুর, যাদের আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এই সপ্তম স্কুলটির পরিচয় এই রিপোর্টে না থাকলেও পরবর্তী ত্রি-বার্ষিক প্রতিবেদনে এই ছয়টি হাই স্কুলের সঙ্গে খোয়াই হাইস্কুলের উল্লেখ দেখে আমরা পূর্ববর্তী রিপোর্টে উল্লিখিত স্কুলটির পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হতে পারি। ১৩৪৯

ত্রিং (১৯৩৯ - ৪০ খ্রিঃ) সনেই খোয়াই-এর এই স্কুলটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়ে যায় এবং নবম শ্রেণী খোলা হয়। এর আগে ১৩৪৭ ত্রিং (১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ) সনেই স্কুলটিতে সপ্তম শ্রেণী খোলার মাধ্যমে হাই স্কুলে উত্তরণের যাত্রা শুরু হয়। ১৩৫০ ত্রিং সনে (১৯৪০ - ৪১ খ্রিঃ) এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পাঠানো হয়। ১৩৫০-৫২ ত্রিং (১৯৪০ - ৪৩ খ্রিঃ) সনের ত্রিবার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর খোয়াই হাইস্কুল থেকে ৬ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল এবং ৬ জন পরীক্ষার্থীই কৃতকার্য হয় (১ জন ১ম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ জন তৃতীয়বিভাগে)।[২২] এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় আগের অন্যান্য স্কুলগুলির মতো খোয়াই-এর স্কুলটির নতুন কোনো নামকরণ হয় নি। একে খোয়াই উচ্চ ইংরেজী স্কুল (Khowai H. E. School) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রাজন্য আমলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় খোয়াই উচ্চ ইংরেজী স্কুলের সাফল্য

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	মোট পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সফলতার হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট	
১৩৫০ (১৯৪০-৪১ খ্রিঃ)	৬	১	৩	২	৬	১০০
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ খ্রিঃ)	১১	১	১	৩	৫	৪৫৪৫
১৩৫৩ (১৯৪৩ - ৪৪ খ্রিঃ)	৮	০	৫	১	৬	৭৫
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৬	০	০	৫	৫	৮৩৩৩
১৩৫৫ (১৯৪৫ - ৪৬ খ্রিঃ)	১৩	০	২	৮	১০	৭৬৯২

* তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

** ১৩৫২ ত্রিং স্কুলের একজন ছাত্র রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. The Administration Report of Tripura State (TRI), page - 28

২. Report on Administration of Tripura State, R. K. De, page - 28

৩. Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, Vol - II, page - 173

৪. — do —, page - 141

৫. — do —, page - 193

৬. — do —, Vol-I, page - 135

৭. Report on Adm. of Tripura State, R. K. De, p - 55

৮. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, Vol - I, page - 67

৯. —do —, page - 139

১০. — do —, page - 165
১১. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর (খোয়াই বিভাগ) পৃ - ৮
১২. Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 644
১৩. — do —, Vol - III, page - 1197
১৪. —do —, page - 1197
১৫. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর (খোয়াই বিভাগ), পৃ - ৮
১৬. Adm. Report of Tripura State, Vol - IV, page - 1611
১৭. — do — Vol - III, page - 1349
১৮. — do —, page - 1427
১৯. — do —, page - 1504
২০. — do —, Vol - IV, page - 1695
২১. — do —, page - 2060
২২. — do —, page 2134

সংযোজন

ছাত্রবৃত্তি

১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১৫।	শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ত্রিপুরা	খোয়াই	পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি	২	দুই বৎসর

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারব

(উৎস ঃ রাজন্যী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার ইতিহাসে ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উমাকান্ত একাডেমীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মতই মেয়েদের শিক্ষার ইতিহাসে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু নেহাতই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে এই স্কুলটির উদ্ভব। যতদূর জানা যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন যুবরাজ রাধাকিশোরের দ্বিতীয় পত্নী তুলসীবতী রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকায় একটি প্রবন্ধে পূর্বতন প্রধান শিক্ষিকা অপরাজিতা রায় লিখেছেন— "পাঠশালা রূপেই তুলসীবতী বিদ্যালয়ের আরম্ভ রাজবাড়ির অন্দরে ১৩০৩ ত্রিপুরাব্দের ২৬ চৈত্র- ৯ই এপ্রিল, ১৮৯৪। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা শেফালী সেন রাজবাড়ি গিয়ে, রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে অনুসন্ধান করে তারিখটি সংগ্রহ করেন।[১]" এই পাঠশালাটি যে নেহাতই রাজপরিবারের ব্যক্তিগত ছিল, তা বোঝা যায় ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ ত্রিং) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট দেখে। এতে দেখা যায় যে,ঐ সময়ে রাজ্যে শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত ৩৫টি স্কুলের মধ্যে একটিও বালিকাদের স্কুল ছিল না এবং একজনও ছাত্রী ছিল না। যুবরাজ -পত্নী তুলসীদেবীর ব্যক্তিগত আয় থেকেই ঐ স্কুলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণের পরই খুব সম্ভবত স্কুলটিকে সাধারণ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। স্কুলটির প্রতিষ্ঠার সময়ে তা বর্তমান জগন্নাথবাড়ী সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল বলে প্রাচীন ছাত্রী নীরদবালা চৌধুরানী জানিয়েছেন। তিনি আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলে ভর্তি হন।[২] তিনি ছিলেন ঐ সময়ের রাজচিকিৎসক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব চৌধুরীর কন্যা। তিনি যখন এই স্কুলে ভর্তি হন, তখন স্কুলটি বর্তমান উমা-মহেশ্বরী মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। এ বিষয়ে শ্রীমতি অনুরূপা মুখার্জী আরো লিখেছেন— "মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সূচনা হয় লাল মহলের কাছে (আজ যেখানে টাউন হল) একটি ছনের ঘরে, যেটাকে জোতঘর বলা হত।[৩]" এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, রাজ অন্তঃপুরে যে এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয়, তা কি শ্রীমতি মুখার্জীর অজানা? এর একটাই মাত্র উত্তর হতে পারে যে, জগন্নাথ মন্দিরের পাশে পূর্বের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের

স্কুলটি রাজপ্রাসাদের বাইরের কোনো ছাত্রীর কাছে হয়তো উন্মুক্ত ছিল না। রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরেই স্কুলটিকে সাধারণ্যে উন্মুক্ত করার সাথে সাথে তাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এর ফলেই বর্তমান টাউন হল সংলগ্ন শ্রীমতি অনুরূপা মুখার্জী বর্ণিত জোতঘরে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে থাকাকালীন পাঠশালাটির কোনো নাম ছিল কি না, তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি, তবে অনেকে তখন স্কুলটির নাম 'বালিকা বিদ্যালয়' অথবা 'আগরতলা বালিকা বিদ্যালয়' ছিল বলে অনুমান করেন। বর্তমান লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘির পূর্ব পাড়ে অবস্থিত উমা-মহেশ্বরী মন্দিরের উত্তরে বর্তমান টাউন হল এলাকায় শ্রীমতি অনুরূপা মুখার্জী বর্ণিত জোতঘরে বিদ্যালয়টি চলে আসার সময়েই তার "মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়" নামকরণ হয় বলেই শ্রীমতি মুখার্জী তখন এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয় বলে জেনে এসেছেন। প্রথম যুগের ছাত্রী শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানী অগ্নিকান্ডে স্কুলঘর পুড়ে যাওয়ায় বিদ্যালয়টি জগন্নাথবাড়ী অঞ্চল থেকে উমা-মহেশ্বরী মন্দিরের উত্তরে চলে আসে বলে জানিয়েছেন।[৪]

পরবর্তী সময়ে স্কুলটি লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘির পূর্ব পাড় থেকে প্রভুবাড়ীর পশ্চিমে চলে আসে। কিন্তু কখন এই স্থানান্তরণ ঘটে সে বিষয়ে মতভেদ বর্তমান। এ বিষয়ে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন যে, ভূমিকম্পে পুরাতন রাজবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়ার সময় অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে অথবা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় স্কুলটি প্রভুবাড়ীর পশ্চিমে চলে আসে।[৫] এই তথ্যের সমর্থনে তিনি লিখেছেন যে, প্রভুবাড়ির পশ্চিমে অর্থাৎ বর্তমানে স্কুলের হোস্টেল ইত্যাদি অঞ্চলে রবীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঠাকুরদার বসতবাটি ছিল। শ্রীযুক্ত রবীনবাবুর পিতার জন্ম ৫ই ভাদ্র, ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দ (১৮৯৭ খ্রিঃ)। তার জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই ঐ স্থান স্কুলবাড়ির জন্য নির্বাচিত হওয়ায় রবীনবাবুর পিতামহকে অন্যত্র যেতে হয়। অপর পক্ষে, ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ছাত্রী শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানী জানিয়েছেন, তিনি যখন ঐ সময়ে ভর্তি হন, তখন স্কুলটি উমা-মহেশ্বরী মন্দিরের উত্তর দিকেই অবস্থিত ছিল।[৬] এক্ষেত্রে শ্রীমতি নীরদবালা দেবী প্রত্যক্ষ ছাত্রী হওয়ায় তার বক্তব্যের যথার্থতা অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে হয়। তবুও এই তথ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে এ সম্পর্কে আরো আলোকপাত প্রয়োজন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় তাতে তৎকালীন রাজপ্রাসাদ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাধাকিশোর মাণিক্যের একটি নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন প্রাসাদের জন্য নির্বাচিত জমির মধ্যে বিদ্যালয়টি পড়ে যাওয়ায় একে পুনরায় স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজেই নতুন রাজপ্রাসাদের নির্মাণের সময়কালের মধ্যেই বিদ্যালয়টি কবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় যে স্মরণিকাটি

প্রকাশ করা হয়, তাতে শ্রীযুক্ত রবীন সেনগুপ্ত ও ডঃ মহাদেব চক্রবর্তীর প্রাসাদের নির্মাণ সম্পর্কিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। এর মধ্যে রাজপ্রাসাদের নির্মাণ প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত রবীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে অধিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল (১০ বৈশাখ, ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দ) নতুন রাজপ্রাসাদের শিলান্যাস করা হয়।[৭] এ প্রসঙ্গে তিনি ভিত্তিপ্রস্তরের খোদিত শ্লোক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের শিলালিপি সংগ্রহ পুস্তক থেকে উদ্ধৃতও করেন। তিনি এই প্রবন্ধে আরো জানান যে, শিলান্যাস যে জায়গায় করা হয়েছিল, পরে সেই জায়গাটি অনুপযুক্ত বিবেচনায় আরো পূর্ব ও দক্ষিণে সরে এসে প্রাসাদের নির্মাণকার্য শুরু হয়। ফলে পূর্বতন রাজপ্রাসাদের সামনে 'কৃষ্ণসাগর' নামে যে অপেক্ষাকৃত ছোট দীঘিটি ছিল তার উত্তর অংশ ভরাট করে একে আরো দক্ষিণ ও পূর্বে সরিয়ে বর্তমান অবস্থায় আনা হয় (বর্তমানে দীঘিটি দুর্গাবাড়ি দীঘি নামে পরিচিত) এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই দীঘিটির সামান্য পূর্বদিকে একই মাপে 'রাধাসাগর' (বর্তমানে লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘি নামে পরিচিত) কাটা হয়।[৮] কিন্তু ১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮ - ৯৯ ত্রিং) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে এমন কিছু পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে এতে লেখা আছে— "The big tank facing the site for the new palace which was begun in the previous year was completed during the year under report.[৯]"

এক্ষেত্রে শিলান্যাসের স্থান নির্বাচনে যে সমস্যার কথা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। M/s Martin & Co. পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই স্থান নির্বাচন করবেন, তা খুব একটা বিশ্বাস উদ্রেক করে না। সম্ভবতঃ কৃষ্ণসাগরটিকে পূর্বে ও দক্ষিণে বর্ধিত করে এর আকার বড় করা হয়েছিল এবং ১৮৯৮–৯৯ খ্রিস্টাব্দের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে যে দীঘিটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা খুব সম্ভবতঃ রাধাসাগর বলেই মনে হয়, অর্থাৎ প্রাসাদের শিলান্যাসের আগেই দীঘির খননকার্য শেষ করা হয়েছিল, পরে নয়। একই রিপোর্টে রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "This work has been entrusted to Messrs. Martin & Co., a firm of contractors in Calcutta, and it is making a fair progress.[১০]" রিপোর্টটি জমা দেওয়া হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট। তাই ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে শিলান্যাস হলেও নির্মাণকার্য এরই মধ্যে দ্রুত চলছিল, তা বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে, শুধু রাজপ্রাসাদ নির্মাণই রাধাকিশোর মাণিক্যের উদ্দেশ্য ছিল না, আগরতলা শহরের উন্নয়নের পরিকল্পনাও তাঁর মনে সমানভাবে কাজ করছিল। ভি. এম. হাসপাতাল, উমাকান্ত একাডেমীর সুরম্য স্কুলগৃহ, অফিসঘর, সেন্ট্রাল রোড নির্মাণ, আখাউড়া খাল খনন ইত্যাদির মাধ্যমে আগরতলা শহরকে একটি পরিকল্পিত রূপদানের জন্য তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর এই পরিকল্পনার মধ্যে কালিকা বিদ্যালয়টিও যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই জন্যই প্রভুবাড়ির পশ্চিমে স্থান স্কুলটির জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, যার জন্য রবীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঠাকুরদাকে ঐ স্থান

থেকে চলে যেতে হয়েছিল। এই স্থানের আশেপাশের অঞ্চল (বর্তমানের চিলড্রেন্স পার্ক ইত্যাদি) জলাভূমি সদৃশ থাকায় 'রাধাসাগর' দীঘির মাটি দিয়ে এইসব অঞ্চল ভরাট করা হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন সেনগুপ্ত লিখেছেন— "উক্ত দীঘির মাটি দিয়ে পার্শ্ববর্তী জলাভূমি ভরাট করে রাজপথ, উদ্যান, প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থান নির্বাচিত করে রাখা হয়েছিল।[১১]" অর্থাৎ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট অনুসারে ১৩০৮ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকেই দীঘি খননের কাজ শেষ হওয়ায় ঐ সময়ে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচিত স্থান মাটি ভরাট হয়ে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। পরের বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ অঞ্চলে তখনও কাজ চলছিল— রাজপ্রাসাদের পাদদেশ থেকে তৎকালীন হাওড়া নদীর পাড় পর্যন্ত (তখন হাওড়া নদী বর্তমান মোটর স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে শিবমন্দিরের কাছ দিয়ে বয়ে যেত)। এ প্রসঙ্গে রিপোর্টে লেখা রয়েছে— "A new road called the Central Road leading from the foot of the Palace to the river-side was projected and part of it finished during the year under report ; as the alignment further on lies over some old filthy excavations these have to be filled up before the road can be completed.[১২]" কাজেই এই সেন্ট্রাল রোডের অন্ততঃ রাজপ্রাসাদ থেকে আখাউড়া খাল পর্যন্ত কর্মতৎপরতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে মেয়েদের স্কুলের স্থানান্তরণের সম্ভাবনা যথেষ্ট কম বলেই মনে হয়, অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগের আগে স্কুলটি পূর্ব স্থানে অর্থাৎ বর্তমান টাউন হলের নিকটেই অবস্থিত ছিল ধরে নেওয়া যায়, যা শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানীর বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে এরপর কখন এখানে আসে তা সুনিশ্চিত ভাবে জানা না গেলেও খুব শীঘ্রই যে চলে আসে তা নিশ্চিত। এরপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের সময় পূর্ব বাংলার গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ার আগরতলায় এলে সামান্য দক্ষিণে সরে বর্তমান জায়গায় স্কুলের জন্য পাকাবাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে ১৩১৯ ত্রিং সনের (১৯০৯ - ১০ খ্রিঃ) অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বলা হয়েছে — "His honour Sir Lancelot Hare, Lieutenant Governor of Eastern Bengal and Assam was pleased to lay the foundation stone of the school buidling, during his visit to Agartala on the occasion of the Installation ceremony.[১৩]" এর আগে খড়ের ছাউনি দিয়ে বাঁশ-তরজার ঘরেই স্কুলটি বসত। অবশ্য রাজন্য আমলের শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে এই একটি পাকাঘরই ছিল। এতে প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা বসতেন এবং দুই-তিনটি উঁচু ক্লাসের পড়াশুনা হতো, বাকিদের জন্য ছন-বাঁশের ঘরে ক্লাস হতো।

১৩০৭ ত্রিং (১৮৯৭-৯৮ইং) বর্ষ থেকে স্কুলটি সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার সময়ে খুব সম্ভবত, তা পাঠশালা পর্যায়েরই ছিল। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের (আনুমানিক) ছাত্রী শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানী তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন— 'ইস্কুলে তো আসিলাম ; ইস্কুল সে সময়ে পাঠশালা।

মান- নিম্ন প্রাইমারী পর্যন্ত। সেকথা আজ মনে হয় না।.... আমরা স্কুলে থাকার ৪/৫ বৎসরের মধ্যেই আরও ২/৩ জন শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্কুল ক্রমে পাঠশালা হইতে নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ প্রাইমারী, মাইনর সেকশন প্রভৃতি পর্যায়ে উন্নীত হয়।[১৪]" ১৩০৯ ত্রিং (১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায়— "The number of pupils at the Maharanee Tulsibati Girls' School has increased from 32 to 39. Some of the Girls are now preparing for the Lower Vernacular Examination.[১৫]" কিন্তু Lower Vernacular অর্থাৎ নিম্নবাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল সুযোগ পেত। এই রিপোর্টটির জমা দেওয়ার তারিখ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, অন্তত ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়া থেকেই অর্থাৎ ১৩০৮ ত্রিং সনের শেষভাগে (তখন মাঘ মাস থেকেই সাধারণতঃ স্কুলের পঠন-পাঠন শুরু হত) স্কুলটি পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানীর স্মৃতি এখানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 'সেকথা এখন মনে হয় না'— স্বীকৃতির মধ্যেই এই ভুলের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, "আধুনিক ত্রিপুরা ঃ প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য" গ্রন্থে ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ঐ সময়কার নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ও বিদ্যালয়ের উচ্চতর স্তরগুলিতে উন্নীতকরণের সময়কাল নিয়ে ভিন্ন তথ্য সরবরাহ করায় এক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "নারীমুক্তির পুরোধা রূপে মহারানী তুলসীবতী ১৩০০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজবাড়িতেই একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬]" কিন্তু ১৩০০ ত্রিং এবং ১৩০৪ ত্রিং সনের রিপোর্টে এর স্বপক্ষে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না অথবা অন্যান্য তথ্য দ্বারাও তা সমর্থিত হয় না। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ছাত্রী শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানী লিখেছেন— "যতদূর মনে পড়ে আমি স্কুলে পড়ারও ৫/৬ বছর আগে মহারানী তুলসীবতী বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়।[১৭] দ্বিতীয়তঃ শ্রীমতি অপরাজিতা রায়ের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল) রাজপরিবার থেকেই সংগৃহীত। ডঃ গোস্বামী কোন্ সূত্র থেকে এই তথ্য পেয়েছেন তা তিনি উল্লেখ না করায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। দ্বিতীয়তঃ স্কুলটির নিম্নবাংলা (এল. ভি.) পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার দুটি সময়কাল তিনি দিয়েছেন। একটি ১৮৯৭ খ্রিঃ এবং অপরটি ১৯০১-০২ইং সনে[১৮]।" একই পৃষ্ঠায় দুই ধরনের তথ্য আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং তথ্যের উৎস হিসেবে তিনি অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্টগুলিকে উল্লেখ করলেও রিপোর্টগুলিতে এমন তথ্য নেই।

যাই হউক, ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের (১৩০৯ ত্রিং) রিপোর্ট থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, অন্ততঃ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়া থেকে (১৩০৮ ত্রিং) স্কুলটিকে নিম্নবাংলা (এল. ভি.) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কখন স্কুলটিকে উচ্চ বাংলা (এইচ.

ভি.) বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় সে বিষয়ে সুনিশ্চিত বলা যায় না, কারণ ১৩১০ ত্রিং এবং ১৩১১ ত্রিং সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ১৩০৯ ত্রিং সনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ১৩১০ ত্রিং সনে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিম্নবাংলা বৃত্তির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাই পরবর্তী শ্রেণীতে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ করে দিতে ১৩১০ ত্রিং (১৯০০-০১ খ্রিঃ) সনের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতেই স্কুলটিকে উচ্চ বাংলা পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন, নতুবা নিম্নবাংলা ছাত্রবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়েই বিদ্যালয়টি উচ্চ বাংলা (এইচ. ভি.) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

১৩১২ ত্রিং (১৯০২ - ০৩ ইং) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, তখন দুটি e ÂB a Â õ [১৯]এই রিপোর্টে ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা এবং তাদের কি ধরনের শ্রেণীবিভাগ ছিল তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও তা কি পর্যায়ের বিদ্যালয় ছিল, তারও উল্লেখ নেই। তবে এতে দুইজন ছাত্রী নিম্নবাংলা বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তা বলা হয়েছে।[২০] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে নিম্নবাংলা (চতুর্থ শ্রেণী) পর্যায়েরও পরবর্তী ক্লাসে ছাত্রীরা পড়তে পেতো। ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ ইং) সনের রিপোর্টেও দুটি উচ্চ বাংলা স্কুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু এদের মধ্যে তুলসীবতী স্কুলটি অন্তর্ভুক্ত কি না তা জানা যায়না।[২১] তবে ঐ বছরে স্কুলে আরো দুই জন শিক্ষক নিয়োগ প্রমাণ করে যে, স্কুলটি পাঠশালা অথবা নিম্নবাংলা পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের ছিল— "During the year a lady teacher and an assitant master were appointed and the manangement of the school was placed in the hands of the Thakur Boarding Committee.[২২]" কিন্তু ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ - ০৫ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে প্রদত্ত তালিকা পূর্ব বছরের অর্থাৎ ১৩১৩ ত্রিং সনে মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ বাংলা বিদ্যালয় যে ছিল তা দেখানো হয়েছে। তালিকাটি নিম্নরূপ —[২৩]

	1314T.E.	1313 T.E.
Second Grade Arts College	0	1
Higher class English School	2	1
Middle English School	3	4
Higher Vernacular School for boys	1	1
Higher Vernacular School for girls	1	1
Lower Vernacular School	6	5
Pathshalas	91	88
Technical School	1	1
Sanskrit Tol	1	1
Total	**106**	**103**

যেহেতু ১৩১২ ত্রিং (১৯০২ - ০৩ খ্রিঃ) সন থেকে হাইস্কুল, মধ্য ইংরেজী স্কুল (M. E.) এবং উচ্চ বাংলা (H.V.) স্কুলের সংখ্যার কোন পরিবর্তন ১৩১৩ ত্রিং সনে হয়নি, অতএব ১৩১২ ত্রিং সনের উক্ত দুই উচ্চ বাংলা স্কুলের মধ্যে যে একটি বালিকা বিদ্যালয় অর্থাৎ মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে কৈলাসহরের তিনটি বালিকা বিদ্যালয় নেহাতই পাঠশালা পর্যায়ের ছিল। তাই মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় যে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের আগেই অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতেই উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় সেই অনুমানের সত্যতার সমর্থন অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকেও মেলে। কিন্তু ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী তাঁর "প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য" গ্রন্থে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চ বাংলা পর্যায়ে উন্নীত করণের সময়কাল ১৯০৬-০৭ ইং বলে কেন যে দেখিয়েছেন তা বোধগম্য নয়।[২৪] আসলে ১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে উপরে বর্ণিত তালিকায় উল্লিখিত দুইটি উচ্চ বাংলা (Higher Vernacular) স্কুলের মধ্যে মেয়েদের স্কুলটির সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে—
"Besides, there were two Higher Vernacular schools at Agartala, one for boys and one for girls. The latter is the Maharani Tulsibati girl's School at Agartala.[২৫]"

স্কুলটি সরকারী ভাবে অধিগৃহীত হলেও তার প্রতি মহারানী তুলসীবতীর যে যথেষ্ট নজর ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩১২ ত্রিং সনের রিপোর্টে— "The Maharani Tulsibati Girls School at Agartala is doing good work silently. Her Highness the Maharani is always pleased to take a personal interest in it.[২৬]" শুধু মহারানী তুলসীবতীই নন, পরবর্তীকালে রাজবাড়ীর মহারানীদের কাছেও স্কুলটি যথেষ্ট যত্ন ও উৎসাহ পেতো। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৯/১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ছাত্রী শ্রীযুক্তা নীরদবালা চৌধুরী লিখেছেন— "রাজবাড়ী ও সরকার হইতে কত না উৎসাহ আনন্দ তখন আমরা পাইয়াছি। কারণে বা অকারণে যে কোনো উৎসব উপলক্ষে স্কুল হইতে আমরা বালিকারা গিয়াছি রাজবাড়ীতে পুরস্কার আনিবার জন্য-স্বয়ং মহারানীর নিকট হইতে। তখন বালিকাদের ক্লাসে ১ম, ২য় হওয়ার প্রাইজ সব মেয়েরাই বই, পুতুল, বিস্কিট-লজেন্স, খাতা-পেন্সিল, সেলাই-এর জিনিষ পাইত।[২৭]" এতসব উৎসাহদানের পরও বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা প্রত্যাশিত ছিল না। মধ্যযুগীয় পরিবেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না, মেয়েরা বলতে গেলে, পর্দানশীলই ছিল। অল্পবয়সেই তাদের পাত্রস্থ করা হতো, ফলে তাদের বেশির ভাগের পক্ষেই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকায় যে সকল প্রবীণা স্কুলের স্মৃতিচারণ করেছেন তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বছর ছাত্রীসংখ্যার সারণী পর্যালোচনা করলেই উপরোক্ত কারণের জন্য যে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হয়েছিল তা বুঝা যায়।

মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিং)	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিং)	ছাত্রী সংখ্যা
১৩০৮ (১৮৯৮-৯৯ ইং)	৩২	১৩৩০ (১৯২০-২১ইং)	৮১
১৩০৯ (১৮৯৯-১৯০০ইং)	৩৯	১৩৩১ (১৯২১-২২ইং)	৬৬
১৩১১ (১৯০১-০২ইং)	৪২	১৩৩২ (১৯২২-২৩ইং)	১০৬
১৩১২ (১৯০২-০৩ইং)	৪৬	১৩৩৩ (১৯২৩-২৪ইং)	৯৩
১৩১৩ (১৯০৩-০৪ইং)	৫১	১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ইং)	৯৯
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ইং)	৭৯	১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ইং)	৭০
১৩১৫(১৯০৫-০৬ইং)	১১৫	১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ইং)	৮৫
১৩১৬(১৯০৬-০৭ইং)	৮৪	১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ইং)	৭৫
১৩১৭ (১৯০৭- ০৮ইং)	৮৫	১৩৩৮ (১৯২৮-২৯ইং)	৬৬
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ইং)	৫৪	১৩৩৯ (১৯২৯-৩০ইং)	৫৬
১৩১৯ (১৯০৯-১০ইং)	৬৫	১৩৪০ (১৯৩০-৩১ইং)	৮৭
১৩২০ (১৯১০-১১ইং)	৭৬	১৩৪১ (১৯৩১-৩২ইং)	৮৫
১৩২১ (১৯১১-১২ইং)	৭৪	১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ইং)	৮৯
১৩২২ (১৯১২-১৩ইং)	৭৬	১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ইং)	৭৭
১৩২৩ (১৯১৩-১৪ইং)	৬৭	১৩৪৪ (১৯৩৪-৩৫ইং)	৬৮
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ইং)	১১২	১৩৪৫ (১৯৩৫-৩৬ইং)	৭৪
১৩২৫ (১৯১৫-১৬ইং)	৮০	১৩৪৬ (১৯৩৬-৩৭ইং)	১২১
১৩২৬ (১৯১৬-১৭ইং)	৭৬	১৩৪৭ (১৯৩৭-৩৮ইং)	১৫৩
১৩২৭ (১৯১৭-১৮ইং)	৮২	১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ইং)	১৪৩
১৩২৮ (১৯১৮-১৯ইং)	৭৫	১৩৪৯ (১৯৩৯-৪০ইং)	৩৭৩
১৩২৯ (১৯১৯-২০ইং)	৭৮		

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্টগুলি থেকে গৃহীত।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমতি বিন্দুপ্রভা চন্দ (বিবাহের পর উপাধি রায়)-এর স্মৃতিচারণার উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করি। তিনি লিখেছেন— আমার বড়দি " সুবর্ণপ্রভা আনুমানিক ১৯০৯ থেকে ১৯১২/১৩ সন অবধি তুলসীবতীতে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন। বড়দি পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন। নয়/দশ বছর বয়সে বড়দির যখন বিয়ে হয় তখন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক " অমরচাঁদ মিত্র বাড়ীতে এসে অভিভাবকদের অনুরোধ করেছিলেন, বড়দিকে কিছুদিন পরে বিয়ে দিতে। অমরচাঁদ বাবুর আশা ছিল বড়দি সে বছর বৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে স্কুলের সুনাম বাড়াবে।[২৮]" শ্রীমতি বিন্দুপ্রভাও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পড়া শেষ করেছিলেন।

১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি চারুবালা দত্তের উদ্যোগে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে যখন ছাত্রীদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে কোচিং-এর ব্যবস্থা চালু হয়, তখন সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে ছাত্রী খুব কমই থাকত। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রী শ্রীমতি জ্যোৎস্না চক্রবর্তী লিখেছেন— ''আমাদের সময়ে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা খুব কম ছিল। মনে পড়ে তখন দশম শ্রেণীতে কোনো ছাত্রী না থাকায় ননীদিকে ডবল প্রমোশন দিয়ে নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়। প্রতি ক্লাসে ৫/৭ জনের বেশি ছাত্রী ছিল না।[২৯]'' এই ননীদি ডাঃ আভা রায়ের বড় বোন বিভারানী সরকার, পরে মজুমদার। একই সময়ের শ্রীমতি সাহানা সেনও এই ডবল প্রমোশনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৩০] এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে আগরতলার রক্ষণশীল পরিবেশে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা কতটা কঠিন ছিল, একমাত্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও শিক্ষিত উদারচেতা পরিবারের মেয়েরাই এই দুর্লভ সুযোগের অধিকারী হতো।

স্কুলটি বালিকা বিদ্যালয় হলেও সূচনায় খুব সম্ভবতঃ অল্পসংখ্যক ছেলেরাও মেয়েদের সঙ্গে পড়ত। কিন্তু কোন অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টেই এই ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ নেই ; অথচ ১৮৯৯ / ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ছাত্রী শ্রীমতি নীরদবালা চৌধুরানীর বক্তব্যকেও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। তিনি লিখেছেন— ''এইটুকুন মনে পড়ে আজ কো-এডুকেশন সর্বত্র দেখিতেছি। পঞ্চান্ন বছর আগে বালিকা বিদ্যালয়ে আমরাও ত্রিপুরার এই কো-এডুকেশনের সূচনা দেখিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে সর্বমোট জন ২৫/৩০ পড়ুয়া। তার মধ্যে বালকছাত্রও ৫/৭ জন ছিল।[৩১]'' কিন্তু পরবর্তী প্রাচীন ছাত্রীদের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবস্থার কথার উল্লেখ নেই। তাই মনে হয়, প্রথমদিকে নিম্নশ্রেণীগুলিতে স্বল্পসংখ্যক বালকের উপস্থিতি থাকলেও পরবর্তী কালে তা লোপ পেয়ে এই স্কুল একমাত্র বালিকাদের স্কুল হয়ে উঠে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্কুলটি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ার পর অন্ততঃ ১৮৯৯ সনের প্রথমভাগেই তা নিম্নবাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং ১৯০১ খিস্টাব্দের গোড়াতেই তা উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনে একজন মহিলা শিক্ষিকা এবং একজন সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার ঠাকুর বোর্ডিং কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। ১৩১৯ ত্রিং সনে স্কুলের জন্য পাকাবাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর ১৩২৫ ত্রিং (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ) সনে বিদ্যালয়টিকে মাইনর পর্যায়ে (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) উন্নীত করা হয়— "This school has been raised to an M.E. school since the beginning of the current year.[৩২]" এক্ষেত্রে M. E. অর্থাৎ Middle English (মধ্য ইংরেজী), যাকে মাইনর স্কুল বলা হত। স্কুলটিকে মাইনর পর্যায়ে উন্নীত করার সঙ্গে উঠ্‌তি বয়সের ছাত্রীদের জন্য মহিলা শিক্ষিকা নিযুক্ত করার

চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এর আগে প্রধানত পুরুষ শিক্ষক দিয়েই ক্লাস চালানো হত, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বয়স্ক .... "but to make it more suitable for the education of the grown-up girls, it has been decided to gradually replace the male teachers by competent Mistresses.[৩৩]" আর এরই ফলশ্রুতিতে ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ইং) সনে একজন গ্র্যাজুয়েট প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়— "One graduate Head Mistress was appointed.[৩৪]" আর ঐ বছর থেকেই ছাত্রীদের বাড়ি থেকে স্কুলে আনা-নেওয়ার জন্য সরকারী উদ্যোগে বাস চালানো শুরু হয়— "The Department has arranged to provide an Omnibus for conveyance of the Girls." তবে এই ব্যবস্থা বিনামূল্যে ছিল না, প্রাচীন ছাত্রীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, এরজন্য মাসিক একটা নির্দিষ্ট হারে বাসভাড়া অভিভাবকদের দিতে হত। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতি বিন্দুপ্রভা চন্দ (পরে রায়) লিখেছেন— "ষষ্ঠ / সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্কুলে প্রথম বাস চালু হয়। ভাড়া মাসে আট আনা।[৩৫]"

তুলসীবতী স্কুলে এই প্রথম মহিলা প্রধান শিক্ষিকার নাম শ্রীমতি চারুবালা দত্ত। ছাত্রীদের কাছে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল প্রচন্ড। তিনি কেবলমাত্র ছাত্রীদের মাইনর পর্যায় অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি নিজের কোচিং-এর মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসাবার জন্য প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ফলে ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সন থেকে বিদ্যালয়েই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্য শিক্ষাবিভাগ বিশেষ অনুমতি প্রদান করে— "By special permission of this Department some Girls were allowed to continue their higher studies in this school under the graduate Head Mistress.[৩৬]" প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোন্ ছাত্রী প্রথম সাফল্য পায় সে সম্পর্কে প্রাচীন ছাত্রীদের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্রীমতি বিন্দুপ্রভা রায় (চন্দ) এবং শ্রীযুক্তা সাহানা সেনের মতে, ১৯২৯ সনে অধরবাশী সরকারের বড় মেয়ে শ্রীমতি প্রভাবতী সরকার (পরে তালুকদার) তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্তা কল্যাণী চন্দের মতে, গগন মুন্সী (দত্ত)-এর কন্যা কিরণ দত্ত প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী হিসেবে মহারানীর কাছ থেকে সোনার দুল পেয়েছিলেন (তুলসীবতী বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে ছাত্রীদের উচ্চতর শ্রেণীতে কোচিং দেওয়ার পর, শ্রীমতি সাহানা সেনের বক্তব্য অনুসারে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের এক আদেশ অনুসারে স্কুলে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। আদেশে নাকি আরো বলা হয় যে, মাইনর স্কুল থেকে এভাবে আর পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি চারুবালা দত্ত এত সহজে হাল ছাড়লেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদনের জন্য লেখা হলে পরিদর্শক এসে এক বছরের অনুমোদন দেন।[৩৭] কিন্তু এ বিষয়ে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে কিছুটা ভিন্ন চিত্র পাই। প্রতিটি বছরের রিপোর্টেই

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৫০-৫২ ত্রিং (১৯৪০-১৯৪৩ ইং) বর্ষের রিপোর্টেই স্কুলটির প্রথমে ব্রাঞ্চ হাইস্কুল এবং পরে হাইস্কুলে রূপান্তরের উল্লেখ করা হয়েছে— "In the year 1350 T. E. there were 7 permanently affiliated High English Schools for boys and one branch H. E. School for girls, while in 1351 and 1352 T. E. there were 8 permanently affiliated H. E. Schools (7 for boys and 1 for girls).[৩৮]" অর্থাৎ ১৩৫১ ত্রিং (১৯৪১-৪২ খ্রিঃ) সনেই স্কুলটি পূর্ণাঙ্গরূপে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৩৫৩ ত্রিং (১৯৪৩-৪৪খ্রিঃ) সনে বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীরা রেগুলার হিসেবে প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসে।

রাজন্য আমলে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্য (মেট্রিক)

সন (ত্রিপুরাব্দ)	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	সফল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা				সাফল্যের হার %
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট	
১৩৫৩ (১৯৪৩-৪৪খ্রিঃ)	৫	—	১	৩	৪	৮০
১৩৫৪ (১৯৪৪-৪৫খ্রিঃ)	৬	—	২	২	৪	৬৬৭
১৩৫৫ (১৯৪৫-৪৬খ্রিঃ)	৯	—	২	৫	৭	৭৭৮

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের সময় উমাকান্ত একাডেমীর বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যোগ দেন।[৩৯] ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩খ্রিঃ) সনের এক আদেশনামায় ঐ বছরের মাঘ মাস থেকে শহরের অন্য তিনটি স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়েও সকালবেলায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়।

২নং তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বালকের সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা	মোট	কুমার গণ	ঠাকুর	ত্রিপুরী	বাঙালী হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	১২	৮০	৯২	০	৬	৬	৮০	০	০
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	১৬	৮০	৯৬	০	১২	০	৮০	০	৪
১৩৪৪ (১৯৩৪-৩৫ খ্রিঃ)	২৯	৮২	১১১	০	৬	০	৯৩	২	১০
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	৪৩	১০০	১৪৩	০	২৯	৭	১০২	৫	০
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	৬১	৮১	১৪২	০	৩	০	১৩২	০	৭
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিঃ)	৬৮	৯৮	১৬৬	০	৫	৯	১৪২	৭	৩
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ খ্রিঃ)	৮৮	১০১	১৮৯	০	৫	১	১৭৪	১	৮

মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

১৩৪৯ (১৯৩৯ - ৪০ খ্রিঃ)	৯৯	১১২	২১১	০	১১	৮	১৮২	৪	৬
১৩৫০ (১৯৪০ - ৪১ খ্রিঃ)	১১৮	৯৭	২১৫	০	১২	০	১৯১	৮	৪
১৩৫১ (১৯৪১-৪২ খ্রিঃ)	১১৯	১৩৮	২৫৭	০	৭	১	২২৩	১৯	৭
১৩৫২ (১৯৪২-৪৩ খ্রিঃ)	১১৭	১২২	২৩৯	০	৯	১	২১২	১৭	০
১৩৫৩ (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ)	৬৯	৬০	১২৯	০	১১	২	১০৮	৪	৪
১৩৫৪ (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ)	৯০	৮৭	১৭৭	০	৬	৩	১৬৩	১	৪
১৩৫৫ (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ)	১২২	১৩১	২৫৩	১	৭	১৪	২২১	৮	২

* পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

স্কুলটিতে কর্তা ও ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কন্যাগণ পড়ত বলে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। ফলে রাজ্যে নারীশিক্ষার জন্য যে ব্যয় হতো তার সিংহভাগই মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ধার্য ছিল। যদিও অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে রাজ্যে নারীশিক্ষার জন্য অথবা এই স্কুলটির জন্য ব্যয় কত ছিল তার উল্লেখ নেই, তবুও যেসব ক্ষেত্রে এই ব্যয়ভারের উল্লেখ আছে, তা থেকে তুলসীবতী স্কুলের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়।

রাজন্য আমলে রাজ্যে নারীশিক্ষার জন্য ব্যয়

সন (ত্রিপুরাব্দ)	তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়			অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়সমূহ			
	পর্যায়	ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয়ের শতাংশ	মোট সংখ্যা	পর্যায়	ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয়ের শতাংশ
১৩১৩ (১৯০৩ - ০৪ খ্রিঃ)	উচ্চ বাংলা	৬৭৩	NA	৪	পাঠশালা	NA	NA
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ)	ঐ	১০৩২	NA	৪	ঐ	NA	NA
১৩১৬ (১৯০৬ - ০৭ খ্রিঃ)	ঐ	১৫৩৪	NA	৬	ঐ	NA	NA
১৩১৭ (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ)	ঐ	১৩২১	৭৫ ৯%	৮	ঐ	৪২০	২৪ ১%
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	ঐ	১৪২০	৭২ ৯%	৮	ঐ	৫২৮	২৭ ১%
১৩১৯ (১৯০৯ - ১০ খ্রিঃ)	ঐ	১৩৫৮	৭৩ ৬%	৯	ঐ	৪৮৬	২৬ ৪%
১৩২০ (১৯১০-১১ খ্রিঃ)	ঐ	১৩৬৯	৬৬ ০%	১০	ঐ	৭০৫	৩৪ ০%
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	ঐ	১৩৫৪	৬৪ ৩%	১১	ঐ	৭৫২	৩৫ ৭%
১৩২২ (১৯১২ - ১৩ খ্রিঃ)	ঐ	১২৪১	৬৬ ২%	১১	ঐ	৬৩৫	৩৩ ৮%
১৩২৩ (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ)	ঐ	১২৩৩	৫৯ ৭%	১১	ঐ	৮৩৪	৪০ ৩%
১৩২৪ (১৯১৪ - ১৫ খ্রিঃ)	ঐ	১২৪১	৫৯ ২%	১১	ঐ	৮৫৪	৪০ ৮%

পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালে কোন্ শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন, তা জানা না গেলেও ১৮৯৯/১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্কুলের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনগুপ্ত।[৪০] এর পরবর্তী যে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম জানা যায়, তিনি হলেন অমরচাঁদ মিত্র। এরপর স্কুলটি M.E. (মধ্য ইংরেজী) স্কুলে উন্নীত হওয়ার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রীযুক্তা চারুবালা দত্ত, যিনি ছাত্রীদের কাছে "গুরুমা" নামে খ্যাত ছিলেন।

সংযোজন

১। শ্রীযুক্ত নীরদবালা চৌধুরানী লিখেছেন— "যতদূর মনে পড়ে এই স্কুল হইতে শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরী (যিনি এই ইস্কুলেই শিক্ষিকার কাজ করিয়া গিয়াছেন) মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছিলেন" (শতবর্ষ স্মরণিকা, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় - পৃঃ ২২)

২। ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সারকুলার নং ৩-এ ছাত্রবৃত্তি সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রী ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১৮।	শ্রীমতি বিমলাবালা দেবী	তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি	২৲	দুই বৎসর
১৯।	শ্রীমতি গিরিবঙলা দেবী	ঐ	ঐ	২৲	ঐ

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

৩। পুষ্পসাজের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন

বর্তমান বর্ষে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় কর্ণেল শ্রীযুত মহিম চন্দ্র দেববর্মণ মহোদয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট "ত্রিপুরার প্রচলিত ধরনে পুষ্পসাজ" প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহাকে "বীরবিক্রম কিশোর পদক" নামক একটি রৌপ্য পদক প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আগামী বর্ষে পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্রীগণ নিজ নিজ প্রস্তুতি পুষ্পসাজ উপস্থিত করিবে। প্রতিযোগিতায় যে বালিকা প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে ঐ সভায়

উক্ত পদক পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ইতি— সন ১৩২৮ ত্রিং, তাং ১৯শে আশ্বিন।

শ্রী অসিতচন্দ্র চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
শিক্ষাবিভাগ

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ৮৯)

৪। রিয়া প্রস্তুতি পুরস্কারের বিজ্ঞাপন

প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া কবি মহারাজকুমারী ঁঅনঙ্গমোহিনী দেবী গত বর্ষের স্থানীয় শিল্প প্রদর্শনী হইতে "রিয়া" প্রস্তুতের জন্য যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা 'তুলসীবতী' বালিকা বিদ্যালয়ের যে ছাত্রী পুরাতন নক্সায় রিয়া বয়নে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ আগামী ১লা আশ্বিনের পূর্বে তাহাদের নিজ নিজ কৃত সম্পূর্ণ রিয়া বা রিয়ার অংশ স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের যোগে শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করিবে। প্রতিযোগিতায় যে বালিকা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে তাহাকে বর্ণিত পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, ইতি, সন ১৩২৮ ত্রিং, তাং ১৯শে আশ্বিন।

শ্রী অসিতচন্দ্র চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
শিক্ষাবিভাগ

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ- ৯০)

৫। গভর্নর নিয়োগ ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটি গঠন

সন ১৩৩০ ত্রিং, তাং ১৬ই শ্রাবণ

মেমো নং ৩ — শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের গত ১১/৪/৩০ ত্রিং তারিখের P / ৩৭ নং সেহার আদেশে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুত সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, এম. এ মহাশয়কে ঠাকুর বোর্ডিং-এর গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হইল এবং মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত রূপে স্বতন্ত্র কমিটি গঠিত হইল।

১। দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন, এম. এ. বি. এল. সভাপতি।

২। উজীর শ্রীযুত ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা

৩। রাজস্ব ও বনকর গং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক (Ex-officio)

৪। সদর কালেক্টর। (Ex-officio)

৫। শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, সম্পাদক। (Ex-officio)

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাশগুপ্ত

মন্ত্রী

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট, সংকলন, পৃ - ১০৪)

৬। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ।

Applications are invited from married couples for the post of Assistant Mistress and Assistant Master of the Tulsibati Girls' School Agartala on Rs. 50/- (Rs. 30 & Rs. 20/- respectively). Selected pair will enjoy pucca quarters near the school and Motor Bus Conveyance.

Apply on or before July 15, 1923 to

S. C. Deb Barma, M. A. (Harvard)
Officer-in-charge
Education Department
P.O. - Agartala
Tripura State.

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১২২)

* শ্রীমতি বিন্দুপ্রভা রায় (চন্দ)-এর জবানীতে জানা যায় যে, এই বিজ্ঞাপনের ফলে তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা চারুবালা দত্তের (গুরুমা) মাসী ও মেসো স্কুলে যোগ দেন। এর আগে দম্পতি শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বনমালী বসু ও তার স্ত্রী। (শতবর্ষ স্মরণিকা, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, পৃ - ২৫)

৭। সঙ্গীত শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন

অত্রত্য তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন সঙ্গীত শিক্ষক মাসিক ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইবে।

কর্মপ্রার্থীগণ বয়স, যোগ্যতা ও কৃতকার্য্যতার সার্টিফিকেট সহ আগামী ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে আবেদন দাখিল করিবেন, ইতি।

ত্রয়ত্রিংশ ভাগ, নবম সংখ্যা
ভাদ্র - ১ম পক্ষ, ১৩৪৪ ত্রিং

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান,
শিক্ষা বিভাগ

মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ২১২)

৮। মাঘ -২য় পক্ষ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট ৪১পৃঃ
১৩৪৩ ত্রিং

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থীর নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে বিভাগে উত্তীর্ণ	যে স্থান অধিকার করিয়াছে	মন্তব্য
৪৯।	* শ্রীমতি মানসী দেবী	তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	১ম বিভাগ	১ম	* চিহ্নিত
৫০।	* শ্রীমতি কনকলতা দেবী	— ঐ —	— ঐ —	৮ম	বালিকাগণ
৫১।	* শ্রীমতি হিরণবালা পাল	— ঐ —	৩য় বিভাগ		শিল্পে উত্তীর্ণ
৫২।	* শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী	— ঐ —	২য় বিভাগ		
৫৩।	* শ্রীমতি পরিমল সেন	— ঐ —	২য় বিভাগ		
৫৪।	* শোভনাবালা মিত্র	— ঐ —	— ঐ —		
৫৫।	* শিশিরকণা দাশগুপ্তা	— ঐ —	৩য় বিভাগ		

উচ্চ বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা

১। শ্রীমতি কিরণবালা দত্ত — তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় - ২য় বিভাগ (শতবর্ষ স্মরণিকা, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, পৃ - ১১০, কিন্তু এই স্টেট গেজেটটি কোথায় লভ্য তার উল্লেখ করা হয়নি)।

৯। এছাড়াও প্রাচীন ছাত্রীদের মধ্যে যারা ছাত্রবৃত্তি পেয়েছেন বলে 'শতবর্ষ স্মরণিকা' (মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়)-য় লিখেছেন—

ক) উষারানী চন্দ পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি, নিম্নবাংলা ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর ছাত্রবৃত্তি সবগুলিই পেয়েছিলেন। এছাড়া মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ বদ্ধনার্থে ''আলি হাইদর' নামে একটি স্বর্ণপদকও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। (পৃ - ৩৭)

১০। পদ্মিনী দেবী পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি ও নিম্নবাংলা ছাত্রবৃত্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি তুলসীবতী স্কুলে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। (পৃ - ৪৩)

১১। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হওয়ার আগে প্রভাবতী সরকার, অরুন্ধতী সরকার (পরে মণ্ডল), কিরণবালা দত্ত, মানসী গুপ্তা, উষারানী চন্দ (দাস), বীণাপানি রায় (সেন), বিভারানী সরকার এবং আরো বেশ কয়েকজন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন।

১২। স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল হিসেবে অনুমোদন পাওয়ার পর ১৩৫৩ ত্রিং (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ) সনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম রেগুলার ব্যাচে আভা সরকার, বানী দাশগুপ্তা, ঊষা ব্যানার্জি, কমলা মজুমদার এবং সাহানা সেনগুপ্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেন, এদের মধ্যে কমলা মজুমদার অসুস্থ থাকায় পাশ করতে পারেন নি, কিন্তু বাকি চারজনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বলে সাহানা সেনগুপ্তা জানিয়েছেন।

১২। প্রথমে রাজ্য সরকারই ছাত্রীদের গাড়ী করে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করলেও পরে তা প্রাইভেট সংস্থার হাতে হস্তান্তরিত হয়। এ বিষয়ে ১৩৪১ ত্রিং (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বলা হয়েছে— "For the conveyance of the girls, the State motor bus service was continued till after the Puja holidays but in order to ensure regularity in the service a contract was made with a private party from the middle of Agrahayan"[৪১]

১৩। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার সমর্থনে পূর্ণিমা মুখার্জীর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এক মিছিল করায় পূর্ণিমা মুখার্জীকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়।

সূত্র ঃ

১। শতবর্ষ স্মরণিকা তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় - পৃ - ৯০

২। — ঐ —, পৃ -২২

৩। — ঐ —, পৃ - ৩৩

৪। — ঐ —, পৃ - ২২

৫। — ঐ —, পৃ - ৯৫

৬। — ঐ —, পৃ - ২২

৭। উজ্জয়ন্ত —, পৃ - ২৫

৮। — ঐ — , পৃ - ২৭

৯। Report on Administration of the Tripura State (Ranjit Kr. De), page - 20

১০। — do — page - 19

১১। উজ্জয়ন্ত, পৃ - ২৭

১২। Report on Adm. of the Tripura State, Page - 45

১৩। Administration Report of Tripura State, (Mahadeb Chakraborty) (I), page -269

১৪। শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ২২

১৫। Report on Adm. of the Tripura State, page - 44

১৬। প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য, পৃ - ২৬
১৭। শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ২২
১৮। প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য, পৃ - ২৭
১৯। Administration Report of Tripura State, Vol- I page - 67
২০। — do —, page - 68
২১। — do—, page - 121
২২। — do —, page - 122
২৩। Tripura State Administration Report, page - 21
২৪। প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য, পৃ - ২৭
২৫। Tripura State Adm. Report, page - 59
২৬। Adm. Report of Tripura State, page - 68 Vol - I
২৭। শতবর্ষ স্মরণিকা , পৃ - ২৩
২৮। — ঐ — পৃ- ২৫
২৯। — ঐ — পৃ - ৪২
৩০। — ঐ— , পৃ - ৫৩
৩১। — ঐ —, পৃ - ২২
৩২। Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 589
৩৩। — do —, page - 645
৩৪। — do —, page - 896
৩৫। শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ২৫
৩৬। Adm. Report of Tripura State, Vol - III, page - 1269
৩৭। শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ৫৩
৩৮। Adm. Report of Tripura Vol - IV, page - 2133
৩৯। শতবর্ষ স্মরণিকা, পৃ - ৩৩
৪০। — ঐ —, পৃ - ২২
৪১। Adm. Report of Tripura State, Vol - III, page - 1502

বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (B. B. I.), ধর্মনগর

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে পার্বত্য ত্রিপুরায় যে কয়টি উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল, তার মধ্যে ধর্মনগর একটি। ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট T. E. Coxhead লিখেছেন —'Five markets viz. at Udaypore, Bishalgarh, Devi Bazar, Farnah Dharm Nagar and Kamalpore, are held in the interior of the hill country.[১]" অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে এই পাঁচটি বাজারে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের বেচাকেনা চলত। তাই এইসব অঞ্চলে যে উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল, তা নিশ্চিত বলা যায়। শুধু তাই নয়, আগরতলা ও কৈলাসহরের মত ধর্মনগরেও সৈনিক চৌকি ছিল।[২] ঐ অঞ্চলে লুসাইদের উপদ্রব থাকায় জনবসতির রক্ষার করার জন্য সৈনিক চৌকির প্রয়োজন ছিল।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত কৈলাসহর বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৈলাসহরে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কৈলাসহর বিভাগে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে C.W. Bolton প্রেরিত রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বছরে রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ১৮টি হয়।[৩] তাই ঐ সময়ে রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান বসতি ধর্মনগরেও একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল, তা জোর দিয়েই বলা যায়। সমগ্র ধর্মনগর পরগণাই যে ঐ সময়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে চলছিল তা সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাশের ১৮৮১-৮২ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টেই দেখা যায়— "Dharmanagar is reported to have once been thoroughly under cultivation, ... A special officer has recently been appointed to endeavour to reclaim the pergunnah by inducing immigration into it from Sylhet and other districts.[৪]"

ধর্মনগর পরগণা যে পূর্বে একটি সমৃদ্ধশালী পরগণা ছিল, তার প্রমাণ আমরা আসাম রাজার দুই দূত অর্জুন দাস ও রত্ন কন্দলীর রচিত 'ত্রিপুর দেশের কথা' গ্রন্থে পাই।[৫] কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই পরগণার বেশীর ভাগ অংশই জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকে লোক এনে বসতি স্থাপনের দ্বারা ব্যাপক কৃষিকার্যের মাধ্যমে একে আবার শস্যশ্যামলা করে তোলার

তোড়জোড় তখন থেকেই শুরু হয়। পরগণার মূলকেন্দ্র ধর্মনগরের সমৃদ্ধিও যে দিন দিন বাড়ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধর্মনগরের সৈনিক চৌকি আরো অভ্যন্তরে সরিয়ে নেবার সংবাদে। ১৮৮৫-৮৬ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "The first named guard (অর্থাৎ ধর্মনগরের গার্ড পোস্ট) has lately been removed to an advanced position about 4 miles to the south-east of the locality it hitherto occupied. The change, as reported last year, was necessary on account of extension of cultivation.[৬]" অর্থাৎ ধর্মনগরের দ্রুত আর্থিক উন্নতি হচ্ছিল। তাই এটা নিশ্চিত যে, দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তের সুযোগ্য নেতৃত্বে কৈলাসহর বিভাগে যে শিক্ষার প্রসারণ ঘটেছিল, তাতে ধর্মনগর পাঠশালাটির বিলুপ্ত হবার কোনো আশঙ্কাই ছিল না। ত্রিপুরার অর্থনীতিতে ধর্মনগর দ্রুত এমনই এক উল্লেখযোগ্য স্থানে চলে এসেছিল যে, কৈলাসহরের সঙ্গে তার যোগাযোগের জন্য সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়ে উঠেছিল— "The necessity for connecting Koylashar with Dharmanagar is great.[৭]"

ক্রমশ ধর্মনগর পরগণার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকায় একে কৈলাসহর বিভাগ থেকে আলাদা করে পৃথক একটি বিভাগ গঠন করা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর (ধর্মনগর বিভাগ)' গ্রন্থে জানিয়েছেন— '১৩০৫-০৬ ত্রিপুরাব্দে কৈলাসহর বিভাগ হইতে ধর্মনগর বিভাগ পৃথক করা হইয়াছে।[৮]' অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৯৫ অথবা ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মনগর বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত(১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ বাদে) কোনো প্রশাসনিক রিপোর্ট পাওয়া না যাওয়ায় এই স্কুলটির অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ১৮৯৮-৯৯ এবং ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্ট পাওয়া গেলেও রাজ্যে কতটি মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল তা জানা যায় না। তবে ১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮-৯৯ খ্রিঃ) বর্ষের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বর্ষের আগে সমগ্র ধর্মনগর বিভাগে একমাত্র প্রশাসনিক কেন্দ্র ধর্মনগরেই একটি স্কুল ছিল, বিভাগের অন্যত্র কোনো স্কুল ছিল না। ঐ বর্ষেই ধর্মনগরে আরেকটি স্কুল খোলা হয়, তবে তা কোনো এলাকায় ছিল তা জানা যায়না।[৯] ঐ বর্ষের বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরে ধর্মনগরের এই দুটি স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৫, যার মধ্যে ৪৯ জন মণিপুরী, ১৪ জন বাঙালী হিন্দু এবং ২২ জন বাঙালী মুসলমান।[১০] যেহেতু ঐ বর্ষেই নতুন স্কুলটি খোলা হয়েছে, তাই ধরা যেতে পারে যে, মোট ছাত্রসংখ্যার সিংহভাগই ধর্মনগর বিভাগীয় স্কুলটির ছাত্র। কাজেই, এ থেকে ঐ সময়ে ধর্মনগরের জনসমষ্টির একটা বিন্যাস চিত্র পাওয়া যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে, ঐ সময়ে ধর্মনগরে মণিপুরীরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিলেন। এছাড়া, মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। এদের মধ্যে একটা অংশই মাত্র স্কুলে আসতো, বাকিরা মক্তবে পড়াশুনা করত। হিন্দুদের মধ্যেও উচ্চবর্ণ এবং জল আচরণীয় মধ্যগোত্রীয় সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। তবে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংখ্যা তুলনায় বেশি থাকতেও পারে, কারণ, তাদের মধ্যে পড়াশুনার চল ততটা ছিল না। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের বিবরণীতে (সময়কাল ১৯২৭ খ্রিঃ) সমগ্র ধর্মনগর

বিভাগে আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। জনবসতির বিন্যাস বর্ণনায় তিনি জানিয়েছেন, কয়েকঘর ব্রাহ্মণের স্থায়ী বসতি ছাড়াও কিছু তিলি, পাল, দাস, দে ও দেব শ্রেণীর জল আচরণীয় প্রজা আছে। তবে নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দু (তিনি নাথ, নমঃশূদ্র, মালি, পাটনি, ঢুলি ইত্যাদি সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন), মণিপুরী, চা বাগানের কুলি ও হালাম শ্রেণীর প্রজাই বেশি বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] অবশ্য মুসলমান প্রজার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গোষ্ঠীগত বণ্টন বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, তখন রাজ্যে ৪টি মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল। এই স্কুলগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "These institutions are situated at the head quarters of some of the divisions of the state.[১২]" তখন সদর, সোনামুড়া, কৈলাসহর, বিলোনীয়া, ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুর— এই সাতটি বিভাগ ছিল। কোন্ কোন্ বিভাগে এই স্কুলগুলি ছিল তা এই রিপোর্টে জানা না গেলেও পরবর্তী বছরের রিপোর্টগুলি পর্যবেক্ষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, ঐ বছরে কৈলাসহর, বিলোনীয়া, সোনামুড়া ও ধর্মনগরে এই মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলি ছিল, অর্থাৎ ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের আগেই ধর্মনগরের এই স্কুলটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় থেকেই ধর্মনগর বিভাগে শিক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল। যেখানে ১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮-৯৯ খ্রিঃ) বর্ষে সমগ্র ধর্মনগর বিভাগে মাত্র দুটি স্কুল এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ৮৫ ছিল, সেখানে ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) বর্ষে ঐ বিভাগে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৭টি হয় এবং ছাত্রসংখ্যা ২৪২-এ পৌঁছায়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৩-০৪ খ্রিঃ বর্ষে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ১৩-তে দাঁড়ায় এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৭২ হয়।[১৩] এ থেকে বোঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলে শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য ধর্মনগরের মধ্য ইংরেজী স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার জন্য দাবী উঠতে থাকে। তাই দেখা যায় যে, ১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) বর্ষে স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে— "Each of the schools at Udaipur and Dharmanagar was strengthened during the year by the tentative appointment of an extra teacher.[১৪]" স্কুলটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই যে বাইরের ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস যুক্ত করা হয়েছিল তা ১৩২৭ ত্রিং (১৯১৭-১৮ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে একটি অগ্নিকাণ্ডের উল্লেখ থেকে জানা যায়— ".... and at Dharmanagar the M. E. school with attached Boarding house and Library was burnt down.[১৫]"

১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯-২০ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে ধর্মনগরের এই মধ্য ইংরেজী স্কুলটির ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে রূপান্তরের উল্লেখ দেখা যায়— "Besides these, there were 2 feeder schools teaching upto class VIII at Sonamura and Dharmanagar.[১৬]" মধ্য

ইংরেজী স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো, তাই বলা যায় যে, স্কুলটিকে হাইস্কুলে রূপান্তরের প্রথম ধাপটি, অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী আগের বছর থেকে শুরু হয়। স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের এতই উৎসাহ ছিল যে, তারা নিজেরাই স্কুলের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১ খ্রিঃ) সনের বিবরণীতে স্থানীয় জনসাধারণের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়— "class IX has been added to both of them (অর্থাৎ সোনামুড়া ও ধর্মনগরের স্কুলদুটি) at the beginning of the academic session of the year. B. B. Institution at Dharmanagar was provided with the full staff to be maintained in the affiliated schools and the school building was completed with its Boarding Houses. The House was built according to the approved plan of the Department with corrugated iron roof and white washed mud walls. The strucutre with its spacious compound commands a respectable view. The public deserved praise for their successful efforts to provide their school with such a building at their own expenses.[১৭]"

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১খ্রিঃ) সনে অথবা তার আগেই ধর্মনগরের এই মধ্য ইংরেজী স্কুলটির 'বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন' নামকরণ হতে পারে। ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বছরই ধর্মনগরের এই স্কুলটিকে "Feeder High School" করা হয়।— '..... and at the request of the local people the M. E. School at Dharmanagar was provisionally raised to the similar status (অর্থাৎ Feeder High School)[১৮]'। কিন্তু এই রিপোর্টের কোথাও স্কুলটিকে B. B. Institution নামে আখ্যাত করা হয়নি। ১৩২৯ ত্রিং সনেও রিপোর্টে স্কুলটির নতুন নামের উল্লেখ করা হয়নি, একমাত্র ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১ খ্রিঃ) সনেই স্কুলটিকে নতুন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই ১৩৩০ ত্রিং সনেই স্কুলটির নতুন নামকরণ হয়েছিল, এই অনুমানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু ঐ সময়ের রীতিনীতি অনুসারে, হাইস্কুলে রূপান্তরের সময়েই অথবা তার পরে স্কুলগুলির নতুন নামকরণ হতে দেখা যায়। তাই ১৩৩১ ত্রিং সনের (১৯২১-২২ খ্রিঃ) গোড়ার দিকেই স্কুলটির হাইস্কুলে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরই এই নামকরণ হওয়া খুবই সম্ভব। ১৩৩১ ত্রিং সনের রিপোর্টে স্কুলটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে— 'The Bir Bikram Institution at Dharmanagar was permanently affiliated to the Calcutta University. The Institution was fully developed from the very beginning of the academic session. The attainment of the permanent recognition by this Institution was mainly due to the warm enthusiasm of the public.[১৯]"

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, ১৩৩১ ত্রিং সনে এই স্কুলটির নতুন নামকরণ হলে ১৩৩০ ত্রিং সনের রিপোর্ট স্কুলটির নতুন নামের উল্লেখ ছিল কেন ? ১৩৩০ ত্রিং সনের

রিপোর্টটি তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী বিজয়কুমার সেন ১৯২১ খ্রিঃ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৩৩১ ত্রিং সনের আশ্বিন মাস) পেশ করেন। ১৩৩১ ত্রিং সনের গোড়ার দিকেই স্কুলটির নতুন নামকরণ হলে তা ১৩৩০ ত্রিং সনের রিপোর্ট প্রস্তুত কালে এই নামের উল্লেখ করা যেতেই পারে।

১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হাইস্কুলে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে বহিরাগত ছাত্রদের জন্য দুটি বোর্ডিং হাউসও খোলা হয়।[২০]

হিসেব অনুসারে বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন থেকে ১৩৩২ ত্রিং (১৯২২-২৩ খ্রিঃ) সনেই ছাত্রদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার কথা। কিন্তু ১৩৩২ ত্রিং সনের বিবরণী না পাওয়া যাওয়ায় এ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন থেকে মোট ৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিল এবং সবাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে ২ জন প্রথম বিভাগে, ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করে।[২১]

রাজন্য আমলে বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশনের সাফল্য (মেট্রিকুলেশন)

বর্ষ (ত্রিপুরাব্দ)	মোট পরীক্ষার্থী	সফল ছাত্রের সংখ্যা				সফলতার হার (%)
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	সর্বমোট	
১৩৩৩ (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ)	৫	২	১	২	৫	১০০
১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	৩	৩	০	০	৩	১০০
১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	১১	৮	২	১	১১	১০০
১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	১১	৫	৪	০	৯	৮১৮২
১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	৬	৩	২	০	৫	৮৩৩৩
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ খ্রিঃ)	১২	৩	৫	০	৮	৬৬৬৭
১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	৮	১	৫	০	৬	৭৫
১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	৬	৪	১	১	৬	১০০
১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ খ্রিঃ)	১০	৪	৬	০	১০	১০০
১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	৫	৩	২	০	৫	১০০
১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	৬	৪	২	০	৬	১০০
১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	৫	৪	১	০	৫	১০০
১৩৪৬ (১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ)	৯	২	৫	০	৭	৭৭.৭৮
১৩৪৭ (১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিঃ)	৭	৩	৩	১	৭	১০০
১৩৪৮ (১৯৩৮ - ৩৯ খ্রিঃ)	১৩	২	৫	২	৯	৬৯২৩

১৩৪৯ (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ)	৬	১	১	৩	৫	৮৩৩৩
১৩৫০ (১৯৪০-৪১ খ্রিঃ)	৫	১	০	৩	৪	৮০
১৩৫২ (১৯৪২ - ৪৩ খ্রিঃ)	১২	১	১	৮	১০	৮৩৩৩
১৩৫৩ (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ)	১০	১	৪	২	৭	৭০
১৩৫৪ (১৯৪৪ - ৪৫ খ্রিঃ)	৮	০	১	৪	৫	৬২৫০
১৩৫৫ (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ)	১০	১	২	৬	৯	৯০

* তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

** ১৩৩৫ ত্রিং একজন ছাত্র, বিমলেন্দু সেনগুপ্ত রাজ্যে প্রথম স্থান পায় (ত্রিঃ স্টেঃ গেঃ সঃ, পৃ- ১৮৯)

১৩৩৯ ত্রিং - একজন ছাত্র অঙ্কে লেটার পেয়েছে।

১৩৪১ ত্রিং - একজন ছাত্র স্টার পেয়েছে।

১৩৪৩ ত্রিং - পরীক্ষায় একজন ছাত্র, প্রেমানন্দ নাথ প্রথম এবং অপর একজন, রসরাজ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় হয়েছে (ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ-২১৩)

১৩৪৪ ত্রিং — একজন ছাত্র রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে।

১৩৪৫ ত্রিং — একজন ছাত্র রাজ্য তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

১৩৫৫ ত্রিং — একজন ছাত্র রাজ্যে তৃতীয় হয়েছে।

সংযোজন

১. ছাত্রবৃত্তি

১৩১৪ ত্রিং তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সার্কুলার নং ৩ - ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
৮।	শ্রী মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ফটিগুলি মধ্য ইং স্কুল	নিম্ন বাঙ্গালা	৩	দুই বৎসর

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১)

(দ্রঃ - পূর্বে ধর্মনগরকে ফটিগুলি বা ফটিকুলি বলা হতো)

২. স্কুল লাইব্রেরীর জন্য চাঁদা প্রদান

নং ৩৪২ তাং ৩১ / ১ / ৩৩ ত্রিং

১।	শ্রীযুত হাজির মিঞা	২৫০৲
২।	শ্রীযুত কোকিলনাথ তালুকদার	
৩।	শ্রীযুত মধুনাথ তালুকদার	
৪।	শ্রীযুত কমলনাথ তালুকদার	
৫।	শ্রীযুত রায়নাথ তালুকদার	৭৫৲
৬।	শ্রীযুতসূর্য্যনাথ তালুকদার	
৭।	শ্রীযুত চন্দ্রমণিনাথ তালুকদার	
৮।	শ্রীযুত রাঘব নাথ তালুকদার	
৯।	শ্রীযুত দীননাথ ইজারাদার	২৫৲
		৩৫০ টাকা

পার্শ্বের লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধর্মনগর বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশনের ধর্মনগর লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে ৩৫০ তিনশত পঞ্চাশ টাকা চাঁদা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শিক্ষার উন্নতির জন্য তাহাদের এই বদান্যতা প্রশংসার যোগ্য। আশা করি, এরূপ সৎদৃষ্টান্তে এ রাজ্যের অন্যান্য বিভাগের স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণ শিক্ষার উন্নতিশীল কল্পে এরূপ চাঁদা দিতে অগ্রসর হইবেন।

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ১২২)

৩. ছাত্রবৃত্তি

সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ৩১শে শ্রাবণ

মেমো নং ৩ - এ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত হারে বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের বৃত্তি	বার্ষিক বৃত্তির হার	মন্তব্য
১।	শ্রী বিমলেন্দু সেনগুপ্ত	ধর্মনগর বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন	প্রতিযোগিতা বৃত্তি	১২৲	
৫।	শ্রী গোপেন্দ্র কুমার পাল	ঐ	স্থানীয় বৃত্তি	৮৲	

উপরিউক্ত ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ১৩৩৬ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্ব-স্ব বৃত্তি ভোগ করিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কলেজে ভর্তি হইয়া এ অফিসে রিপোর্ট করিলে সংসৃষ্ট

প্রিন্সিপালের যোগে তাদের বৃত্তির টাকা প্রেরিত হইবে।

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক,
শিক্ষাবিভাগ

শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা
প্রেসিডেন্ট

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ১৮৯)

৪. **ছাত্রবৃত্তি**

ম্যাট্রিকুলেশন বৃত্তি

মেমো নং - ৫

১৯৪৪ ইং সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এই রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করায় নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা যায়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ ১৩৪৪ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে দুই বৎসরকাল উক্ত বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে। কলেজে ভর্তি হইয়া প্রিন্সিপালের যোগে আবেদন প্রেরিত হইলে বৃত্তির টাকা যথারীতি মঞ্জুরক্রমে প্রেরিত হইবে, ইতি। সন ১৩৪৪ ত্রিং তারিখ ২৮শে শ্রাবণ।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	মাসিক বৃত্তির হার	যত বৎসর	মন্তব্য
১।	শ্রী প্রেমানন্দ নাথ	ধর্মনগর বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন	১৫৲	দুই বৎসর	সাধারণ
২।	শ্রী রসরাজ ভট্টাচার্য্য	ঐ	১০৲	দুই বৎসর	ঐ

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান,
শিক্ষাবিভাগ
২৮/৪/৪৪ত্রিং

শ্রী জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন,
মন্ত্রী
১৪/৪/৪৪ত্রিং

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ২১৩)

সূত্র ঃ

১। Administration Report of the political Agency, Hill Tipperah, Vol - I, page - 77
২। — do — page - 80
৩। — do — page - 135
৪। — do — Vol - II, page - 81
৫। ত্রিপুর দেশের কথা, পৃ - ৪৭
৬। Adm. Report of the political Agency, Hill Tipperah, Vol - II, page - 178
৭। — do — page - 151
৮। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর (ধর্মনগর বিভাগ) পৃ - ৬
৯। Report on Administration of Tripura State (R. K. De), page - 17
১০। — do —, page - 28
১১। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর পৃ - ১০
১২। Administration Report of Tripura State (M. Chakraborty), Vol - I, page - 67
১৩। — do —, page - 139
১৪। — do —, Vol-II, page - 533
১৫। — do —, page - 709
১৬। — do —, page - 766
১৭। — do —, page - 831
১৮। The Administration Report of Tripura State (TRI) page - 157
১৯। Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 894
২০। — do —, page - 895
২১। — do — Vol - III, page - 994

কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে প্রশাসনিক সংস্কারের যখন উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্ত্রী শিক্ষার সূচনার ক্ষেত্রে খুব একটা বিলম্ব হয়নি। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে, ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের স্কুল রাজ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা হলেও এই উদ্যোগ দশ বছরের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষাকে নতুন ভাবে শুরু করতে বেশ সময় লেগে যায়। ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায়, তখন পর্যন্তও রাজ্যে বালিকাদের জন্য সরকারী উদ্যোগে কোনো স্কুল ছিল না।[১] ১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮-৯৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায়— "The number of elementary schools in the territory was 36 in 1306, 43 in 1307 and 47 in the year under report.[২]" সে সময়ে রাজধানীতে একটি মাত্র স্কুলই তখন হাইস্কুল ছিল (বর্তমানের উমাকান্ত একাডেমী)। ১৩০৪ ত্রিং সনে রাজ্যে মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৫, আর ১৩০৬ ত্রিং সনে হাইস্কুলটিকে নিয়ে রাজ্যে মোট স্কুলের সংখ্যা ৩৭। অর্থাৎ এই দুই বছরে মাত্র দুটি স্কুল বেড়েছে। তাই মনে হয় বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে সরকারী ভাবে এই দুই বছরে মেয়েদের কোনো স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় নি। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে হলেও তা সরকারী ছিল না, তৎকালীন যুবরাজ রাধাকিশোরের পত্নী তুলসীবতী দেবী এই স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগেই মেটাতেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রাধাকিশোর মাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করার পরের বছর থেকেই রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। খুব সম্ভবতঃ ১৩০৭ ত্রিং (১৮৯৭-৯৮ খ্রিঃ) সনের শুরু থেকেই রাধাকিশোর মাণিক্য রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে এনে স্কুলটিকে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় নামে সরকারী আওতায় আনেন।

১৩০৮ ত্রিং (১৮৯৮ - ৯৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে আরো জানা যায় যে, ১৩০৭ ত্রিং সনে কৈলাসহরেও সরকারী ভাবে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় চালু হয়। কারণ, ১৩০৮ ত্রিং সনে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা আরো চারটি বৃদ্ধি পেলেও সবগুলিই ছিল ছেলেদের স্কুল, ঐ বছরে বালিকাদের স্কুলের সংখ্যা বাড়ে নি— "There was no addition to the number of girls schools.[৩]" কাজেই অন্ততঃ ১৩০৭ ত্রিং সনেই (১৮৯৭-৯৮ খ্রিঃ) কৈলাসহরের

বালিকা বিদ্যালয়টি যে চালু হয়েছিল তা নিশ্চিত বলা যায়। স্কুলটি কি সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগেই চালু হয়, না তুলসীবতী স্কুলের মতোই কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে পূর্ব থেকে চালু থাকা স্কুলের সরকারীকরণ হয় তা ১৩০৮ ত্রিং সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কৈলাসহরের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন— ''অসমর্থিত জনশ্রুতি অনুযায়ী নদীর পাড়ে একজন বিদূষী ভদ্রমহিলা শ্রীযুক্তা ঘোষ (বহু চেষ্টা করেও নাম পরিচয় সংগ্রহ করতে পারি নি) সমসাময়িক কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ১৮৯৫ (± ১০) বর্তমান এস ডি ও অফিস ও নোটিফায়েড এরিয়া অফিসের পাশাপাশি কোনো চত্বরে গুটিকয়েক মেয়ে নিয়ে স্ব-উদ্যোগে নীরবে নিরালয়ে একটি ছোট্ট ঘরে সময়োপযোগী আধুনিক ভাবধারায় মেয়েদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন।[৪]'' যদি তাই হয়, তবে কৈলাসহরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল আরো কয়েক বছর এগিয়ে যাবে এবং তুলসীবতী স্কুলের মতোই তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই ফল বলে মেনে নিতে হবে। তবে সরকারী অথবা ব্যক্তিগত যে-কোনো প্রচেষ্টাই হউক না কেন, স্ত্রী শিক্ষার উদ্যোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজধানী আগরতলার একই সঙ্গে কৈলাসহরেও বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নব্য চেতনায় জাগরণের সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য অনেক আগে থেকেই কৈলাসহর বিভাগে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে শিক্ষার প্রসার প্রশংসার্হ ছিল, তাই স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে কৈলাসহরে বিভাগের এই পদক্ষেপ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না।

ঐ সময়ে কৈলাসহরে বালকদের জন্য একটি মধ্য ইংরেজী (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) বিদ্যালয় থাকলেও মেয়েদের জন্য এই স্কুলটি নেহাতই পাঠশালা (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত) পর্যায়ের ছিল। ঐ সময়ে বাল্যবিবাহ প্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় ছিল। রাজধানীর তুলসীবতী স্কুলে প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ কর্তা ও ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা এবং রাজধানীর উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের মেয়েরাই পড়ত। ফলে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত উদার পরিবেশের সুযোগে অন্তত চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা পড়তে পেতো। কিন্তু রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলিতে, বিশেষ করে, কর্মচারীদের মেয়েরাই পড়ার সুযোগ পেতো। এছাড়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পড়ার আগ্রহ উভয়ই থাকায় তাদের মেয়েরাও যথেষ্ট সংখ্যায় যে স্কুলে যেত, তা স্ত্রী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। তাই মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে দীর্ঘদিন পাঠশালা পর্যায়েই থাকতে দেখা গেছে। তবে এ প্রসঙ্গে সরকারী উৎসাহের অভাবও এর একটি কারণ বলে উল্লেখ করা যায়। জনসাধারণের কাছ থেকে চাহিদা না উঠা পর্যন্ত সরকারী ভাবে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ কোনো উদ্যোগ সরকারী তরফ থেকে দেখা যায় নি। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল।

ফলে মফঃস্বলের অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে তথ্য রিপোর্টগুলিতে প্রায় পাওয়াই যায় না। অল্প কিছু ক্ষেত্রে বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যেসব তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা একক স্কুলের আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয় থেকে দুইজন ছাত্রী পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে— "Of the 35 successful primary students, 6 were girls four of whom, as mentioned above, were from the Tulsibati Girls' School, and two from two girls' schools in the Kailashar division.[৫]" ঐ সময়ে কৈলাসহরে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল ; কাজেই এক্ষেত্রে আলোচ্য বিদ্যালয়টির কোনো ছাত্রী এই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেছিল কি না, তা জানা যায় নি। তবে ১৩৩১ ত্রিং সনের রিপোর্টে কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টির সম্পর্কে একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে— "A vernacular School Mistress was appointed to be in charge of Kailashar Girls' School.[৬]" ১৩৩১ ত্রিং সনে (ইংরেজীতে ১৯২১-২২ খ্রিঃ) এই মহিলা বাংলা শিক্ষিকা, যিনি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁর পরিচয় জানা না গেলেও এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে একটি তথ্য প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় "কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন— 'মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর সপরিবারে এসেছিলেন ঊনকোটি দর্শনে। এলে পর প্রধানা মহিষীর অনুরোধে বিদ্যানগর গ্রামের মোহিনী দেবীকে সরকারী শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। মোহিনী দেবী বর্তমান নগর পঞ্চায়েত অফিসের স্থানে একটি ডোবার পাড়ে একটি কুল গাছের নীচে ছোট্ট এক চৌচালা ছনের ঘরে ১৯১৫ (±) সালে কৈলাসহর নিম্ন বিদ্যালয়ে (গালর্স এল. পি. স্কুল) কাজে যোগ দিলেন। সরলপ্রাণা শিক্ষাদরদী মোহিনী দেবীই (পূর্বোক্ত জানকী দেবীর তনয়া) প্রথম সরকারী শিক্ষিকা বলে মনে হয় এবং স্কুলটিও মেয়েদের জন্য প্রথম সরকারী স্কুল বলে অনুমিত হয়।[৭]"

রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট সম্প্রসারিত না হওয়ায় মেয়েদের স্কুলে, বিশেষ করে মফঃস্বলে,মহিলা শিক্ষক পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। রাজধানীতেই তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমদিকে মহিলা শিক্ষকের নিয়োগ কষ্টকর ছিল, তাই মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে বয়স্ক গুরুমশাইরাই মেয়েদের পড়াতেন। হরিপদবাবু বলেছেন, মোহিনী দেবীই কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা, তাই খুব সম্ভবত তিনি ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনে ঐ স্কুলে যে বাংলা শিক্ষিকার নিযুক্তি হয়, তাঁর কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি এই ঘটনার সময়কাল ধরেছেন আনুমানিক ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে, এক্ষেত্রে স্মৃতি হরিপদবাবুকে বিভ্রাটে ফেলেছে।

অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষার সূচনায় পাঠশালা (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত) পর্যায় স্তরের শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয়,

ফলে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় স্তরে চাহিদার কারণে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে পাঠশালা স্তর থেকে উন্নীত না করলেও অন্তত নিম্নবাংলা পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা চালু করতে শিক্ষাবিভাগ বিশেষ আদেশ ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে জারী করে— "In some of these schools, under the special order of the Education Department, girls were allowed to read the Lower Vernacular and the Upper Vernacular standard.[৮]" মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ঐ সময়ে কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয়টি সবচেয়ে উন্নত ছিল (বাংলা শিক্ষিকার নিযুক্তিই এর প্রমাণ), তাই এই স্কুলে যে ঐ বছর থেকেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল, তা নিশ্চিত বলা যায়। এই ব্যবস্থা অন্ততঃ ১৩৪৭ ত্রিং (১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত চালু থাকে। ১৩৪৮ ত্রিং সনে বিদ্যালয়টি নিম্নবাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সনে ৩টি বালিকা বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরেজী পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।[৯] অনুমান করা যায় যে, ঐ বছরই কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ বিষয়ে কৈলাসহরের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য 'কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা' প্রবন্ধে লিখেছেন— "এই নিম্নবঙ্গ বালিকা বিদ্যালয় পরে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৫ (±৩) খ্রিস্টাব্দে এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়।[১০] এক্ষেত্রেও হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যালয়ের এম. ই. পর্যায়ে উন্নীতকরণের সময়কালের স্মৃতি বিভ্রাটে ফেলেছে।

পরবর্তী কালে প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাত্রীদের প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ থাকলেও পরে R.K.I-এ মেয়েদের প্রাইভেট কোচিং শুরু হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "এবারে কৈলাসহরে শিক্ষার অঙ্গনে এগিয়ে এলেন R.K.I-এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র বর্মণ রায় মহাশয়। কিছু কিছু বাড়িতে গিয়ে স্ব-উদ্যোগে মেয়েদের পড়াতেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করেন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী মজুমদার (বিয়ের পর দেব হন, শ্রীরামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রনজিৎ দেবের মা)।[১১]" কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের আগে কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয়টি তো M.E. (মধ্য ইংরেজী) স্কুল হয় নি ? যদি শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করে থাকেন, তবে তিনি হয়তো কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয় থেকে নিম্নবাংলা স্তরের পর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কৈলাসহরের আরেক বাসিন্দা শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ দেব 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় একটি চিঠিতে লিখেছেন— "প্রথম অবস্থায় রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশনে মেয়েদের পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৯৩৬ সনের আগে এই স্কুল থেকে কোনো মহিলা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান নি। ১৯৩৬ সনে শ্রীমতি জ্যোতির্ময়ী দেব মহারাজার বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক প্রহ্লাদ চন্দ্র বর্মণ মহোদয়ের আনুকূল্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান এবং কৈলাসহরের প্রথম মহিলা মেট্রিকুলেট হন।[১২]

এ বিষয়ে ১৩৪৫ ত্রিং (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়— "Besides these, two female candidates - one private and the other from Kailashahar R. K. Institution, where co-education were allowed, sat for the same.[১৩]" অর্থাৎ শ্রীমতি জ্যোতির্ময়ী দেবী কৈলাসহরের R. K. I স্কুলের হয়ে পরীক্ষা দেন।

কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টি M. E. স্কুলে পরিণত হবার পর ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন— "১৯৪২-এ শ্রীযুক্ত বর্মণ রায় বদলি হলে পরবর্তী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (কাজিরগাঁও এর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীযুক্ত বীনাপানি ভট্টাচার্যের পিতা) এই ব্যাপারে হাল ধরেন। তাঁহার সাথে এগিয়ে এলেন স্থানীয় জনসাধারণ। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় R. K. I- তে সকালে মেয়েদের জন্য Private coaching centre খোলা হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন কাব্যতীর্থ প্রমুখ কয়েকজন স্ব-উদ্যোগে পড়াতেন। এই Coaching centre থেকে প্রথম দল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীনী হিসাবে ১৯৪৯ সনে আগরতলা গিয়ে পরীক্ষা দেন। শ্রীযুক্তা মঞ্জুলিকা বোস, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দাস প্রমুখ ৭-৮ জনই প্রথম দল।[১৪]" তিনি আরো লিখেছেন যে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আগরতলায় পরীক্ষা দিতে হলেও ১৯৫১ ইং থেকে কৈলাসহরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সেন্টার চালু হয়।

কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টির রূপান্তর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন — "এই স্কুলটিই কালক্রমে স্থানান্তর ও রূপান্তর হয়ে বর্তমানে কৈলাসহর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (মডেল স্কুল) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫]" অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেন— "মেয়েদের জন্য চাই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ত্রিপুরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন চীফ কমিশনার .... ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পত্তন হলো বর্তমান কৈলাসহর সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের (তারিখটা ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)। প্রথম প্রধান শিক্ষিকা প্রতিভা দত্তগুপ্ত স্কুলটির হাল ধরেন।[১৬]" শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্যের এই বক্তব্য দুটি সাজালে স্পষ্টতই বর্তমান কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিদ্যালয় (যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ দুটো দেওয়ায় বিভ্রান্তি আরো বেড়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এই লেখক যতটুকু লিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তার সঙ্গে হরিপদবাবুর প্রদত্ত তথ্যের মিল নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায় যে, বালিকাদের একটি এম. ই. স্কুল এবং তার সঙ্গে R.K.I-এ সকালবেলা সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের প্রাইভেট কোচিং— এইসব পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এদের অস্বীকার করে নতুন একটি মেয়েদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা কি বাস্তবোচিত ? বালিকাদের এম. ই. স্কুলটি অপরিবর্তিত থাকলে এই নতুন স্কুলটিতে ছাত্রীর জোগান হলো কিভাবে ?

এর উত্তর একটাই হতে পারে। রাজন্য আমলের মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়টিই রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের রাজন্য ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ঐ সময়ের শিক্ষানীতির সঙ্গে পরিচয় থাকতে হবে। রাজন্য আমলে যেসব বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হিসেবে চালু ছিল, ভারতভুক্তির সময়ে তাদের সেই অবস্থাতেই রাখা হয়। আর যেসব স্কুল মধ্য-ইংরেজী (M.E.) পর্যায়ে থাকলেও প্রাইভেট ব্যবস্থায় ম্যাট্রিক পর্যায়ে পড়া চালানোর ব্যবস্থা ছিল, সেগুলিকে প্রথমে জুনিয়র হাই এবং পরে অথবা সরাসরি হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। অবশ্য ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম রাজ্যে চালু হওয়ার পর কিছু কিছু বিদ্যালয় জুনিয়র হাইস্কুল থেকে সরাসরি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ভারতভুক্তির সময় রাজন্য ত্রিপুরায় মেয়েদের জন্য কেবলমাত্র একটি স্কুলই (মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়) হাই স্কুল পর্যায়ের ছিল। বাকি স্কুলগুলির মধ্যে মাত্র ৬টি বিদ্যালয়ই মধ্য ইংরেজী বা এম. ই. স্কুল ছিল। এদের মধ্যে যেগুলিতে প্রাইভেটে মেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, প্রায় সবগুলিকেই প্রথমে জুনিয়র হাই এবং পরে হাই স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছিল। কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টিকেও একইভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে এগুতে হয়েছিল। এর সমর্থন মেলে, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকায় ঐ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অপরাজিতা রায়ের স্মৃতিচারণা থেকে— "১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চারুবালা দত্ত অবসর গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে আসেন তারই পুত্রবধূ প্রতিভা দত্ত। সে সময়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই স্কুলের ছাত্রী অপরাজিতা চৌধুরী চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই বছরই কৈলাসহরের গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদের দায়িত্ব নিতে যেতে হয় শ্রীমতি প্রতিভা দত্তকে।[১৭]" শ্রীমতি অপরাজিতা চৌধুরী এ বিষয়ে লিখেছেন — "চল্লিশ বছর আগে এই স্কুল থেকে আমি স্কুল ফাইন্যাল (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন) পাশ করেছিলাম—সেটা ১৯৫৪ সাল।[১৮]" অর্থাৎ মোদ্দা কথা এই দাঁড়াল যে, শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবুর কথামত উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি তখন থেকে চালু হয় নি, এর আগে বালিকা বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুল পর্যায়ের ছিল অর্থাৎ রাজন্য আমলের মধ্য ইংরেজী (M. E.) বালিকা বিদ্যালয়টিতে আরো দুটি ক্লাস যোগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছিল।

হাই স্কুলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় তৎকালীন শিক্ষানীতি অনুসারে বিদ্যালয়টি প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রাইমারী অংশটি আগের জায়গাতেই থেকে যায় এবং সেকেন্ডারী অংশটি অর্থাৎ হাইস্কুল বিভাগটি বর্তমান জায়গায় চলে আসে।

তৎকালীন অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের রূপান্তর ঘটেছিল। সম্ভবত তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছিল এবং হাইস্কুল বিভাগটিতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। তুলসীবতী শতবর্ষ স্মরণিকায় প্রাক্তন ছাত্রীদের স্মৃতিচারণে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সন পর্যন্তও তুলসীবতী হাইস্কুলে এই ব্যবস্থা চালু ছিল।[১৯] শ্রী হরিপদ ভট্টাচার্য রাজন্য আমলের কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয়টির হাইস্কুল বিভাগের নতুন জায়গায় স্থানান্তকরণের ঘটনাটিকেই নতুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা বলে মনে করেছেন। আগের জায়গার ঐ প্রাথমিক বিভাগটিই পরবর্তী কালে মডেল স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে।

একই স্কুলের দ্বি-খণ্ডিতকরণ হলে দুটোই প্রাচীনত্বের উত্তরাধিকার বহন করে কি না, তা বিদ্বৎজনের কাছে ছেড়ে দেওয়া গেল। এক্ষেত্রে রাজন্য আমলের বালিকা বিদ্যালয়টির মূল ধারাকে যে বর্তমানের কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি বহন করে চলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত প্রাচীনত্বের নিরিখে মহারানী তুলসীবতীর প্রায় সমসাময়িক হওয়ার কারণে বিদ্যালয়টি আরো গৌরবের অধিকারী।

রাজন্য আমলে কৈলাসহর বিভাগে বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৩০৮ (১৮৯৮-৯৯ খ্রিঃ)	১	১০	১৩২৮ (১৯১৮ - ১৯ খ্রিঃ)	৪	১০০
১৩০৯ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ)	১	৭	১৩২৯ (১৯১৯-২০ খ্রিঃ)	৬	৭৯
১৩১২ (১৯০২-০৩ খ্রিঃ)	৩	২৮	১৩৩০ (১৯২০ - ২১ খ্রিঃ)	২	৪০
১৩১৩ (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ)	৩	৩৫	১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ)	২	৭৩
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ)	৩	৩৭	১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ খ্রিঃ)	২	১২৬
১৩১৫ (১৯০৫ - ০৬ খ্রিঃ)	৩	৫৪	১৩৩৪ (১৯২৪ - ২৫ খ্রিঃ)	২	১১৭
১৩১৬ (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ)	৩	৪৫	১৩৩৫ (১৯২৫ - ২৬ খ্রিঃ)	২	১০৩
১৩১৭ (১৯০৭ - ০৮ খ্রিঃ)	৩	৪৩	১৩৩৬ (১৯২৬ ২৭ খ্রিঃ)	২	৯৭
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	৩	৪২	১৩৩৭ (১৯২৭ - ২৮ খ্রিঃ)	৩	১১২
১৩১৯ (১৯০৯-১০ খ্রিঃ)	৩	৪৩	১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ খ্রিঃ)	৩	১৭৭
১৩২০ (১৯১০-১১ খ্রিঃ)	৩	৪০	১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	৩	১১৫
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	৪	৭১	১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	৩	২১২
১৩২২ (১৯১২-১৩ খ্রিঃ)	৪	৭২	১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ খ্রিঃ)	৩	১৮০
১৩২৩ (১৯১৩ - ১৪ খ্রিঃ)	৪	৭২	১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ)	৩	১৮৪
১৩২৪ (১৯১৪ - ১৫ খ্রিঃ)	৪	৫৫	১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	৩	১৭৯
১৩২৫ (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ)	৪	৫৪	১৩৪৫ (১৯৩৫ - ৩৬ খ্রিঃ)	৩	১৫৭
১৩২৬ (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ)	৪	৬১	১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	৩	১৪৭
১৩২৭ (১৩১৭-১৮ খ্রিঃ)	৩	৫২			

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলির দুই ছাত্রী পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি পাশ করলেও তাদের নামের উল্লেখ নেই। তবে ১৩৪৩ ত্রিং (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনের ত্রিপুরা স্টেট গেজেটে 'উচ্চ বাঙ্গালা পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষায় কৈলাসহর বালিকা বিদ্যালয় থেকে শ্রীমতি শৈলবালা দেবের ৩য় বিভাগে পাশ করার বিজ্ঞপ্তি আছে।[২০]

সংযোজন ঃ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর - কৈলাসহর বিভাগ' গ্রন্থে কৈলাসহর সদরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়-এর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মফঃস্বলে কয়েকটি অবৈতনিক মধ্য বাংলা, নিম্নবাংলা, পাঠশালা ও মক্তবেরও উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা - ১০)।

তথ্যসূত্র ঃ

১। The Administration Report of the Tripura State, TRI, page - 52

২। Report on the Administration of the Tripura State, R. K. De, page - 17

৩। — do —, page - 17

৪। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (২) হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, ১০/৮/২০০৩

৫। Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, (I), page - 123

৬। — do —, page - 896

৭। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (২)

৮। Adm. Report of Tripura State, page - 1058, Vol - III

৯। — do —, Vol - IV, page - 2061

১০। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (২)

১১। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (৩), হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, ১৩ / ৮ / ২০০৩

১২। আর. কে. আই- এর শতবর্ষ, বিক্রমজিৎ দেব, দৈনিক সংবাদ, ১৯/১/২০০২

১৩। Adm. Report of Tripura State, Vol - IV, p - 1864

১৪। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (৩)

১৫। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (২)

১৬। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (৩)

১৭। শতবর্ষ স্মরণিকা, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, পৃষ্ঠা - ৯১

১৮। — ঐ —, পৃষ্ঠা - ৬৪

১৯। — ঐ —, পৃষ্ঠা - ৭৫

২০। — ঐ —, পৃষ্ঠা - ১১০

ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলোনীয়া

বিলোনীয়া শহর থেকে সোজা দক্ষিণে সীমান্ত ঘেঁষে যে রাস্তাটি ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত আমলীঘাটে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার ধারেই বিলোনীয়া থেকে প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে ঋষ্যমুখে গ্রামটি অবস্থিত। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ও স্বনির্ভর উভয় প্রকারের মোটামুটি ১৫০-২০০ পরিবার নিয়ে গ্রামটি গঠিত। গ্রামটি ছোট হলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহে এটি বিশেষ গৌরবের অধিকারী। এই গ্রামেই একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, যা ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় নামে পরিচিত। বিদ্যালয়টি শতবর্ষ অতিক্রমের গৌরবে গৌরবান্বিত।

১৩১৪ ত্রিঃ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের একটি বৃত্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, এর আগের বছর অর্থাৎ ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঋষ্যমুখ বিদ্যালয় থেকে ফজলে আলি পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋষ্যমুখ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রমাণে একটি প্রামাণ্য নথি হওয়ায় পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি নিচে দেওয়া হল—

ছাত্রবৃত্তি[১]

১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সারকুলার নঃ ৩— ১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইযাছে, উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১।	শ্রী কৈলাস চন্দ্র সেন	কৈলাসহর যুবরাজ্য স্কুল	মাইনর ছাত্রবৃত্তি	৫্	তিন বৎসর
২।	শ্রী গোপাল কৃষ্ণ দে	বিলনীয়া মধ্য ইং স্কুল	উচ্চ বাঙ্গালা	৪্	চারি বৎসর
৩।	শ্রী ভারত চন্দ্র দে	ঐ	ঐ	৪্	ঐ

৪।	শ্রীমুকুন্দ চন্দ্র দাস	নূতন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়	ঐ	৪৲	ঐ
৫।	শ্রীআলী আহাম্মদ	ঐ	ঐ	৪৲	ঐ
৬।	শ্রী ইউসুফ আলী	সোনামুড়া মধ্য ইং স্কুল	নিম্ন বাঙ্গলা	৩৲	দুই বৎসর
৭।	শ্রীবদরদ্দিন	ঐ	ঐ	৩৲	ঐ
৮।	শ্রী মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য	ফটিগুলি মধ্য ইং স্কুল	ঐ	৩৲	ঐ
৯।	শ্রী প্যারী মোহন দাস	কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল	ঐ	৩৲	ঐ
১০।	শ্রী ফজলে আলী	যাত্রাপুর	পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি	২৲	ঐ
১১।	শ্রীগিরিধারী সিংহ	গোলধারপুর	ঐ	২৲	ঐ
১২।	শ্রী তোবারক আলী	ফলবপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৩।	শ্রী চৈতন্যরাম মালী	গোলধারপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৪।	শ্রী ফজলে আলী	ঋষ্যমুখ	ঐ	২৲	ঐ
১৫।	শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ত্রিপুরা	খোয়াই	ঐ	২৲	ঐ
১৬।	শ্রীমাং রসিদ	বড়কন্দ	ঐ	২৲	ঐ
১৭।	সৈয়দ আলী	যাত্রাপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৮।	শ্রীমতি বিমলাবালা দেবী	তুলসীবতীবালিকা বিদ্যালয়	ঐ	২৲	ঐ
১৯।	শ্রীমতি গিরিবঙলা দেবী	ঐ	ঐ	২৲	ঐ

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারব

এই সার্কুলার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋষ্যমুখ স্কুলটির অস্তিত্ব ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের আগেও ছিল। তখনকার পাঠশালা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলে পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হতো। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অন্ততঃ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দেও এই স্কুলটির অস্তিত্ব ছিল।

রাজন্য ত্রিপুরার অ্যাড্মিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে কিন্তু এই স্কুলটি সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এই স্কুলটির ধারাবাহিক ইতিহাস নির্মাণে এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতির সহায়তা ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্মৃতি সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষতঃ সন-তারিখের ক্ষেত্রে।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ঋষ্যমুখ স্কুলটির অস্তিত্ব জানা গেলেও এর আগে স্কুলটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ১৮৭৫-৭৬ খ্রিঃ বর্ষের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে ব্রিটিশ এলাকা নোয়াখালি জেলায় কুকিদের আক্রমণ রোধে ঋষ্যমুখে একটি সৈনিক চৌকি ছিল:— "There are at present

in the state seven posts where a military force is maintained, viz.— 1) Agurtollah. 2) Koilashur, 3) Farnah Dharm Nagar 4) Kamalpore 5) Udaypore 6) Rishiya Mukh. 7) Khadla Madla.[২]" এছাড়াও একই রিপোর্টে ঋষ্যমুখে একটি সিভিল পুলিশ থানাও ছিল বলে উল্লেখ আছে। তৎকালীন সময়ে সমগ্র রাজ্যে ৮টি থানা ও ১৫টি পুলিশ আউটপোস্ট ছিল।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে ঋষ্যমুখ গ্রামটি যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। তাই ঐ সময়ে ঋষ্যমুখ স্কুলটির অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ঋষ্যমুখ গ্রামটি বর্তমানে ত্রিপুরা ভূ-খন্ডে থাকলেও সীমান্তের ঠিক ওপারে লাগোয়া অঞ্চলে পূর্বতন ঋষ্যমুখ গ্রামটি বাংলাদেশে অবস্থিত বলে স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীরা জানিয়েছেন। তাদের মতে, ঋষ্যমুখ গ্রামটি পূর্বে চাকলা-রোশনাবাদ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ঋষ্যমুখ গ্রামটি যদি ব্রিটিশ শাসনাধীনেই থাকে, তবে তাতে ত্রিপুরার রাজার সেনাচৌকি অথবা পুলিশ থানা থাকবে কেন ? তাই মনে হয় পূর্বে ঋষ্যমুখ গ্রামটি ত্রিপুরার রাজার অধীনেই ছিল, পরে সীমানা পুনর্বিন্যাসে তা তা চাকলা-রোশনাবাদের অধীনে চলে যায়। ঋষ্যমুখের প্রাচীন বাসিন্দা মজুমদার পরিবারের বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সীতানাথ মজুমদার (বর্তমানে আগরতলায় বসবাসরত) মহাশয় জানিয়েছেন যে, স্বাধীনতার আগে থেকেই তালপুকুরের পশ্চিমপাড়ে তহশীল অফিস ও ফরেস্ট অফিস এবং তার পশ্চিম সীমান্ত লাগোয়া অংশে স্কুলঘর এবং স্কুলের মাঠ ছিল। এইসব অফিস ও স্কুলঘর শ্রীপুর মৌজায় অবস্থিত হলেও তাদের ঋষ্যমুখ তহশীল অফিস, ঋষ্যমুখ ফরেস্ট অফিস এবং ঋষ্যমুখ স্কুল নামে অভিহিত করা হতো। তারা ছোটবেলায় স্বাধীনতার আগেই এই গ্রামটিকে চাকলা-রোশনাবাদ অঞ্চলে দেখেছেন। এই গ্রামটি ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাগলনাইয়া থানা প্রথমে ত্রিপুরা জেলার (ব্রিটিশ) অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১৮৭৫ সালে তা নোয়াখালি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪] তাই মনে হয় প্রথমে ঋষ্যমুখ গ্রামেই অফিস ও স্কুল থাকলেও পরে তা শ্রীপুর মৌজায় স্থানান্তরিত হয়। বস্তুত, স্বাধীনতা লাভের পর অন্যূন আট-নয় বছর পর্যন্ত একমাত্র এই অফিস ও স্কুল ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে ঋষ্যমুখ গ্রামটির অস্তিত্ব ছিল না। এরপর শ্রীপুর মৌজা থেকে কিছু অংশ নিয়ে বর্তমান ঋষ্যমুখে গ্রামটির সৃষ্টি করা হয়।

ঋষ্যমুখের মজুমদার পরিবারটি এই অঞ্চলে যথেষ্ট প্রাচীন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ মজুমদারের পিতামহ উনবিংশ শতকের শেষভাগে ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ তারাখোজা গ্রাম থেকে মূল ঋষ্যমুখ গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত) বসতি স্থাপন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তারা জমি বিনিময় করে বর্তমান ঋষ্যমুখে চলে আসেন। সীতানাথ মজুমদারের পিতামহের দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র মজুমদারের পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মজুমদার

সীতানাথবাবুকে বলেছেন যে, তাঁর পিতা ও জ্যেঠামশাই বাল্যকালে এই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। তখন স্কুলটি ছিল পাঠশালা পর্যায়ের এবং শিক্ষক ছিলেন ক্ষীরোদ সেন। এই ক্ষীরোদ সেনের ভাইপো রজনী কান্ত সেন পরবর্তী সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক হন। তখন তাঁর সঙ্গে 'দেব' উপাধিধারী আরেক জন শিক্ষক ছিলেন। পাঠশালা পর্যায়ে কেবলমাত্র একজন গুরুমশাই স্কুল চালাতেন। তাই মনে হয়, ঐ সময়ে পাঠশালাটি নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। অশ্বিনীকুমার মজুমদারের সর্বকনিষ্ঠ কাকা হরকুমার মজুমদার ঐ স্কুলে পড়ার সময় রজনীকান্ত সেন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার মজুমদার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হন। ঐ সময়ে তার বয়স ছিল ৭৬ বৎসর। তাই বলা যেতে পারে যে, তিনি ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঋষ্যমুখ স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন।

এই হরকুমার মজুমদারেরা ৯ ভাইবোন ছিলেন। এদের মধ্যে ২ জন অল্প বয়সেই প্রয়াত হন। বাকি সাতজন অর্থাৎ ৫ জন ভাই এবং ২ জন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তাই তাদের পরপর দুইজনের মধ্যে পার্থক্য গড়ে মোটামুটি ভাবে ২ বৎসর ধরে নিলে হরকুমার মজুমদারের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মজুমদারের বয়সের পার্থক্য কমপক্ষে ১৬ বছর হয়। তাই অনুমান করা যেতেই পারে যে, জগমোহন মজুমদার ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্কুলে ভর্তি হন বলে ধরা যায়। এ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে স্কুলটির অস্তিত্বের অনুমান করা যায়।

অশ্বিনীকুমার মজুমদার মহাশয় ১৯৩৮ সালে এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ছাত্র ছিলেন বলে সীতানাথবাবুকে জানিয়েছেন। তখন স্কুলটি এম. ই. পর্যায়ের ছিল। কারণ তিনি এই স্কুলে একটানা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে খন্ডল হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৩৪৭-৪৯ ত্রিং (১৯৩৭-৪০ খ্রিঃ) সনের ত্রিবার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে সমগ্র ত্রিপুরায় ছেলেদের জন্য ১০/১১টি এম. ই. স্কুল ছিল — "During the year under review there were 10, 10 and 11 M.E. schools for Boys .... .'[৫]। এ থেকে ঋষ্যমুখ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষ্যমুখের প্রাচীন ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ে বা তারও আগে বর্তমান ঋষ্যমুখের উত্তরে রামনগর (মূল ঋষ্যমুখ গ্রামের প্রায় সমসাময়িক কালের), ছাগলনাইয়া থানার উত্তর তারাখোজা ইত্যাদি সংলগ্ন গ্রাম থেকে বহু ছাত্র এই স্কুলে পড়তে আসতো।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগে স্কুলটি তালপুকুরের পাড় সংলগ্ন অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণের একটি টিলায় অবস্থিত ছিল। তখন স্কুলটি প্রথমে পাঠশালা ও পরে নিম্নবাংলা পর্যায়ের ছিল। স্কুলটি এম. ই. (মধ্য ইংরেজী) পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সময়ে ঋষ্যমুখের পার্শ্ববর্তী গ্রাম উত্তর

তারাখোজা নিবাসী নবীনচন্দ্র ন্যায় পঞ্চাননের অর্থানুকূল্যে তালপুকুর সংলগ্ন অঞ্চলে স্কুলের জন্য মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনিযুক্ত একটি স্কুলঘর নির্মিত হয় এবং স্কুলটি টিলাভূমি থেকে স্কুলমাঠের অপরপ্রান্তে নবনির্মিত এই ঘর চলে আসে। এই সময়েই শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

নবীনচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন (চক্রবর্তী) ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামেই একটি টোল খুলেছিলেন, যেখানে থেকে বহু সংস্কৃত পণ্ডিত বেরিয়েছে। এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা বসন্তকুমার চক্রবর্তী প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর নবীনচন্দ্র ন্যায় পঞ্চাননের উৎসাহেই শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে ঋষ্যমুখ স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৫ টাকা। তিনি দীর্ঘদিন এই স্কুলে চাকুরি করার পর শেষ বয়সেও এই অঞ্চলেই দিন অতিবাহিত করতেন। এই বেতনের কথা তিনি নিজমুখেই বলে গিয়েছেন।

স্বাধীনতার আগে শুধুমাত্র তালপুকুর অঞ্চল ছাড়া বর্তমান ঋষ্যমুখের প্রায় সবটাই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই অঞ্চলগুলিতে কোনবসতি না থাকলেও তা চাকলা-রোশনাবাদের মুসলমান প্রজাদের অধিকারে ছিল। স্বাধীনতার পর সংলগ্ন পূর্ব-পাকিস্তানের ঋষ্যমুখ, উত্তরও দক্ষিণ তারাখোজা গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের জমি বিনিময়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলে উদ্বাস্তু হিন্দুদের বসতি গড়ে উঠে এবং পরবর্তী সময় শ্রীপুর মৌজা থেকে এই বসতিপূর্ণ অঞ্চলকে পৃথক করে ঋষ্যমুখ নাম দেওয়া হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই সীমান্তে গোলযোগের কারণে ঋষ্যমুখে পুলিশ ক্যাম্প, যা ইতিপূর্বে বর্তমান ঋষ্যমুখ কলোনী অঞ্চলে ছিল, তাকে সরিয়ে এনে বর্তমান শহীদ বেদী অঞ্চলে বি.এস.এফ ক্যাম্পে হিসেবে স্থাপন করলে পুলিশ ক্যাম্পের শূন্য ঘরগুলিতে ঋষ্যমুখ মধ্য ইংরেজী স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

অবশ্য তার আগেই আনুমানিক ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনগণের উৎসাহে সম্পূর্ণ বেসরকারী ভাবে স্কুলটিতে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয়। এলাকার বেকার ম্যাট্রিকুলেট অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, সন্তোষচন্দ্র সেন, সরকারী নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরেন্দ্রকুমার রায় এবং মনমোহন চক্রবর্তী (সর্বসাধারণ্যে চাণক্য পন্ডিত নামে পরিচিত)-এর অবৈতনিক শ্রমে সপ্তম শ্রেণী চালু থাকে। ১৯৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারী ভাবে সপ্তম শ্রেণী অনুমোদন লাভ করে এবং অষ্টম শ্রেণীপর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুল নামে দীর্ঘদিন চালু থাকে। ঐ সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীপুর নিবাসী শ্রীমনীন্দ্র কুমার দত্ত। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর ছাত্রদের বিলোনীয়া যেতে হতো। তাই ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে খন্ডল হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী দ্বারিকানাথ ভৌমিককে দিয়ে জনসাধারণের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে নবম ও দশম শ্রেণী খোলা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে তখন একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক এবং দশম শ্রেণীর হাই স্কুল উভয়ই চালু ছিল। ঐ

সময়ে চিফ কমিশনার এস. পি. মুখার্জী (শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায়) ঋষ্যমুখ সফরে গেলে জনসাধারণের আবেদনে সাড়া দিয়ে পরের বছর থেকেই স্কুলটিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। ফলে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী থেকে বিদ্যালয়ে সরকারী ভাবে নবম -দশম শ্রেণী চালু হয় এবং স্কুলটি বর্তমান স্থানে চলে আসে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পালিত হয়েছে বলে জানা গেছে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে বিদ্যালয়টির উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীতকরণের দিন থেকে বিদ্যালয়ের শুরু বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রাচীন গৌরবকে অগ্রাহ্য করার জন্য যে এই স্কুলের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে, তার জন্য এলাকার শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও ক্ষোভ বর্তমান। আশা করা যায় যে, অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ত্রুটি সংশোধন করে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করে নিজেদের গৌরবান্বিত করবেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃ - ৩৪১

২। Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, Edited by Dipak Kumar Choudhury, Vol - I, page - 80.

৩। — do —, page - 90

৪। ত্রিপুরার ইতিহাস, ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরী, পৃ - ১৪৩

৫। Administration Report of Tripura State, edited by Mahadeb Chakraborty, Vol - IV. page - 2061

৬। স্কুলটির অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাস ঋষ্যমুখ নিবাসী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক (২০০২ খ্রিস্টাব্দে অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত সীতানাথ মজুমদার (বর্তমানে আগরতলায় বসবাসরত) থেকে সংগৃহীত।

সংযোজন ঃ

ঋষ্যমুখ-এর এই স্কুলটি যে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দেও এম. ই. পর্যায়ের ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে প্রচারিত স্মরণিকায় (২০০২ ইং) শ্রীযুক্ত রাখাল গণ চৌধুরীর স্মৃতিচারণা থেকে। তিনি লিখেছেন— "ঋষ্যমুখ এম. ই. স্কুল হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ১৯৫৩ ইং -এর জানুয়ারী মাসে আমার জ্যেঠতুতো বড় ভাই শ্রী রবীন্দ্র গণ চৌধুরীর সঙ্গে জোলাইবাড়ি যাই।" (পৃ ঃ ৭৩)

সোনামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

সোনামুড়া বিভাগে রাজন্য ত্রিপুরায় নবদ্বীপচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন বা সংক্ষেপে N.C.I. সারা রাজ্যে প্রাচীনত্বের দিক থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। রাজধানী আগরতলা ও কৈলাসহর বিভাগে স্কুল স্থাপনার পরই সোনামুড়া বিভাগে বালকদের জন্য শিক্ষার সূচনা হয়। একই ভাবে রাজধানী ও কৈলাসহর বিভাগে নারীশিক্ষার সূচনার পর সোনামুড়া শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়। ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বছরের শুরুতে সোনামুড়া বিভাগে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়টি অবশ্যই পাঠশালা স্তরের এবং ছাত্রীসংখ্যা ১৫ জন।[১] ঐ সময়ে রাজধানী আগরতলায় একটিমাত্র বালিকা বিদ্যালয়, কৈলাসহর বিভাগে ৩টি এবং সোনামুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় অর্থাৎ সর্বমোট ৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া অন্যত্র আর কোনো বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। তবে বিদ্যালয়টি সোনামুড়া শহরের কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় নি। পাঠশালা স্তরের স্কুল হওয়ার কারণে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট গুলিতে একমাত্র পাঠশালার সংখ্যা ছাড়া বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

তবে ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায় যে, বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক স্কুলে পুরুষ শিক্ষকদের পাল্টে মহিলা শিক্ষক দেওয়া হয়েছে।[২] এ থেকে বুঝা যায়, বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন পুরুষ-শিক্ষকদের দ্বারাই আগে সম্পন্ন হতো। এর ফলে একটু বয়স বাড়লেই মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে যেত। ঐ সময়ে রাজ্যে মহিলা শিক্ষক পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। তবে, বালিকা বিদ্যালয়গুলি পাঠশালা স্তরের (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত) হলেও বিভাগীয় কেন্দ্রের কিছু কিছু স্কুলে সামান্য সংখ্যক বালিকাদের নিম্ন-বাংলা পর্যায় পর্যন্ত (চতুর্থ শ্রেণী) পড়াবার সুযোগ রাজ্য শিক্ষা বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছিল।[৩] ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে শিক্ষা বিভাগ থেকে এই বিশেষ অনুমোদন দেওয়া হয়। সোনামুড়া শহরের এই বালিকা বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিভাগীয় কেন্দ্রে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের চেয়ে ছাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যই ছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, সোনামুড়া শহরে ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার উৎসাহ যথেষ্ট ছিল, তাই অনুমান করা যায় যে, বিদ্যালয়টিতেও ১৯২৪-২৫ খ্রিঃ সন থেকে বালিকাদের নিম্ন-বাংলা পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল।

১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায়যে, রাজ্যের ৯টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিই পাঠশালা পর্যায় থেকে নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৪] বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয় হওয়াতে এটা নিশ্চিত যে, ঐ বছরই সোনামুড়ার বালিকা বিদ্যালয়টি নিম্ন বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে স্কুলটি কবে M.E. অর্থাৎ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় তা সঠিক জানা যায় না। ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সনের আগে রাজ্যে কেবলমাত্র বালিকাদের একটি এম. ই. স্কুল (তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়) ছিল, ঐ বছরই এছাড়া আরো তিনটি বালিকা বিদ্যালয় এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৫] ঐ সময় বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলগুলির মধ্যে ছাত্রীসংখ্যার ভিত্তিতে সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়টি অন্যতম ছিল। তাই মনে হয়, ঐ বছরই সোনামুড়ার স্কুলটি এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়। তবে ১৩৫৪ ত্রিং (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ) সনের মধ্যে বাকি আরো ৩টি বালিকা বিদ্যালয় এম. ই. স্কুলে পরিণত হয়। তাই সঠিক বলা না গেলেও ১৩৪৯ ত্রিং সন থেকে ১৩৫৪ ত্রিং সনের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে সোনামুড়ার স্কুলটি এম.ই. স্কুলে পরিণত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুলে (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) উন্নীত হয়। তবে রাজ্যের অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলি দ্রুত হাইস্কুলে উন্নীত হলেও সোনামুড়ার স্কুলটির হাইস্কুলে উন্নীত হতে যথেষ্ট সময় লাগে। Tripura District Gazetteers-এ দেখা যায় — "Sonamura has 1 High School and 1 girls' Junior High School in the town and another Higher Secondary School in rural area.[৬]" সোনামুড়ার বাসিন্দা উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী সুনীল কুমার রায় মহাশয় (বর্তমানে আগরতলার বাসিন্দা) ১৯৫৫-৫৬ সনে সোনামুড়া জুনিয়র হাই বালিকা বিদ্যালয়টিকে শহরের রিজার্ভ ট্যাঙ্কের (পানীয় জলের জলাশয়) দক্ষিণ পাড়ে দেখেছেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ N.C.I স্কুলটি মধুবন টিলায় চলে যাওয়ার পর এর পরিত্যক্ত দালানঘরে সোনামুড়ার বালিকা বিদ্যালয়টি চলে আসে। বর্তমান লেখক ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চাকুরিসূত্রে সোনামুড়ায় কার্যরত ছিলেন। তিনি N.C.I-কে মধুবন টিলায় এবং বালিকা বিদ্যালয়টিকে বর্তমান স্থানে দেখেছিলেন। কাজেই তার আগেই যে এই স্থানান্তরণ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল, তা নিশ্চিত। পরবর্তী সময়ে রূপান্তরণের মাধ্যমে সোনামুড়ার বর্তমান এই উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি এই চেহারায় উপনীত হয়েছে।

রাজন্য আমলে সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা
১৩১৩ (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ)	১৫	১৩৩০ (১৯২০-২১ খ্রিঃ)	৪০
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ)	১৫	১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ)	৪১
১৩১৫ (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ)	১৫	১৩৩২ (১৯২২-২৩ খ্রিঃ)	N A
১৩১৬ (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ)	৮	১৩৩৩ (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ)	৬১
১৩১৭ (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ)	১১	১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	৭০
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	১০	১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	৬৮
১৩১৯ (১৯০৯ - ১০ খ্রিঃ)	১৭	১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	৮১
১৩২০ (১৯১০-১১ খ্রিঃ)	১১	১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	৭৮
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	৮	১৩৩৮ (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ)	৮২
১৩২২ (১৯১২-১৩ খ্রিঃ)	১৭	১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	৩৮
১৩২৩ (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ)	৩৮	১৩৪০ (১৯৩০ - ৩১ খ্রিঃ)	N A
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ)	৩৯	১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	৮৭
১৩২৫ (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ)	২৮	১৩৪২ (১৯৩২ - ৩৩ খ্রিঃ)	৭৭
১৩২৬ (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ)	২৯	১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ)	৯৫
১৩২৭ (১৯১৭-১৮ খ্রিঃ)	৪৩	১৩৪৪ (১৯৩৪-৩৫ খ্রিঃ)	৭৮
১৩২৮ (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ)	২৯	১৩৪৫ (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)	৮২
১৩২৯ (১৩১৯-২০ খ্রিঃ)	৩০	১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	৭৩

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, (I) page - 139

২। — do —, (III), page - 1269

৩। — do —, (III), page - 1058

৪। Adm. Report of Tripura State, (Vol - IV), page - 2061

৫। — do —, page - 2061

৬। Tripura District Gazetteers, page - 324

ধর্মনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

ধর্মনগর বিভাগ রাজন্য ত্রিপুরার নারীশিক্ষার সূচনার ক্ষেত্রে চতুর্থ, যেখানে বিভাগীয় কেন্দ্র ধর্মনগর শহরে ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ) সনে পাঠশালা পর্যায়ের একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়।[১] অবশ্য এর আগে থেকেই মেয়েদের শিক্ষার আগ্রহ থাকায় ছেলেদের স্কুলেই পাঠশালা পর্যায়ে মেয়েদের পড়তে দেখা যায়। রাজন্য আমলের শেষ পর্যন্ত সারা বিভাগে বালিকাদের এই একটিমাত্রই স্কুল ছিল। এছাড়া অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিশেষ কোনো তথ্য মেলে না।

তবে ১৩৩৪ ত্রিং সনের (১৯২৪ - ২৫ খ্রিঃ) রিপোর্টে রাজ্যের বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সার্বিকভাবে শিক্ষা বিভাগ প্রচারিত একটি বিশেষ আদেশের উল্লেখ দেখা যায়— "In some of these schools, under special order of the Education Department, girls were allowed to read the Lower Vernacular and the Upper Vernacular standard.[২]" এই আদেশের ফলেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কৈলাসহরে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী মজুমদারের (পরে দেব) প্রথম মহিলা হিসেবে মেট্রিক পাশ করার সুযোগ হয়েছিল। বিভাগীয় কেন্দ্র হওয়ায় ধর্মনগরের বালিকা বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা যে ছিল, তা ঐ সময়ে অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়ের তুলনায় ছাত্রীসংখ্যার আধিক্য দ্বারা নিশ্চিত হয়। ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছর বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির কিছু বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষকদের পাল্টে মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।[৩]

১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনে বিদ্যালয়টি নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং যেহেতু ঐ সময়ে ছাত্রীসংখ্যার ভিত্তিতে স্কুলটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই মনে হয় পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ সনে স্কুলটি মধ্য-ইংরেজী অর্থাৎ এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়। কারণ, ঐ বছরেই রাজ্যের তিনটি বালিকা বিদ্যালয় এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়।[৪] অবশ্য ১৩৫৪ ত্রিং (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ) সনের মধ্যে রাজ্যের মোট ৬টি বালিকা বিদ্যালয় মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়।[৫] তাই পূর্বোক্ত অনুমানটি যদি ভুলও হয়ে থাকে, তবে ১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ সনের মধ্যেই বিদ্যালয়টি এম.ই. স্কুলে উন্নীত যে হয়েছিল, তা নিশ্চিত বলা যায়।

ভারতভুক্তির পর বিদ্যালয়টি তৎকালীন রীতি অনুসারে সম্ভবত প্রথমে জুনিয়র হাই (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) এবং তারপর হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কৈলাসহর

বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জুনিয়র হাই থেকে হাইস্কুলে পরিণত হয়েছিল। Tripura District Gazetteers-এ দেখা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যে বালিকাদের জন্য ৮টি হাই স্কুল ছিল— During the year 1953-54 there were in all 31 high schools including 8 for girls in this territory.[৬]" পরে স্কুলটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের এই রূপ পরিগ্রহণ করে।

রাজন্য আমলে ধর্মনগর বিভাগে বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৩১২ (১৯০২-০৩ খ্রিঃ)	০	৭	১৩১৩ (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ)	০	৬
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ)	০	৮	১৩১৫ (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ)	১	১৬
১৩১৬ (১৯০৬ - ০৭ খ্রিঃ)	১	৭	১৩১৭ (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ)	২	৩৫
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	২	৫৩	১৩১৯ (১৯০৯-১০ খ্রিঃ)	১	২৪
১৩২০ (১৯১০ - ১১ খ্রিঃ)	১	২৯	১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	১	৩৩
১৩২২ (১৯১২ - ১৩ খ্রিঃ)	১	২৩	১৩২৩ (১৯১৩ - ১৪ খ্রিঃ)	১	২৭
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ)	১	৪৮	১৩২৫ (১৯১৫ - ১৬ খ্রিঃ)	১	৩২
১৩২৬ (১৯১৬ - ১৭ খ্রিঃ)	১	২০	১৩২৭ (১৯১৭-১৮ খ্রিঃ)	১	২৩
১৩২৮ (১৯১৮-১৯ খ্রি)	১	২৬	১৩২৯ (১৯১৯-২০ খ্রিঃ)	১	১৮
১৩৩০ (১৯২০-২১ খ্রিঃ)	১	৩৪	১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ)	১	১১
১৩৩২ (১৯২২ - ২৩ খ্রিঃ)	NA	NA	১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ খ্রিঃ)	১	৩৭
১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	১	২৯	১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	১	১৮
১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	১	৪১	১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	১	২৫
১৩৩৮ (১৯২৮ - ২৯ খ্রিঃ)	১	৫৩	১৩৩৯ (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ)	১	১৭
১৩৪০ (১৯৩০ - ৩১ খ্রিঃ)	NA	NA	১৩৪১ (১৯৩১ - ৩২ খ্রিঃ)	১	৭১
১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	১	৬৩	১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ)	১	৭৭
১৩৪৪ (১৯৩৪-৩৫ খ্রিঃ)	১	৮৪	১৩৪৫ (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)	১	৭৮
১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	১	৬১			

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, (Vol- I) page - 165

২। —do—(Vol - III), page - 1058

৩। —do—, page - 1262

৪। Adm. Report of Tripura State, (Vol - IV) page - 2061

৫। Report on the Administration of The Tripura State, R. K. De, page - 146

৬। Tripura District Gazetteers, page - 323

খোয়াই উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

খোয়াই রাজন্য আমলে শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে অনগ্রসর বিভাগ ছিল। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় "ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর — খোয়াই বিভাগ" পুস্তকে লিখেছেন— "খোয়াই বিভাগের প্রজাগণ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই অনুন্নত।[১]" এই বিভাগে বিভাগীয় কেন্দ্র খোয়াই শহরটি ছাড়া অন্যত্র বাঙালী বসতি খুবই কমই ছিল। তবে খোয়াই শহর বিভাগীয় কেন্দ্র হওয়ায় সেখানে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙালী (বিশেষতঃ রাজ কর্মচারী) এবং শিক্ষায় আগ্রহী মণিপুরী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। ফলে সেখানে মেয়েদের শিক্ষার দাবী অনুভূত হওয়ায় ১৩১৭ ত্রিং (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ) সনে ১২ জন মেয়েকে নিয়ে খোয়াই শহরে পাঠশালা পর্যায়ের একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[২] কিন্তু খোয়াই শহরের বিস্তার খুব একটা বেশী না থাকায় ক্ষুদ্র জনসংখ্যার কারণে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত কখনই বাড়ে নি। তবুও বিভাগীয় স্কুল হিসেবে এর গুরুত্ব থাকায় বিদ্যালয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে ছিল।

১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের শিক্ষা বিভাগের বিশেষ অনুমতি[৩], যাতে বালিকা বিদ্যালয়গুলি পাঠশালা স্তরের হলেও অন্তত নিম্নবাংলা পর্যায় পর্যন্ত উৎসাহী মেয়েদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়, সেই সুযোগ এই স্কুলে সম্প্রসারিত হয়েছিল কি না অথবা ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনে এই বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষকদের পাল্টে মহিলা শিক্ষক দেওয়া হয়েছিল[৪] কিনা, তা আজ জানার উপায় নেই। তবে বিভাগীয় স্কুল হওয়ায় ১৩৫৪ ত্রিং (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ) সনের মধ্যেই যে তা এম. ই. অর্থাৎ মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়েছিল, তার জোরালো সম্ভাবনা বর্তমান। অবশ্য এর আগে ১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনেই বালিকা বিদ্যালয়টি পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।[৫] ঐ সময়ে রাজ্যে সদর, কৈলাসহর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, খোয়াই, ধর্মনগর, উদয়পুর, সাব্রুম এই ৮টি বিভাগ এবং অমরপুর নামে একটি উপ বিভাগ ছিল। এর মধ্যে সাব্রুম ও অমরপুরে মেয়েদের কোনো স্কুল ছিল না, অর্থাৎ ৭টি বিভাগে মেয়েদের স্কুল ছিল। আগরতলায় তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় ১৩৫১ ত্রিং (১৯৪১-৪২ খ্রিঃ) সনে হাইস্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৩৫৪ ত্রিং (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ) ত্রিং সনের মধ্যে বিভাগীয় স্কুলগুলি এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়। এছাড়া ঐ

বছরে রাজ্যে আরো ৫টি নিম্ন-বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ছিল।[৬] ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর রাজ্যের অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলির মতই খোয়াই বালিকা বিদ্যালয়টি সম্ভবত প্রথমে জুনিয়র হাই এবং পরে হাই স্কুলে এবং সর্বশেষে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমানের চেহারা লাভ করে। ১৯৫৩-৫৪ সনে রাজ্যে মোট ৮টি বালিকাদের হাইস্কুল ছিল। আবার ১৯৬৩-৬৪ সনের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে খোয়াই-এ একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দুটি হাই স্কুল শহরাঞ্চলে ছিল। এই হাইস্কুল দুটির মধ্যে একটি যে বালিকাদের, তাতে নিশ্চিত হওয়া যায়।

রাজন্য আমলে খোয়াই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা
১৩১৭ (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ)	১২	১৩৩২ (১৯২২-২৩ খ্রি)	N. A.
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	৯	১৩৩৩ (১৯২৩ - ২৪ খ্রিঃ)	১৩
১৩১৯ (১৯০৯-১০ খ্রিঃ)	১৭	১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	১১
১৩২০ (১৯১০ - ১১ খ্রিঃ)	৯	১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	১৬
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	১০	১৩৩৬ (১৯২৬ - ২৭ খ্রিঃ)	১৪
১৩২২ (১৯১২ - ১৩ খ্রিঃ)	১০	১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	১৪
১৩২৩ (১৯১৩ - ১৪ খ্রিঃ)	১৭	১৩৩৮ (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ)	১৩
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ)	১২	১৩৩৯ (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ)	১৪
১৩২৫ (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ)	১৫	১৩৪১ (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	১২
১৩২৬ (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ)	১৬	১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	১৩
১৩২৭ (১৯১৭-১৮ খ্রিঃ)	১২	১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ)	১৭
১৩২৮ (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ)	১৪	১৩৪৪ (১৯৩৪-৩৫ খ্রিঃ)	১৬
১৩২৯ (১৯১৯-২০ খ্রিঃ)	১৪	১৩৪৫ (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)	১৩
১৩৩০ (১৯২০-২১ খ্রিঃ)	১৮	১৩৪৬ (১৩৩৬-৩৭ খ্রিঃ)	১৫
১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ)	১৬		

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর খোয়াই বিভাগ, পৃ - ৮

২. Tripura State Administration Report 1907-08, Appendix xxiii (page - 140)

৩. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, (Vol - III), page - 1058

৪. — do —, (Vol - III), page - 1269

৫. — do —, (Vol - IV), page - 2061

৬. Report on the Administration of the Tripura State, Ranjit Kr. De, page - 146

কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, বিলোনীয়া

বিলোনীয়া থেকে নলুয়া হয়ে দক্ষিণে যে রাস্তাটি চলে গেছে, সেই রাস্তায় ঋষ্যমুখ থেকে ২/৩ কিলোমিটার দক্ষিণে কৃষ্ণনগর গ্রামটি অবস্থিত। কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি হাইস্কুল আছে। এই স্কুলটিও নীরবে একশত বৎসর অতিক্রম করেছে। রাজন্য আমলে কখন এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়,তা জানা না গেলেও অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে যে স্বল্প কয়েক ভাগ্য-সম্পন্ন স্কুলের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে এই স্কুলটি একটি।

১৩১৮ ত্রিং (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিলোনীয়া বিভাগের কৃষ্ণনগর পাঠশালাটিকে ঐ বছর নিম্নবাংলা পর্যায়ে উন্নীত করা হয়— "The Krishsnagar patsala within the Belonia Division was raised to be a Lower Vernacular School. ....[1]" এ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে বিলোনীয়ার কৃষ্ণনগর গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। গ্রামটিতে শিক্ষার চাহিদা যে যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে। ঐ বছরেই বিদ্যালয়টি উচ্চ বাঙ্গালা (Higher Vernacular) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় — "There was one Higher Verncular School only for boys, a new Institution, — Krishnanagar Lower Vernacular school having been experimentally raised to the status in the beginning of the year under report.[2]" ঐ রিপোর্টে আরো উল্লেখ রয়েছে ঐ বছরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১ জন— "The school had 71 pupils on the rolls, with an average daily attendance of 52 07." ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলটিতে ছাত্রসংখ্যা নেহাৎ মন্দ ছিল না, কৃষ্ণনগর ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে পাঠশালায় শিক্ষান্তে এই স্কুলে এসে ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছিল বলে অনুমান করা যায়।

কৃষ্ণনগর উচ্চ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রসংখ্যা	গড় উপস্থিতি	খরচ (টাকা)	মন্তব্য
১৩২০ (১৯১০-১১ খ্রিঃ)	৭১	৫২০৭	N.A	১৩২৫ ত্রিং সন থেকে স্কুলটির জন্য পৃথক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ ঐ বছর থেকে রাজ্যে দুটি H. V. স্কুল হয়।
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	৬৬	৪৯২	৫৩০	
১৩২২ (১৯১২-১৩ খ্রিঃ)	৬৭	৪৭৭৮	৫৬২	
১৩২৩ (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ)	৬৭	৪৯০৪	৫৩২	
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ)	৬৮	৫৩ ৪৪	৫৪৯	

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

এই অনুমানের সত্যতা পাওয়া যায় পরবর্তী রিপোর্টে, যেখানে আমরা স্কুলটিকে মধ্য ইংরেজী (এম. ই.) স্কুলে দ্রুত উন্নীত হতে দেখি। ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় স্কুলটি এম. ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে— "There was only one H. V. School against 2 in the previous year, the Krishnanagar H.V. School having being raised to the status of a M. E. School.[৩]"

এরপর থেকে পৃথকভাবে স্কুলটির কোনো উল্লেখ পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে পাওয়া যায় না, তবে ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনের পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে রাজ্যে মধ্য ইংরেজী (এম.ই.) স্কুলের সংখ্যা কখনই কমে নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে (১৩২৮ ত্রিং সনে ৪টি থেকে ১৩৫৫ ত্রিং সনে ১৬টি)[৪]। এছাড়া মধ্যবর্তী সময়ে কোন এম.ই. স্কুলের নিচু পর্যায়ে অবমূল্যায়নেরও উল্লেখ নেই। কাজেই অন্তত ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের এই স্কুলটি এম. ই. পর্যায়ের স্কুল যে ছিল তাতে নিশ্চিত হওয়া যায়। ঐ সময়ের কিছু আগেই ঋষ্যমুখের স্কুলটি এম. ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার ফলে কৃষ্ণনগরের স্কুলটির গুরুত্ব যে ঐ অঞ্চলে হ্রাস পায়, তা নিশ্চিত। তাই পরবর্তী বছরগুলিতে স্কুলটির অবমূল্যায়ন ঘটেছিল কি না, তা স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের পক্ষে বলাই সম্ভব। ঋষ্যমুখের প্রাচীন বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সীতানাথ মজুমদারের বর্তমান বয়স ৬৬ বৎসর। তিনি ১০ বৎসর বয়স নাগাদ কৃষ্ণনগর স্কুলের দুই-একজন শিক্ষককে ঋষ্যমুখে ভাড়াবাড়িতে থাকতে দেখেছেন, কিন্তু স্কুলটি তখন নিম্ন-বাংলা অথবা এম. ই.-এর কোন পর্যায়ে ছিল, তা নিশ্চয় করে বলতে পারেন নি। তবে তিনি জানিয়েছেন যে, স্কুলটি প্রথমে উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে পরে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের রূপ নিয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Administration Report of Tripura state. Mahadeb Chakaraborty. Vol - I, page - 207

২. — do — , page - 334

৩. The Administration Report of Tripura State, TRI, page - 157

৪. Report on the Administration of the Tripura State, R. K. De, page - 146.

সংযোজন ঃ

অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় যে, ১৩১৪ ত্রিং সনে সমগ্র বিলোনীয়া বিভাগে ১২টি, ১৩১৫ ত্রিং সনে ১৩টি, ১৩১৬ ত্রিং সনে ১৩টি, ১৩১৭ ত্রিং সনে ১৩টি স্কুল ছিল। কৃষ্ণনগরের এই স্কুলটি ঐ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কুল হওয়ায় আমরা স্বচ্ছন্দে এর অস্তিত্ব ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য এর আগেও স্কুলটির অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সাব্রুম বিভাগ চালু হয়।[১] স্বভাবতই এই বিভাগের অন্যত্র না হলেও বিভাগীয় কেন্দ্রে অবশ্যই সেই সঙ্গে একটি স্কুল চালু করার কথা। কিন্তু ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ সময়েই সাব্রুম বিভাগে বালকদের জন্য তিনটি স্কুল চালু ছিল।[২] সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলটি আরো আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই সাব্রুম বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলটি শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, বলা যেতে পারে। স্কুলটি কখন পাঠশালা পর্যায় থেকে নিম্ন-বাংলা এবং নিম্ন-বাংলা থেকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়, তা রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় না। তবে ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের আগে যে স্কুলটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয় নি, তা নিশ্চিত। ঐ বছরে রাজ্যে মাত্র ৫টি এম. ই. স্কুল ছিল[৩] এবং তা উদয়পুর, খোয়াই, কৃষ্ণনগর (বিলোনীয়া), কমলপুর এবং বিশালগড়ে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে রাজ্যে আরো ৬টি নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয় এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়, কাজেই বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুল হওয়ায় এর মধ্যেই যে সাব্রুমের স্কুলটি এম.ই. স্কুলে উন্নীত হয়, তা নিশ্চিত। 'শিক্ষক সম্মিলনী' সম্পর্কে প্রচারিত মেমোতে এর সমর্থন মেলে। ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনের কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষে প্রচারিত গেজেটে ঐ মেমোতে বলা হয়েছে— " ..... বর্তমান বর্ষ হইতে প্রত্যেক বিভাগীয় হেড কোয়ার্টারে সরস্বতী পূজার পরদিন প্রতিবর্ষে একবার করিয়া 'শিক্ষক সম্মিলনীর" কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। .... ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ সম্মিলনীর সভাপতিস্বরূপ কার্য করিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে সভাপতি ও সেক্রেটারীপদে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নিযুক্ত করিবেন .....[৪]।"

এই বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট যে, ঐ সময়ে বিভাগীয় কেন্দ্র অর্থাৎ হেড কোয়ার্টারে অন্তত মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল। ঐ সময়ে রাজ্যে সদর, কৈলাসহর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, খোয়াই, ধর্মনগর, উদয়পুর, সাব্রুম এই ৮টি বিভাগ ও অমরপুর উপ বিভাগ ছিল। এর মধ্যে সদরে উমাকান্ত

একাডেমী, কৈলাসহরে R.K.I, বিলোনীয়ায় B.K.I, ধর্মনগরে B.B.I এবং সোনামুড়ায় N.C.I.-এই পাঁচটি হাইস্কুল ছিল।[৫] কাজেই উদয়পুর, খোয়াই ও সাব্রুমে বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলগুলি তখন এম. ই. পর্যায়ভুক্ত ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে রাজন্য আমলেই উদয়পুর ও খোয়াইয়ের স্কুল দুটি হাইস্কুলে উন্নীত হলেও সাব্রুমের স্কুলটি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির আগে পর্যন্ত এম. ই. স্কুল হিসেবেই চালু থাকে।

সাব্রুম বিভাগীয় কেন্দ্রের এই স্কুলটি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময়ে যে এম.ই. পর্যায়েই ছিল, তা সাব্রুমের বাসিন্দা এবং সাব্রুম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাখাল নাথ মহাশয় (কলেজ জীবনে একাধারে লেখকের সহপাঠী ও বন্ধু) জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, স্কুলটি প্রথমে হাইস্কুল পরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

তাই সাব্রুম দ্বাদশ বিদ্যালয়টি যে অন্ততঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তাতে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

সূত্র ঃ

১. ত্রিপুরার ইতিহাস, জগদীশ গণচৌধুরী, পৃ - ১৬১

২. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, Vol - I, page - 302

৩. — do —, Vol - III, page - 1058

৪. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃ - ২০৮

৫. Adm. Report of Tripura State, Vol - IV, page - 1607

উদয়পুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী আগরতলায় রাজ্যে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল (যা এখন পর্যন্ত একটানা চালু আছে) মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হলেও তা নেহাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টি সম্পর্কেও খুব সম্ভবত, একই কথা বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৭-৯৮ খ্রিঃ (১৩০৭ ত্রিং) সন থেকেই সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে এই দুইটি স্কুল চলে আসে। কিন্তু ঐ সময়ে রাজ্যের অন্যান্য বিভাগগুলিতে (ধর্মনগর, খোয়াই এবং সোনামুড়া) কোনো বালিকা বিদ্যালয় চালু হয়নি। তবে ধীরে ধীরে অন্যান্য বিভাগগুলিতে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা গড়ে উঠে এবং একের পর এক একটি বিভাগে বিভাগীয় কেন্দ্রে বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। আগে উদয়পুর সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকারিতার উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদয়পুর বিভাগের সৃষ্টি হলে এই বিভাগে শিক্ষাপ্রসারের কাজ আরো দ্রুততর হয়ে পড়ে। বিভাগীয় কেন্দ্র হওয়ায় উদয়পুরকে ঘিরে রাজকর্মচারী ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতে থাকে। এর ফলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রক্ষণশীলতার কারণে বালকদের সঙ্গে পাঠশালায় বালিকাদের একত্রে পড়াশুনার বাধা থাকলেও ঐ সময়ে উদয়পুরে বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো স্কুল না থাকায় দুই-এক জন উৎসাহী ছাত্রী ছেলেদের পাঠশালাতেই পড়তে বাধ্য হয়, কিন্তু পড়াশুনায় উৎসাহী মেয়েদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ার কারণে ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনেই উদয়পুর বিভাগে একসঙ্গে দুটি বালিকা বিদ্যালয় (পাঠশালা পর্যায়ের) স্থাপিত হয়। এর মধ্যে একটি উদয়পুরে অর্থাৎ বিভাগীয় কেন্দ্রে অবস্থিত হলেও অপরটি কোথায় ছিল তা জানা সম্ভব হয় নি। এই দ্বিতীয় পাঠশালাটি অবশ্য স্থায়ী হয় নি, ১১ বছর চালু থাকার পর ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১ খ্রিঃ) সনে তা লুপ্ত হয়। তবে উদয়পুর শহরে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটানা চালু যে ছিল, তা বিভিন্ন অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থেও এই বালিকা বিদ্যালয়টির উল্লেখ আছে। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখেছেন— ''বর্তমান উদয়পুর বিভাগে, রাধাকিশোরপুর টাউনে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং

মায়ের বাড়ী, শালগড়া, হদ্রা, কাকড়াবন, মির্জা এই কয়েকটি স্থানে পাঁচটি পাঠশালা স্থাপিত আছে।[১]" তখন বর্তমান উদয়পুর শহর রাধাকিশোরপুর নামে পরিচিত হত। এ প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত একই গ্রন্থে একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিভাগীয় অফিসাদিসহ বর্তমান সহরের এই নামকরণ করিয়াছিলেন"। "উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থটি ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনে প্রকাশিত হলেও এর পান্ডুলিপি ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহারাজের কাছে ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনের মাঝামাঝি সময়ে পেশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— "..... শ্রীশ্রীযুতের শুভ-রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে উদয়পুর নগর ও খোয়াই বিভাগের বিবরণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রী শ্রীযুতের নিকট উপস্থিত করার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ....[২]" মহারাজ বীরবিক্রমের রাজ্যাভিষেক হয় ১৯শে আগস্ট, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে।[৩] তাই 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থের তথ্যাবলী ১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ) সনের অথবা তার আগের। ফলে উদয়পুর বিভাগের একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়টি যে বিভাগীয় কেন্দ্র উদয়পুর শহরেই অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দিহান হওয়া যায়। সূচনায় বালিকা বিদ্যালয়টি কোথায় ছিল, তা জানা না গেলেও শহরের প্রাচীন বাসিন্দাদের স্মৃতিচারণে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। ত্রিপুরার বহুল প্রচারিত 'স্যন্দন পত্রিকা'-য় ২৮শে জুলাই, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে উদয়পুরের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্যের উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, শহরের আদি বাসিন্দা রাখালচন্দ্র সেন জগন্নাথ দীঘির উত্তর পাড়ে ছন ও বাঁশ দিয়ে মেয়েদের স্কুল নির্মিত হতে দেখেছেন। এই প্রতিবেদনে শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট এবং এমন কি, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থও প্রমাণ করে যে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের আগেও এই বালিকা বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয়তঃ দীঘির পাড়ে ছন-বাঁশ দিয়ে নির্মাণ স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালের সূচক হতে পারে না। এমনও হতে পারে যে, স্কুলটি আগে অন্যত্র ছিল, পরে এখানে এসেছে। অথবা ঐ সময়ে বালকদের এম. ই. স্কুলটিতেই সকালবেলায় বালিকাদের স্কুল বসত, পরে নিজস্ব জায়গায় চলে আসে। এই ধরনের সম্ভাবনার কোনটি ঠিক, তা নিশ্চিত বলার আজ উপায় নেই। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে মেয়েদের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে একমাত্র তুলসীবতী স্কুলেরই উল্লেখ প্রত্যেক বছর থাকলেও রাজ্যের অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়ের উল্লেখ নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, শহরের প্রাচীন বাসিন্দাদের স্মৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যে যায় না, তা আমরা আগেই দেখেছি।

অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, অন্তত ১৩৪৭ ত্রিং (১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দ) সন পর্যন্ত একমাত্র মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া রাজ্যের বাকী ৯টি স্কুলই পাঠশালা

পর্যায়ের ছিল। ১৩৪৮ ত্রিং সনে (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) ৮টি পাঠশালা নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৪] তবে ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছর থেকে শিক্ষা বিভাগের বিশেষ আদেশে কয়েকটি স্কুলের কিছু কিছু বালিকাকে নিম্ন-বাংলা পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়।[৫] বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেই এই চাহিদা থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই উদয়পুরের এই বালিকা বিদ্যালয়টিতেও এই সুবিধা ছিল বলে মনে হয়। ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বলা হয়েছে— "In some of the Girls` school located at the divisional head-quarters, the male teachers were substituted by lady teachers.[৬]" ছাত্রীসংখ্যার নিরিখে উদয়পুরের বালিকা বিদ্যালয়টি বিভাগীয় কেন্দ্রের ৬টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে চতুর্থ, তাই এতে ঐ বছরে মহিলা শিক্ষক এই বালিকা বিদ্যালয়টিতে দেওয়া হয়েছিল কি না, তাতে সন্দেহ আছে।

১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে আমরা আগেই দেখেছি, রাজ্যের ৯টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিই পাঠশালা পর্যায় থেকে নিম্ন-বাংলা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয় হওয়ার কারণে ঐ বছরই উদয়পুরের বালিকা বিদ্যালয়টি যে নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়, তা নিশ্চিত বলা যায়। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় যে, ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সন থেকে ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সনের মধ্যে রাজ্যে মোট ৬টি বালিকা বিদ্যালয় মধ্য ইংরেজী বা এম.ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়। কাজেই এই সময়সীমার মধ্যে উদয়পুরের বালিকা বিদ্যালয়টি যে এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য ঐ প্রতিবেদনে এবং একই পত্রিকায় ১৮ জুন, ২০০৫ইং সনে আরেকটি প্রতিবেদনে লিখেছেন, শ্রীযুক্তা শ্যামলা কর ছিলেন উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা। এক অর্থে এই বক্তব্যটি ঠিক হলেও তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শ্রীযুক্তা শ্যামলা কর বড়দোয়ালী স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ৺সুধীর করের ভগিনী এবং এই লেখকের শ্বশ্রুমাতা। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে চাকুরিতে যোগদান করেন। বছর দেড়েক পর তিনি উদয়পুরের বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি সন-তারিখ সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও চাকুরিজীবনের ইতিবৃত্ত আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে প্রয়াত হলেও তাঁর ছেলে-মেয়েরা বেঁচে আছেন। তিনি যখন উদয়পুরে বদলি হন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়স আনুমানিক ১০/১১ বছর। বড় ছেলের বয়স বর্তমানে ৭৪ বছর। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৯৪৩/৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্কুলটি এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাই শ্যামলা কর বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হন কিভাবে ?

রাজন্য আমলের শিক্ষানীতি অনুসারে, কেবলমাত্র এম. ই অথবা তার চেয়ে উচুঁ পর্যায়ের স্কুলের ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। পাঠশালাতে একজনই গুরুমশাই থাকতেন এবং নিম্নবাংলা স্কুলগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যার গুরুত্ব অনুসারে একাধিক শিক্ষক নিযুক্ত হলেও তাতে প্রধান শিক্ষকের কোন পদ ছিল না। শ্যামলা করের ধর্মনগর থেকে উদয়পুরে বদলীর কারণই ছিল উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়টির মধ্য ইংরেজী স্তরে উন্নীতকরণ এবং এই কারণেই শ্যামলা কর বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা।

ভারতভুক্তির পর ১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের জন্য ৮টি হাইস্কুল ছিল[৭]। ঐ বছরই কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। তাই অনুমান করা যায় যে, এর আগে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির বালিকা বিদ্যালয়গুলি রাজন্য আমলের এম. ই. স্কুল থেকে প্রথমে জুনিয়র হাই এবং পরে হাইস্কুলে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য লিখেছেন— "১৯৫৮-৫৯ সালে এটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[৮]" Tripura District Gazetteers থেকেও এর পরোক্ষ সমর্থন মেলে— "Udaipur Sub-division has 1 boy's Higher Secondary, 1 boys' and 1 girls' High school at the head-quarters town and 1 Higher Secondary school in rural area.[৯]" এই তথ্য ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দ বর্ষের। এরপর বিদ্যালয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে।

শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই বালিকা বিদ্যালয়টি বর্তমান শিক্ষা উপ-অধিকর্তার অফিস-প্রাঙ্গণে ছিল। এক অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হবার ফলে কিছুদিন K.B.I. স্কুলে সকালবেলায় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন চালানো হয়। পরে আবার পুরানো জায়গায় চলে আসে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান বাড়িটির উদ্বোধন করেন।

রাজন্য আমলে উদয়পুর বিভাগে বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	বালিকাদের স্কুলসংখ্যা	মোট ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	বালিকাদের স্কুলসংখ্যা	মোট ছাত্রীসংখ্যা
১৩১৪ (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ)	০	১	১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ)	১	১৪
১৩১৫ (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ)	০	০	১৩৩২ (১৯২২-২৩ খ্রিঃ)	NA	NA
১৩১৬ (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ)	০	১	১৩৩৩ (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ)	১	১২
১৩১৭ (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ)	০	০	১৩৩৪ (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	১	১৬
১৩১৮ (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ)	০	২	১৩৩৫ (১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	১	২৪
১৩১৯ (১৯০৯-১০ খ্রিঃ)	২	৫৬	১৩৩৬ (১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	১	২৪
১৩২০ (১৯১০-১১ খ্রিঃ)	২	২১	১৩৩৭ (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	১	২০
১৩২১ (১৯১১-১২ খ্রিঃ)	২	২৫	১৩৩৮ (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ)	১	২৮

১৩২২ (১৯১২-১৩ খ্রিঃ)	২	২৭	১৩৩৯ (১৯২৯ - ৩০ খ্রিঃ)	১	১৫
১৩২৩ (১৯১৩ - ১৪ খ্রিঃ)	২	২৭	১৩৪০ (১৯৩০ - ৩১ খ্রিঃ)	পাওয়া যায় নি	পাওয়া যায় নি
১৩২৪ (১৯১৪ - ১৫ খ্রিঃ)	২	৩৫	১৩৪১ (১৯৩১ - ৩২ খ্রিঃ)	১	২৩
১৩২৫ (১৯১৫ - ১৬ খ্রিঃ)	২	৫৫	১৩৪২ (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	১	২০
১৩২৬ (১৯১৬ - ১৭ খ্রিঃ)	২	৪৯	১৩৪৩ (১৯৩৩ - ৩৪ খ্রিঃ)	১	১৮
১৩২৭ (১৯১৭ - ১৮ খ্রিঃ)	২	৩৩	১৩৪৪ (১৯৩৪ - ৩৫ খ্রিঃ)	১	১৫
১৩২৮ (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ)	২	৩৩ .	১৩৪৫ (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)	১	১৬
১৩২৯ (১৯১৯ - ২০ খ্রিঃ)	২	১৬	১৩৪৬ (১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ)	১	২১
১৩৩০ (১৯২০-২১ খ্রিঃ)	১	১২			

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

সে যুগে যথেষ্ট অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো, দ্বিতীয়ত সব পরিবারই মেয়েদের রক্ষণশীলতা কারণে সহজে স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। ফলে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্কুলটির অবলুপ্তি যেমন ঘটেছে, ছাত্রীসংখ্যা যেমন বছর বছর বিসদৃশ ভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সময়ের প্রবাহে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাও একদম বাড়ে নি।

তথ্যসূত্র ঃ

১. উদয়পুর বিবরণ, পৃ - ৯২

২. — ঐ —, পৃ - ৬

৩. ত্রিপুরার ইতিহাস, জগদীশ গণ চৌধুরী, পৃ- ১৭২

৪. Administration Report of Tripura State, Mahadeb Chakraborty, (Vol - IV), page - 206.1

৫. — do —, Vol - III, page - 1058

৬. Adm. Report of Tripura State, Vol - III, page - 1269

৭. Tripura District Gazetteers, page - 323

৮. স্যন্দন পত্রিকা, ১৮/৬/২০০৫

৯. Tripura District Gazetteers, page - 324

সংযোজন ঃ ইতিমধ্যে উদয়পুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় স্বপন ভট্টাচার্য মহাশয় স্কুলটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সহ উদয়পুরের জন প্রতিনিধি, প্রধান নাগরিক ও সরকারী আধিকারিকদের নিয়ে সভায় তাঁদের সহমতে এনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে তা প্রেরণ করেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের শীতল মনোভাবে এখনও সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়া গেলেও তিনি অদম্য উৎসাহে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, আগরতলা

ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের লিখিত রিপোর্টে সর্বপ্রথম রাজ্যে সংস্কৃত টোলের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ সনে C.W. Bolton-এর রিপোর্টে— "The school at Udaypur and the Persian Maktab and Sanskrit Tole at Agartala are really old institutions revised this year.[১]" এই রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, রাজধানীতে আরো আগে থেকেই সংস্কৃত টোলের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে খুব সম্ভবত রিপোর্টে উল্লিখিত এই সংস্কৃত টোলের আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, ১৩০৯ ত্রিং (১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে একটি সংস্কৃত টোলের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে— "..... and a sanskrit school established at the Sudder.[২]" তবে এতে কতজন ছাত্র ছিল তা জানা যায় না। তবে টোলটি যে আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল, তার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে— "The Sanskrit Tole at Agartala is also doing good work in an unostententatious way. It had 17 students on its rolls against 16 of the previous year. These students were studing— Grammar, Literature and Smriti.[৩]" পরবর্তী বছরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই স্কুলে পাঠরত ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল— "Two of the students were in receipt of a monthly stipend of Rs. 4 each.[৪]" ১৩১৭ ত্রিং (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বছর এই স্কুলের দুজন ছাত্র সরকার আয়োজিত উপাধি পরীক্ষায় মধ্য (Intermediate) -স্তর উত্তীর্ণ হয়েছিল।[৫] সরকারী ভাবে উপাধি পরীক্ষা পরিচালনা প্রমাণ করে, রাজ্যে তখন (বিশেষত রাজধানীতে) আরো প্রাইভেট সংস্কৃত টোল ছিল।

যাই হউক, অন্তত ১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত সরকারী ভাবে রাজ্যে এই একটিই সংস্কৃত টোল ছিল। ১৩২৪ ত্রিং (১৯১৪-১৫ খ্রিঃ) সনে ধর্মনগরে একটি ব্রাহ্মণ পাড়ায় সংস্কৃত টোল খোলা হয়।[৬] কিন্তু ১৩২৮ ত্রিং সনেই ধর্মনগরের এই টোলটি ধর্মনগর ফিডার হাইস্কুলের সঙ্গে মিশে যায়[৭]। ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১খ্রিঃ) সন থেকে রাজ্যে সংস্কৃত টোলের সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে এবং ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সনে

রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৫-এ দাঁড়ায়। তাই রাজধানীর এই সংস্কৃত টোলের ১৮৯৯ সন থেকে রাজন্য আমলের শেষ পর্যন্ত একটানা অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না।

২০০০ খ্রিঃ সনের ২৬ শে অক্টোবর উমাকান্ত একাডেমীর প্রাচীন ছাত্র শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি স্কুলের পুকুরটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংস্কৃত টোলটিকে দেখেছেন। ঐ সময়ে প্যারীমোহন ভট্টাচার্যের দাদা রাসমোহন স্মৃতিতীর্থ ও জগদ্বীপ বিদ্যাভূষণ ঐ টোলে পড়াতেন এবং রাজা-ই এই টোলের খরচ বহন করতেন বলে তিনি জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্ত ১৯২৭ খ্রিঃ সনে ঐ টোল থেকে আদ্য পরীক্ষা দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাইস্কুলে এই পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই জন্য তাকে ঐ স্কুলের বোর্ডিং-এ ৩/৪ দিন থাকতে হয়েছিল। ২০০০ খ্রিঃ সনেই আরেকটি সাক্ষাৎকারে উমাকান্ত প্রাইমারী বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক মোঃ কালা মিএগ জানিয়েছেন যে, রাজন্য আমলের শেষভাগে এবং ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রথম ভাগেও উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণে একই অবস্থানে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়টিকে দেখেছেন।

১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে আগরতলার সংস্কৃত বিদ্যালয়টিকে 'রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়" নামে উল্লেখ করতে দেখা যায়।[৮] আগের রিপোর্টগুলিতে এই নামের উল্লেখ না থাকলেও মনে হয়, টোলটির এই নামকরণ আরো আগে থেকেই করা হয়েছিল। তবে এই সময়ে থেকে এই সংস্কৃত স্কুলটির প্রতি যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল, তা স্পষ্ট, কারণ ১৩৩১ ত্রিং সনেই কলিকাতার Sanskrit Board of Examination- থেকে মহামহোপাধ্যায় কালিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য স্কুলটি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে সারস্বত সমাজের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্রদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।[৯] এই সারস্বত সমাজ যে ঢাকার পণ্ডিতবর্গের প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩৪৩ ত্রিং (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে— ".... and for preliminary Sanskrit Examination in Kavya and one for Preliminary Sanskrit Examination in Saraswat Vyakarana of the Dacca Saraswat Samaj, in the year under report.[১০]"

ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর Tripura Territorial Council-এর উদ্যোগে রাজধানীতে অবস্থিত এই সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের আরো তিনটি চতুষ্পাঠীকে মিলিয়ে একটি সংস্কৃত কলেজ শুরু হয়— "The Tripura Terriotorial Council took steps to start a bigger Sanskrit Institution of the nature of a sanskrit college at Agartala by amalgamating the four Chatuspathis in existance since the days of Maharajas and some preliminaries have already been completed.[১১] কাজেই বর্তমান সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় রাজন্য আমলের ১৮৯৯ খ্রিঃ সনের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত বিদ্যালয়টিরই যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী তা নিশ্চিত বলা যায়।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, আগরতলা

সংযোজন ঃ আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অধ্যায়নাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

১। অধ্যাপক পূর্বাহ্নে ৬ ১/২ ঘটিকা হইতে ৯ ১/২ ঘটিকা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৬ ১/২ ঘটিকা হইতে ৮ ১/২ ঘটিকা পর্যন্ত ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইবে।

২। ছাত্রদের জন্য সম্প্রতি ৪ চারি টাকা হারে ২টি বৃত্তি নির্ধারিত আছে, ঐ বৃত্তি গুণানুসারে প্রথম শ্রেণীতে একটি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি প্রদত্ত হইবে।

৩। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের শিক্ষার ফল মন্দ হইলে অথবা তাহাদের স্বভাব-চরিত্রে কোনও বিশেষ দোষ লক্ষিত হইলে বৃত্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে এবং তাহা গুণানুসারে অন্য ছাত্র প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

৪। ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে পাঠ করিতে পারিবে না।

৫। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ বিশেষতঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদ্বয় নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে আবশ্যক অনুসারে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে পারিবে।

৬। ছাত্রগণ উভয়বেলায় নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিবে। অনুপস্থিতির বিশেষ কারণ দর্শাইতে না পারিলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ অনুপস্থিতিকালের বৃত্তি হারাইবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণ অকারণে অনুপস্থিত থাকিলে দৈনিক দুই পয়সা জরিমানা দিবে।

৭। বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রতি সপ্তমীর দিবসে ও ত্রয়োদশীর রাত্রিতে বন্ধ থাকিবে, তদ্ব্যতীত হাইস্কুলের সহিত তুল্যভাবে হিন্দুর পর্ব্বোপলক্ষে ও গ্রীষ্মাবসরে বন্ধ থাকিবে।

৮। বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত রেজিস্টারী বহি সমস্ত থাকিবে—

(১) ছাত্রগণের নামধাম আদি বিষয়ক রেজিস্টারী।

(২) অধ্যাপকের উপস্থিতির রেজিস্টারী।

(৩) ছাত্রগণের উপস্থিতির রেজিস্টারী।

(৪) বিদ্যালয়ের ব্যবহারে সরকারী যে সমস্ত পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিস থাকে তাহার রেজিস্টারী, ইতি —

সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ১১ই পৌষ।

U.K. DAS
মন্ত্রী

(উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃষ্ঠা - ৮)

উপরোক্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এ থেকে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের একটা ধারণা পাওয়া যায়, বিদ্যালয়ে যে একজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন, তা জানা যায়।

* বিদ্যালয়টিতে ১৩১১ ত্রিং থেকে ১৩২৩ ত্রিং, ১৩২৮ ও ১৩২৯ ত্রিং সনের ছাত্রসংখ্যা কত ছিল তা জানা যায়, পরবর্তী সনগুলিতে রাজ্যে আরো সংস্কৃত টোল থাকায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পৃথকভাবে জানা যায় না। তবে বিদ্যালয়ে কখনই ছাত্রসংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না, ১৩৫৫ ত্রিং সনে রাজ্যে ৫টি টোলের মোট ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৩৭ ছিল ঃ-

আগরতলার সংস্কৃত স্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা

১৩১১ ত্রিং - ১৬/১৩১২ ত্রিং - ১৭/১৩১৩ ত্রিং - ১৪/১৩১৪ ত্রিং - ১০/১৩১৫ ত্রিং - ৯/
১৩১৬ ত্রিং - ১৭/১৩১৭ ত্রিং - ১৭/১৩১৮ ত্রিং - ২০/১৩১৯ ত্রিং - ২২/১৩২০ ত্রিং - ২১/
১৩২১ ত্রিং - ২৭ / ১৩২২ ত্রিং - ২২/১৩২৩ ত্রিং - ২৩/১৩২৮ ত্রিং - ৮ / ১৩২৯ ত্রিং - ৫

তথ্যসূত্র ঃ

১. Adm. Report of Pol. Agency, Vol - I, page - 135
২. Report on Adm. of the Tripura State, page - 44
৩. Adm. Report of Tripura State, Vol-I, page - 68
৪. — do —. page - 122
৫. Tripura State Adm. Report, page - 111
৬. The Adm. Report of Tripura State, page - 91
৭. — do —, page - 158
৮. Adm. Report of Tripura State, (II), page - 897
৯. — do —, Vol - III, page - 996
১০. — do —, Vol - IV, page - 1694
১১. Tripura District Gazetteers, page - 332

কৈলাসহর / উদয়পুর মাদ্রাসা - কোন্‌টি শতবর্ষের অধিকারী ?

মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পর ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমান বাঙালীদের ইসলামী আচার পদ্ধতি শেখাবার প্রয়োজনে বাংলাদেশের নানা স্থানে বহু মসজিদ-কেন্দ্রিক মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। মক্তবের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন মসজিদের ইমাম, যাকে মৌলভী বা মিঞাজি বলা হতো। এই মক্তবগুলিতে কোরাণের কিছু কিছু অংশ পড়ানো হতে "নাজিরা" পদ্ধতিতে অর্থাৎ অর্থ না বুঝেই কোরাণ মুখস্থ করা হতো।[১] Cummings-এর বিবরণীতেও চাকলা-রোশনাবাদে আমরা একই চিত্র পাই— "muktabs are numerous, managed by a Miaji, who knows some Koran Texts, who does the writings for his neighbours and who can celebrate a marriage.[২]" কাজেই মক্তবের "মিঞাজি"— এর যে অক্ষরজ্ঞান ছিল, তা নিশ্চিত। তবে তিনি মক্তবের ছাত্রদের কতটুকু বাংলা অক্ষরজ্ঞান অথবা অঙ্ক শেখাতেন, তাতে সন্দেহ আছে। খুব সম্ভবত, মক্তবে মুসলমান ছাত্রদের বাংলায় লেখাপড়ার জ্ঞান খুবই কমই হত। কারণ, ঐ সময়ের বিভিন্ন মুসলিম জীবনীকারদের, যেমন মীর মশাররফ (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম), আবুল মনসুর আহমেদকে (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম) বাংলা শেখার জন্য পাঠশালায় ভর্তি হতে হয়েছিল।[৩] তবে বাংলা শিক্ষা অথবা ফার্সী-আরবী শিক্ষা, যাই হউক, সামান্য পরিমাণে যে ঐ মক্তবগুলিতে হতো, তা বলা যায়। প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট A.W.B. Power তার ১৮৭২ খ্রিঃ সনের রিপোর্টে এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দিয়েছেন— ".... while a few of the inhabitants of the plains on the border received instruction from village muktabs.[৪]" তবে ফার্সী-আরবী ভাষার উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র কোন মাদ্রাসা ঐ সময়ে ছিল কি.না, তা জানা যায় না।

১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দ সনের রিপোর্টে রাজধানী আগরতলায় একটি মক্তব প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়— "A muktab for instruction in Persian has also been established at Agartala. At present this institution does not derive any support from the state, and it is maintained at the expense of the Rajah's family

tutor.[৫]" ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ সনের রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, মক্তবটি আরো অনেক আগে থেকেই চালু ছিল— "The school at Udaypur and the Persian muktab and Sanskrit Tole at Agartala are really old institutions revised during this year.[৬]" কিন্তু পরবর্তী কালে আগরতলার এই ফার্সী মক্তবটির কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩১৭ ত্রিং (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে— "In addition to these special schools there was a madrasah for Mahomedan students in Kailasahar.[৭]" পরের বছরের রিপোর্টে কৈলাসহরের এই মাদ্রাসাটি সম্পর্কে জানা যায় যে, সরকার এতে বাৎসরিক কিছু অনুদান দিতেন, বাকি খরচ স্থানীয় মানুষদের বহন করতে হতো। ঐ বছরই সোনামুড়ায় আরেকটি মাদ্রাসা খোলা হয়। এই রিপোর্টে আরো জানা যায় যে, মাদ্রাসায় বাংলা পাঠশালা পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল— "These institutions teach the Bengalee Pathsala standard also.[৮]" ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছর উদয়পুরে একটি মাদ্রাসা খোলা হয়েছে।[৯] ১৩২২ ত্রিং সনে ধর্মনগরে আরেকটি মাদ্রাসা খোলা হলেও পরবর্তী কালে সোনামুড়া ও ধর্মনগরের মাদ্রাসা দুটি যথাক্রমে সোনামুড়া এম.ই. এবং ধর্মনগর ফিডার হাইস্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। বাকি দুটি মাদ্রাসার মধ্যে একটি ১৩২৭ ত্রিং সনে বিলুপ্ত হয়, কিন্তু এই মাদ্রাসাটি কৈলাসহর অথবা উদয়পুরের মাদ্রাসার মধ্যে কোনটি তার উল্লেখ নেই। কৈলাসহরের মাদ্রাসাটি ঐ সময়ে বেঁচে থাকলে এবং বর্তমানে তার অস্তিত্ব থাকলে সেটি শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, আর উদয়পুরের মাদ্রাসাটি তখন বেঁচে গেলে এটি বর্তমানে শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে (উদয়পুরের বর্তমানে একটি মাদ্রাসা আছে)। এ বিষয়ে লেখক স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যপ্রার্থী।

পরবর্তীকালে রাজ্যে সরকারী পরিচালনায় মাদ্রাসা ও মক্তবের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সনে ৫টিতে দাঁড়িয়েছিল, যাতে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮৩[১০]। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৭২ খ্রিঃ সনের অনেক আগে থেকেই সীমান্ত অঞ্চলের সমতল অঞ্চলগুলিতে, যেমন কৈলাসহর, কমলপুর, সোনামুড়া, ধর্মনগর এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশালগড় ও উদয়পুরে বাঙালী মুসলমানদের যথেষ্ট বসতি ছিল, তাই রাজ্যের মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি এইসব অঞ্চলেই প্রথম গড়ে উঠেছিল। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে যে পাঠশালা পর্যায়ে বাংলায় পঠন-পাঠন চালু ছিল, তা ১৩১৮ ত্রিং (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টথেকে জানা যায়। তাই রাজন্য পরবর্তী সময়ে এই মাদ্রাসাগুলির মধ্যে বেশ কিছুর সাধারণ স্কুলে রূপান্তর ঘটেছিল। আগরতলার রামনগরের মাদ্রাসা স্কুলটি (বর্তমানে রামনগর হাইস্কুল) এবং কমলপুরের মাদ্রাসা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল এদের স্মৃতি বহন করে চলছে। এদের প্রাচীন ইতিহাস অতি সত্বর

উদ্ধার করা না গেলে রাজন্য ত্রিপুরায় ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস চিরকালের জন্য লোপ পেয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, পৃষ্ঠা - ১৬০
২. Survey and settlement of Chakla Roshnabad
৩. বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, পৃষ্ঠা - ১৬৬
৪. Adm Report of Political Agency, Vol - I, page - 29
৫. — do — , page - 104
৬. — do — , page - 135
৭. Tripura State Administration Report, page - 111
৯. Adm Report of Tripura State, Vol - I, page - 208
৯. — do — , page - 335
১০. Report on the Adm. of the Tripura State, page - 147

বিলোনীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় — একটি বিতর্ক

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিলোনীয়া বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তার আগে থেকেই বিলোনীয়া শহরে বালকদের জন্য পাঠশালার ব্যবস্থা থাকলেও নারীশিক্ষার সূচনার ক্ষেত্রে এই বিভাগটিকে অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়। অন্যান্য বিভাগগুলির মতই যে একই সময়ে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা গড়ে উঠেছিল, তা তৎকালীন অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকেই দেখা যায়। এই রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে, এই বিভাগে কোনো বালিকা বিদ্যালয় না থাকলেও ১৩১৩ ত্রিং সনে (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) ৩ জন, ১৩১৪ ত্রিং সনে ৫ জন, ১৩১৫ ত্রিং সনে ১১ জন, ১৩১৬ ত্রিং সনে ১০ জন, ১৩১৭ ত্রিং সনে ১৯ জন, ১৩১৮ ত্রিং সনে ২৫ জন এবং ১৩১৯ ত্রিং সনে ২৫ জন ছাত্রী বালকদের স্কুলে পড়ত। ফলে শেষ পর্যন্ত ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনে বিলোনীয়া শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় (পাঠশালা পর্যায়ের) প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে রাজ্যের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে পাঠশালা স্তরের পাঠক্রম চালু থাকলেও এদের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে উৎসাহী ছাত্রীদের অন্তত নিম্ন-বাংলা পর্যায় পর্যন্ত পড়াবার জন্য শিক্ষাবিভাগের বিশেষ অনুমতি[২] বিলোনীয়ার এই বালিকা বিদ্যালয়টিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি না অথবা ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮ খ্রিঃ) সনে বিভাগীয় কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়গুলির কয়েকটিতে পুরুষ শিক্ষকের বদলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ[৩] এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল কি না, তা রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় না। ১৩৪৭-৪৯ ত্রিং (১৯৩৭-৪০ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৩৪৮ ত্রিং সনে রাজ্যের ৯টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিই নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৪] বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুল হওয়াতে বিলোনীয়ার বালিকা বিদ্যালয়টিও যে ঐ বছরেই নিম্ন-বাংলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা বুঝা যায়। ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সন থেকে ১৩৫৪ (১৯৪৪-৪৫ খ্রিঃ) ত্রিং সনের মধ্যে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় নিম্ন-বাংলা পর্যায় থেকে মধ্য-ইংরেজী

অর্থাৎ এম. ই. স্কুলে পরিণত হয়।[৫] গুরুত্ব বিবেচনায় স্কুলটি ঐ সময়েই এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয় বলে অনুমান করা যায়।

রাজন্য ত্রিপুরায় বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা

সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা	সন (ত্রিপুরাব্দ)	ছাত্রী সংখ্যা
১৩২০(১৯১০-১১ খ্রিঃ)	২২	১৩৩৪(১৯২৪-২৫ খ্রিঃ)	২৩
১৩২১(১৯১১-১২ খ্রিঃ)	২০	১৩৩৫(১৯২৫-২৬ খ্রিঃ)	২৯
১৩২২(১৯১২-১৩ খ্রিঃ)	২৭	১৩৩৬(১৯২৬-২৭ খ্রিঃ)	১১
১৩২৩(১৯১৩-১৪ খ্রিঃ)	১৪	১৩৩৭(১৯২৭-২৮ খ্রিঃ)	১৭
১৩২৪(১৯১৪-১৫ খ্রিঃ)	২৩	১৩৩৮(১৯২৮-২৯ খ্রিঃ)	৩৬
১৩২৫(১৯১৫-১৬ খ্রিঃ)	২২	১৩৩৯(১৯২৯-৩০ খ্রিঃ)	১৯
১৩২৬(১৯১৬-১৭ খ্রিঃ)	১৪	১৩৪০(১৯৩০-৩১ খ্রিঃ)	N.A.
১৩২৭(১৯১৭-১৮ খ্রিঃ)	১৮	১৩৪১(১৯৩১-৩২ খ্রিঃ)	৩২
১৩২৮(১৯১৮-১৯ খ্রিঃ)	২৩	১৩৪২(১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ)	৪১
১৩২৯(১৯১৯-২০ খ্রিঃ)	১৫	১৩৪৩(১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ)	৪৫
১৩৩০(১৯২০-২১ খ্রিঃ)	২৩	১৩৪৪(১৯৩৪-৩৫ খ্রিঃ)	৫১
১৩৩১(১৯২১-২২ খ্রিঃ)	২৬	১৩৪৫(১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)	৪২
১৩৩২(১৯২২-২৩ খ্রিঃ)	N.A.	১৩৪৬(১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ)	৫৪
১৩৩৩(১৯২৩-২৪ খ্রিঃ)	২৭		

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

শ্রীযুক্তা তুষারকণা মজুমদারের মাধ্যমে প্রয়াতা ইরাবতী রায়ের মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখক বিলোনীয়া এম. ই. বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে ইরাবতী রায়-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। ইরাবতী রায় জানিয়েছেন— পূর্বে আমলাপাড়ায় ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত (L.V) বালিকাদের স্কুল ছিল, শিক্ষক ছিলেন গোপাল পণ্ডিত। সেখান থেকে শহরের দীঘির পাড়ে (বর্তমানে যেখানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে) স্থানান্তরিত হয়ে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো শুরু হয়। তখন প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল কৃষ্ণকুমার পাল এবং সহকারী শশীকুমার চৌধুরী। সেখান থেকে BKI-এ স্থানান্তরিত হয়, সকালবেলায় এই বালিকা বিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রীরাই পড়ত। তখন আগরতলা থেকে আগত শ্রীমতী মলিনা সেনগুপ্ত প্রথম শিক্ষয়ত্রী ছিলেন। তারপর শ্রীমতী বর্মণ (শ্রীমতী ইরাবতী রায় এই শিক্ষিকার নামটি মনে করতে পারেন নি) কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এরপর ছিলেন হেলেন দাশগুপ্তা, লীলা দত্ত। ইরাবতী রায় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় এই বিদ্যালয় এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়। তখন ইরাবতী

রায়ের পিতা শ্রীযুক্ত নীলাম্বর রায় ও অন্যান্যরা টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন। ইরাবতী রায় ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর B.K. I-এর শিক্ষকরা তাকে পড়াতেন। তিনি পরে প্রাইভেটে B. A. পাশ করেন। BKI-এ শিক্ষকতা করতেন। পরে এই এম. ই. স্কুলেও H. M. রূপে কিছুদিন পড়িয়েছেন। ১৯৫৪ সনে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম পর্যন্ত একটি প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৯ সনে এটি অধিগ্রহণের সময় এম.ই. স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীটি ঐ স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হয় বলে শ্রীযুক্তা ইরাবতী রায় জানিয়েছেন। এরপর রাজন্য বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পড়ত। পরবর্তী কালে এটি মডেল স্কুল হিসেবে চিহ্নিত হয় অথবা মডেল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায় (এ বিষয়ে শ্রীমতি ইরাবতী রায় নিশ্চিত বলতে পারেন নি)। এরপর VI, VII, VIII ক্লাস শুধু মেয়েদের জন্য খুলে মডেল স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক গার্লস স্কুল রূপে উন্নীত করা হয়। এখন তা তুলে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত চালু আছে।

শ্রীমতী ইরাবতী রায় এই স্কুলের সঙ্গে একাধারে ছাত্রী ও শিক্ষিকা হিসেবে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকায় তার প্রদত্ত তথ্যের গুরুত্ব যথেষ্ট, তাই ইরাবতী রায়ের সাক্ষাৎকারের সারাংশটুকু পুরোপুরি তুলে দেওয়া হল।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ সনে বিলোনীয়া শহরে শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে B.K. I স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী নারায়ণ সেন লিখেছেন— "তখন বিলোনীয়াতে ছেলেদের স্কুল বলতে বি. কে. আই, মেয়েদের স্কুল বলতে বর্তমান মডেল স্কুলের সামনে দীঘির পশ্চিম পাড়ে একটি M.E. স্কুল আর মজিদ মিঞার পাঠশালা ছিল।[৬]" শ্রীযুক্ত সেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বি. কে. আই-এ পড়ে ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসেন।

রাজন্য আমলের এই এম. ই. স্কুলে তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কি মেয়েদের পক্ষে বিলোনীয়ায় অন্যান্য বিভাগের মতোই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল ? এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা তুষারকণা মজুমদার (ডাঃ তাপস মজুমদারের মাতা) লিখেছেন— "শহরের কয়েক পরিবারের মেয়েরা রাজ আমলের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তারপর বি-কে-আই, ছেলেদের স্কুলের একটি রুমে বয়স্ক-শিক্ষক সর্বশ্রী যোগেশ দত্ত, মহেন্দ্র পাল আরও কয়েকজন শিক্ষক পড়াতেন। এই ছাত্রীগুলি প্রাইভেট পরীক্ষা দিত।[৭]" এক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়ত না, রাজন্য আমলের মেয়েদের এম.ই. স্কুলেই পড়ত, শ্রীযুক্তা মজুমদার স্মৃতির বিভ্রমের ফাঁদে পড়েছেন, তবে রাজ্যে অন্যান্য এম.ই. বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মত যে এখানেও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের একই ধরনের সুযোগ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রী ইরাবতী রায়ও এই স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর বি. কে. আই স্কুলের শিক্ষকরা তাকে পড়িয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে বালিকা বিদ্যালয়টি বি. কে. আই-তে স্থানান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নারায়ণ সেন লিখেছেন— "পরবর্তীকালে ১নং টিলায় বিলোনীয়া হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ার পর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জায়গায় একটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং বি. কে. আই থেকে প্রাথমিক বিভাগটি সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর Girls' M.E. স্কুলটিও দীঘির পাড় থেকে সরিয়ে বি. কে. আই-তে সকালবেলায় নিয়ে আসা হয়।" অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয়টির আর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই সময়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী ছাত্রীর বালকদের স্কুলে পড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বালিকাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে নতুন ব্যবস্থা নিতে অর্থাৎ অভিভাবকদের সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বালিকাদের প্রাইভেট কোচিং স্কুলের প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে। শ্রীমতী তুষারকণা মজুমদার এই প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে)। তিনি তার প্রবন্ধে লিখেছেন— "তখন বর্তমানে যেখানে এখন দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয় এখানেই ছন-বাঁশ দিয়ে ঘর করে ৭ম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস শুরু করেন।[৮]" ১৯৫৩ সনের শেষভাগে কোনো সরকারী শিক্ষক প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না— এই বিজ্ঞপ্তির কারণে B. K.I. স্কুলে সকালবেলায় বালিকাদের এম.ই. স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীতে ইচ্ছুক বালিকাদের পড়ানোর যে ব্যবস্থা ছিল, তা উঠে যাওয়ার ফলেই এই প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালয়টির জন্ম হয়। শ্রীমতী অনিমা ঘোষ ঐ সময়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন।[৯] বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় আরেকটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্তা তুষারকণা মজুমদার লিখেছেন যে, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলে চাকুরির সময় তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতেন।[১০] তাই মনে হয় শুরুতে ৭ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলটিতে পড়ানো হলেও পরে ষষ্ঠ শ্রেণীও খোলা হয়।

যাই হউক, শ্রীমতী ইরাবতী দেবীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, শেষ পর্যন্ত এই মাইনর (এম.ই.) গার্লস স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীটি বর্তমান বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা মিশে যায় এবং সরকার এই বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করে। তাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হউক বর্তমান বালিকা বিদ্যালয়টিতে রাজন্য আমলের বালিকাদের এম. ই. স্কুলের একটি অংশ রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, সরকারী পরিচালনায় পূর্বে এম.ই. পর্যায় পর্যন্ত বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী ধাপ হিসেবে প্রাইভেট স্কুলটি গড়ে উঠলেও (অবশ্যই সামান্য কয়েক বছরের জন্য) পরবর্তী পর্যায়ে এই স্কুলের সরকারী অধিগ্রহণের মাধ্যমে সরকারী ব্যবস্থায় রাজন্য আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষার একটি নিটোল চিত্র পাওয়া যায়। ফলতঃ বিলোনীয়ার এই দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়টিকে একশত বছরের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসের সাক্ষী বলে ধরলে কোনো অন্যায় হবে না।

নারায়ণ সেনের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বর্তমানের মডেল স্কুলটি পূর্বতন বিলোনীয়া প্রাইমারী

স্কুল। দাতব্য চিকিৎসালয়টির স্থানে বি. কে. আই-এর প্রাইমারী বিভাগটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। তাই বর্তমানে মডেল স্কুলটিও বি. কে. আই-এর মতো শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এই স্কুলে পরবর্তী কালে বালিকাদের এম.ই. স্কুলের প্রাইমারী অংশকে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) মিশিয়ে দেওয়ায় মডেল স্কুলটিকে গার্লস এম. ই. স্কুলের উত্তরাধিকারী মানা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় রাজন্য আমলের এই বালিকা বিদ্যালয়টির কথা একবারও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয় নি। যারা ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ১৯৫৪ সালে বিলোনীয়ায় মেয়েদের উচ্চতর শিক্ষার্থে অল্প সময়ের জন্য এই প্রাইভেট স্কুলটি খুলেছিলেন, তাদের সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েও বলা যায় যে, বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিকে শতবর্ষের অধিকারী বলে স্বীকৃতি না দিলে বিলোনীয়ার স্ত্রীশিক্ষার পূর্বতন ইতিহাসকেই অগ্রাহ্য করা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Administration Report of Tripura State, (Mahadeb Chakraborty), Vol - I, page - 366

২. — do —, Vol - III, page - 1058

৩. — do — , Vol - III, page - 1269

৪. — do —, Vol - IV, page - 2061

৫. Report on the Adm. of Tripura State, R. K. De, page - 146

৬. স্মরণিকা, ব্রজেন্দ্রকুমার ইন্‌স্টিটিউশন, পৃষ্ঠা - ৫৩

৭. দেশকাল, পৃষ্ঠা - ৩০৫

৮. — ঐ — , পৃষ্ঠা - ৩০৫

৯. স্মরণিকা, বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, পৃষ্ঠা - ২২

১০. — ঐ — , পৃষ্ঠা - ২৪

আরো কিছু শতবর্ষ অতিক্রমকারী বিদ্যালয়

'রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা' নামক আকর গ্রন্থটিতে বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে ১২৯৪ ত্রিং (১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ) সনে স্বাধীন ত্রিপুরার বিদ্যালয়সমূহের জন্য পাঠ্যতালিকা সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি (কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র ''ত্রিপুরা বার্তাবহ'-এ, ১৭ই ফাল্গুন, ১২৯০ সন (বাংলা) তারিখে প্রকাশিত) দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা অঞ্চলে অর্থাৎ ত্রিপুরা ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকায় সেখানে বাংলা সন চালু ছিল, ফলে বিজ্ঞপ্তিটির তারিখ তাং ২৯শে মাঘ, ১২৯০ সন বলতে বঙ্গাব্দকেই বুঝতে হবে।

পাঠ্যতালিকা সম্পর্কিত এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রথম শ্রেণী (বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণী) থেকে সপ্তম শ্রেণী (বর্তমানের ইনফ্যান্ট শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয়) পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিটির শেষাংশে মন্তব্য অংশটি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে তা হুবহু তুলে দেওয়া হল—[১]

মন্তব্য

১। এই পাঠ্যপুস্তকের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

২। শিক্ষকগণ কোনো শ্রেণীতেই ঐ সকল পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক শিক্ষা দিতে পারিবেন না।

৩। তৃতীয় শ্রেণীতে যে ঐতিহাসিক পাঠ নির্দিষ্ট আছে তাহা নিম্নলিখিত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত পুস্তকের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না। রাজধানী পুরাতন হাবেলী, আগরতলা, কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল, দুর্গাপ্রসাদ স্কুল, সোনামুড়া স্কুল, কুলুবাড়ী স্কুল।

এই বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট যে, ঐ সময়ে উপরোক্ত ছয়টি স্কুলই রাজ্যে বিশেষ স্কুল বলে

বিবেচিত হত। এদের মধ্যে আগরতলার স্কুলটি বর্তমানের উমাকান্ত একাডেমী, কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল বর্তমানের রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন বা R.K.I, সোনামুড়া স্কুলটি বর্তমানের N.C.I. কাজেই এতে উল্লিখিত অন্যান্য স্কুলগুলিও যে পরবর্তী কালে একই ভাবে বেঁচেবর্তে ছিল, তা অনুমানে খুব একটা ভুল হবে না।

রাজধানী পুরাতন হাবেলী স্কুল

পুরাতন আগরতলার স্কুলটির সম্পর্কে পরবর্তী অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে কোনো উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। স্কুলটির পর্যায়ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব না হলেও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ সনের রিপোর্টে পলিটিক্যাল এজেন্ট সি. ডবলিউ. বোল্টন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে রাজধানী নতুন হাবেলী ছেড়ে পুরাতন আগরতলায় বসবাস শুরু করার উল্লেখ করেন।[২] ফলে ঐ সময় থেকে পুরাতন আগরতলা আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত বীরচন্দ্র মাণিক্য পুরাতন আগরতলাতেই বসবাস করতে থাকেন। এই বিজ্ঞপ্তিটি ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ সনে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত, কিন্তু আমরা দেখি, আর্থিক বিশৃঙ্খলার কারণে এর আগের বছরই অর্থাৎ ১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ সনে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা সর্বনিম্নে অর্থাৎ ১৫টিতে নেমে যায়— "Thus, on the 31st March last there were working in the various parts of the state only 15 schools with 425 students, against 31 schools and 615 students of the previous year.[৩]" ঐ দুঃস্বপ্নের দিনেও স্কুলটি উল্লেখযোগ্য থাকায় পরে এর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

স্কুলটির অস্তিত্বের দ্বিতীয় পরোক্ষ প্রমাণ মেলে পুরাতন আগরতলায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার মাধ্যমে। ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে রাজ্যে যে আটটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উল্লেখ আছে, তাতে পুরাতন আগরতলায় একটি চিকিৎসালয়ের উল্লেখ আছে।[৪] তখন ঐ এলাকায় যে যথেষ্ট অধিবাসী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ বছরে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা থেকে। যেখানে রাজধানী আগরতলার চিকিৎসালয়টিতে ঐ বছরে ৮৬৬৭ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, সেখানে পুরাতন আগরতলার চিকিৎসালয়টিতে রোগীর সংখ্যা ৭,৬৩৬ জন । এই দুটি চিকিৎসালয়ের তুলনায় অন্যান্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা নগণ্য বলা যেতে পারে। পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে অন্যান্য বিভাগীয় কেন্দ্রগুলিতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে গেলেও পুরাতন আগরতলার এই চিকিৎসালয়ের গুরুত্ব খুব একটা কমে নি। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রতিটি চিকিৎসালয়ের তথ্যবাহী রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ) সনে পুরাতন আগরতলার চিকিৎসালয়টিতে ৫,২৩১

জন রোগী চিকিৎসিত হয়েছিল।[৫] ঐ বছরে ১৯টি ডিস্‌পেনসারী সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। ১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনে ফটিকরায় ও ডুম্বুর নগরে আরো দুটি ডিস্‌পেনসারি খোলায় রাজ্যে তখন ডিস্‌পেনসারির সংখ্যা ২১-এ দাঁড়ায়[৬], যা ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত বজায় থাকে।[৭] ভারতভুক্তির সময় রাজ্যে ডিসপেনসারির সংখ্যা ছিল ২৩, যার মধ্যে একটি লুপ্ত হয়ে যায়।[৮] তাই বলা যেতে পারে যে, পুরাতন আগরতলা ধারাবাহিক ভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ফলে পুরাতন আগরতলার স্কুলটির ধারাবাহিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না।

তবে স্কুলটি আদৌ এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়েছিল কি না, তা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে এম. ই. স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও স্কুলগুলি কোথায় ছিল তার উল্লেখ নেই। তবে ভারতভুক্তির পর ঐ স্কুলটি ক্রমপর্যায়ে উন্নীত হয়ে বর্তমানে "Old Agartala HS School"-এ রূপান্তরিত যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ থাকে না।

(স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ খ্রিঃ বলে সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেছে — পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

কুলবাড়ী স্কুল, সোনামুড়া

কুলুবাড়ীর স্কুলটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা জানা না গেলেও ১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজ্যের স্কুলের সংখ্যা সর্বনিম্নে নেমে এসেছিল, তখনও স্কুলটির অস্তিত্বে প্রমাণিত হয় যে, সোনামুড়ার কুলুবাড়ী অঞ্চলে তখন উল্লেখযোগ্য জনবসতি ছিল। কাজী দৌলত আহমেদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় আকবর আহমেদ লিখেছেন— "প্রত্যন্ত হলেও শতাব্দী-প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম।[৯]" কাজী দৌলত আহমেদ ত্রিপুরী ভাষায় ককবরক ব্যাকরণ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে ককবরক ভাষা-সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে নিয়েছেন। কাজী দৌলত আহমেদ কুলুবাড়ীর বাসিন্দা ছিলেন, তার জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে।[১০] দৌলত আহমেদ মহাশয় শিক্ষানুরাগী ছিলেন, সোনামুড়ার N. C. I. -এর মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার হিসেবে টাকা এবং এই উদ্দেশ্যে জমিও দান করেন (এ বিষয়ে N.C.I. বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তাই তিনি গ্রামের স্কুলটির প্রতিও যে যথেষ্ট নজর রাখতেন, তা নিঃসন্দেহ।

চরম আর্থিক দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাস মহাশয়কে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের মন্ত্রী করা হয়। ১৩০০ ত্রিং (১৮৯০-৯১ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সোনামুড়া বিভাগে ৪টি স্কুল ছিল,[১১] যার মধ্যে কুলুবাড়ীর

স্কুলটি অবশ্যই ছিল। এরপর সোনামুড়া বিভাগে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৩০৪ ত্রিং (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) সনে দেখা যায় যে, ঐ বিভাগে ৮টি স্কুল ছিল।[১২] অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ঐ সময়ে উদয়পুর বিভাগীয় অঞ্চল সোনামুড়া বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। উদয়পুর অঞ্চল যথেষ্ট অনুন্নত হওয়ায় উপ বিভাগীয় কেন্দ্র উদয়পুর ছাড়া অন্যত্র পাঠশালা থাকার সম্ভাবনা বিরল ছিল। ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনে উদয়পুর বিভাগ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরও সোনামুড়া বিভাগে ৯টি পাঠশালা ছিল।[১৩] ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে (এর পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে আর বিভাগভিত্তিক স্কুলের সংখ্যা পাওয়া যায় নি) দেখা যায় যে, ঐ বছরে সোনামুড়া বিভাগে ১৮ টি (এর মধ্যে বালিকাদের ১টি) স্কুল ছিল।[১৩ক] সোনামুড়া বিভাগে প্রথমত সীমান্ত অঞ্চলেই বেশ কিছু জনবসতি যেমন, বক্সনগর, কুলুবাড়ী, সোনামুড়া, কাঁঠালিয়া ইত্যাদি গ্রাম ছিল। এদের মধ্যে প্রায় সবগুলিতেই পুলিশ থানা বা চৌকি ছিল। শিক্ষাপ্রসারের প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্রামগুলিতেই প্রথমে স্কুল বসানো হয়। তাই কুলবাড়ীর ধারাবাহিক অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসন্দিহান হওয়া যায়। তবে রাজন্য আমলের শেষভাগে স্কুলটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য রিপোর্টগুলিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে সময়ের হাত ধরে স্কুলটি বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে এইচ এস স্কুল হিসেবে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

দুর্গাপ্রসাদ স্কুল

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ত্রিপুরাকে নিয়ে কৈলাসহর বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তকে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগে শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আগরতলায় চলে আসেন ও দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তার নামানুসারেই এই স্কুলটির নামকরণ হয় বলে লেখকের অনুমান। স্কুলটি কোথায় অবস্থিত বিজ্ঞপ্তিতে তা জানা না গেলেও কৈলাসহর যুবরাজ স্কুলটির সঙ্গে একত্রে থাকায় স্কুলটি কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে হয়। তবে স্কুলটির বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে লেখক অবহিত নন।

'রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা' নামক আকর গ্রন্থটিতে ছাত্রবৃত্তি সম্পর্কিত ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের একটি বিজ্ঞপ্তি আছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি অন্যত্র উপস্থাপিত হলেও আলোচনার সুবিধার্থে এর হুবহু প্রতিলিপি নিচে দেওয়া হল—[১৪]

আরো কিছু শতবর্ষ অতিক্রমকারী বিদ্যালয়

ক্রমিক নং	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১।	শ্রী কৈলাস চন্দ্র সেন	কৈলাসহর যুবরাজ্য স্কুল	মাইনর ছাত্রবৃত্তি	৫	তিন বৎসর
২।	শ্রী গোপাল কৃষ্ণ দে	বিলনীয়া মধ্য ইং স্কুল	উচ্চ বাঙ্গালা	৪	চারি বৎসর
৩।	শ্রী ভারত চন্দ্র দে	ঐ	ঐ	৪	ঐ
৪।	শ্রী মুকুন্দ চন্দ্র দাস	নতুন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়	ঐ	৪	ঐ
৫।	শ্রী আলী আহাম্মদ	ঐ	ঐ	৪	ঐ
৬।	শ্রী ইউসুফ আলী	সোনামুড়া মধ্য ইং স্কুল	নিম্ন বাঙ্গালা	৩	দুই বৎসর
৭।	শ্রী বদরদ্দিন	ঐ	ঐ	৩	ঐ
৮।	শ্রী মহিম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ফটিগুলী মধ্য ইং স্কুল	ঐ	৩	ঐ
৯।	শ্রী প্যারী মোহন দাস	কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল	ঐ	৩	ঐ
১০।	শ্রী ফজলে আলী	যাত্রাপুর	পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি	২	ঐ
১১।	শ্রী গিরিধারী সিংহ	গোলধারপুর	ঐ	২	ঐ
১২।	শ্রী তোবারক আলী	ফলবপুর	ঐ	২	ঐ
১৩।	শ্রী চৈতন্যরাম মালী	গোলধারপুর	ঐ	২	ঐ
১৪।	শ্রী ফজলে আলী	ঋষ্যমুখ	ঐ	২	ঐ
১৫।	শ্রী গোবিন্দচন্দ্র ত্রিপুরা	খোয়াই	ঐ	২	ঐ
১৬।	শ্রী মাং রসিদ	বড়কন্দ	ঐ	২	ঐ
১৭।	সৈয়দ আলী	যাত্রাপুর	ঐ	২	ঐ
১৮।	শ্রীমতী বিমলাবালা দেবী	তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	২	ঐ
১৯।	শ্রীমতী গিরিবঙলা	ঐ	ঐ	২	ঐ

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল বর্তমানের R.K.I, বিলোনীয়া মধ্য ইং স্কুল বর্তমানের B.K. I, নতুন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয় বর্তমানের উমাকান্ত একাডেমী, সোনামুড়া মধ্য ইং স্কুল বর্তমানের N.C.I., ফটিগুলী মধ্য ইং স্কুল বর্তমান ধর্মনগরের B.B.I., ঋষ্যমুখ স্কুল বর্তমানের ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, খোয়াই স্কুল বর্তমানের খোয়াই সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তুলসীবতী বিদ্যালয় বর্তমানের মহারানী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা

বিদ্যালয়। অবশিষ্ট স্কুলগুলির মধ্যে যাত্রাপুর সোনামুড়া বিভাগে এবং গোলধারপুর কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত। ফলবপুর স্কুলটি অথবা ফলবপুর জায়গাটি কোথায় অবস্থিত, সে সম্পর্কে এই লেখকের কোনো ধারণা নেই। বড়কন্দ খুঁজে না পাওয়া গেলেও ধর্মনগরে বড়ুয়াকান্দি নামক একটি জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বড়ুয়াকান্দি বড়কন্দ-এর পরিবর্তিত নাম হওয়াই সম্ভব।

বড়কন্দ (বড়ুয়াকান্দি ?) স্কুল, ধর্মনগর

ধর্মনগরের বড়ুয়াকান্দি অঞ্চলে দুটি স্কুল আছে— একটি বড়ুয়া-কান্দি কলোনী হাইস্কুল এবং অপরটি বড়ুয়াকান্দি নিম্নবুনিয়াদী স্কুল। হাই স্কুলটির সঙ্গে 'কলোনী' শব্দটি জুড়ে থাকায় বুঝা যায় যে, স্কুলটি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জড়িত। সামান্য দূরের নিম্ন-বুনিয়াদী স্কুলটি বাখর মিএগ্রা প্রাইমারী স্কুল নামে পরিচিত। মনে হয় এই স্কুলটি আগে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেই চালু ছিল। দেশভাগের আগে অঞ্চলটি মুসলমান প্রধান ছিল। উদ্বাস্তু হিন্দুদের জন্য সম্ভবত পুরানো স্কুলটিকেই উন্নীত করা হয়েছিল, তা স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্পষ্ট করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ফলবপুর স্কুল

এই স্কুলটি সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসীদের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসবেন, এই আশা করা ছাড়া স্কুলটির পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না।

যাত্রাপুর স্কুল, সোনামুড়া

সোনামুড়া শহর থেকে দক্ষিণে কাঁঠালিয়া, নিদয়া হয়ে একটি রাস্তা বিলোনীয়া পর্যন্ত আছে। এই রাস্তার পাশেই যাত্রাপুর একটি থানা আছে। এই যাত্রাপুর থানায় বাস্তবিকই যাত্রাপুর উচ্চ বুনিয়াদী (S.B.) বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল আছে। স্কুলের নাম যাত্রাপুর হলেও তা বিরামপুর গ্রামে অবস্থিত। খুব সম্ভবত, দেশ বিভাগের সময় বিলোনীয়ার ঋষ্যমুখ গ্রামের মতোই-এই যাত্রাপুর গ্রামের প্রায় সবটুকুই বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান)-এ পড়ে যায়। ফলে কেবলমাত্র স্কুলটিই তার অস্তিত্ব নিয়ে বিরামপুর গ্রামে চলে আসে। তবে রাজন্য আমলে যাত্রাপুর যে ঐ অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম ছিল, তার অবশেষ হিসেবে থানা ও পোস্ট অফিসটির যাত্রাপুর নাম থেকে এখনও পাওয়া যায়। বড় নারায়ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

বড় কাঁঠাল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, দক্ষিণ পাহাড়পুর হাই স্কুল এইসব স্কুলগুলির ঠিকানায় এখনও যাত্রাপুর পোস্ট অফিসের নাম আছে। দেশ বিভাগের পর যাত্রাপুর স্কুলটি তার গুরুত্ব হারানোর ফলে তার উন্নতি যথাযথ না হওয়ায় এটি শতবর্ষ পেরোলেও সিনিয়র বেসিক পর্যায়ের গন্ডী এখনও পেরোতে পারে নি।

গোলধারপুর স্কুল, কৈলাসহর

কৈলাসহর মহকুমায় গোলধারপুরে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি হাইস্কুল আছে। এই স্কুলটির নাম Guldharpur R. S. High School. এই স্কুলটিই যে ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত গোলধারপুর স্কুলটির বর্তমান সংস্করণ সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। স্কুলটির বিবর্তন সম্পর্কিত ইতিহাস এখনও ঐ এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব।

আমটীলা হাইস্কুল, ধর্মনগর

ধর্মনগর মহকুমায় আমটীলা মৌজায় বর্তমানে একটি হাইস্কুল আছে। এই বিদ্যালয়টিও শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এ প্রসঙ্গে 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর— ধর্মনগর বিভাগ' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখেছেন— "১৩১৭ ও ১৩১৮ ত্রিং সনে রাধাপুর ও আমটীলা মৌজায় পাঠশালা নিম্ন-বাঙ্গালা স্কুলে উন্নীত হয়।[১৫]" কিন্তু ১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯ - ২০ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ধর্মনগরে হাইস্কুলের খুব কাছাকাছি হওয়ায় দুটি নিম্ন-বাংলা স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়— "The decrease was due to raising of the Kamalpur L. V. School into an M.E. School and the closing of 2 L.V. Schools in Dharmanagar and 2 other L.V. schools in Kailashar which were situated too near the newly established branch H. E. School at Dharmanagar and the M. E. School at Kamalpur.[১৬]" এক্ষেত্রে ধর্মনগর শহর থেকে রাধাপুরের দূরত্ব খুবই কম, এক-দেড় কিলোমিটার মাত্র, কিন্তু আমটীলা স্কুলের দূরত্ব ৫ কিলোমিটারের মত। তাই রাধাপুরের নিম্ন-বাংলা স্কুলটি যে ১৩২৯ ত্রিং সনেই লুপ্ত হয়ে যায়, সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা থাকে না। কিন্তু আমটীলার স্কুল বি. বি. আই. স্কুলটির খুব কাছে (too near) বলা যাবে না। বর্তমানে রাধাপুরে কোনো স্কুল নেই, কিন্তু আমটীলায় হাইস্কুল আছে। এই তথ্য বর্তমান লেখক লোক মারফত জানতে পেরেছেন। তাই নিশ্চিত আমটীলায় স্কুলটি ঐ সময়ে বেঁচে গিয়েছিল এবং তা ক্রমে ক্রমে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। এর অতীতে ইতিহাস স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব।

রাগনা উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মনগর

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর "ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর— ধর্মনগর বিভাগ" গ্রন্থে লিখেছেন— "১৩২২ ত্রিং সনে রাগনা মৌজার পাঠশালাটিকেও নিম্নবাঙ্গালা স্কুলে পরিণত করিয়া আবশ্যকীয় সুবন্দোবস্ত করতঃ ভবিষ্যতে ধর্মনগরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়।[১৭]" ১৩২২ ত্রিং (১৯১২-১৩ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "As noticed above, the Pathsala of Ragna within the Dharmanagar Division was raised to a Lower Vernacular school ....[১৮]" ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ গ্রন্থটি আনুমানিক ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। তিনি ঐ সময়ে রাগনার এই স্কুলটির উন্নতি সম্পর্কে সবিশেষ আশাবাদী ছিলেন। তাই মনে হয় রাজন্য আমলের শেষভাগে স্কুলটি এম.ই. স্কুলে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর বিবরণ থেকে মনে হয়, ঐ সময়ে রাগনা অঞ্চলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল। তাই পাঠশালা হিসেবে আরো আগে থেকেই তা চালু ছিল। ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সন থেকে ১৩২২ ত্রিং (১৯১২-১৩ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত ধর্মনগর বিভাগে স্কুলের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল	সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল	সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল
১৩১২	৭	০	১৩১৩	১৩	০	১৩১৪	১৩	০
১৩১৫	১৩	১	১৩১৬	১৩	১	১৩১৭	১৩	২
১৩১৮	১৩	২	১৩১৯	১৪	১	১৩২০	১৩	১
১৩২১	১৩	১	১৩২২	১৩	১			

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

যেহেতু কোনো পাঠশালাকেই অতি দ্রুত নিম্ন বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত করার রীতি তখন ছিল না, কাজেই ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯ -১০ খ্রিঃ) সনে স্কুলের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি পেলেও তা আলোচ্য স্কুলটি হতে পারে না। তাই আমরা রাগনার এই স্কুলটির অস্তিত্ব অনায়াসে ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, কারণ, ঐ বছরেই ধর্মনগরে স্কুলের সংখ্যা ৬টি বেড়ে যায়। এর আগেও স্কুলটির অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাই স্কুলটির যে অন্তত ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনেই অস্তিত্ব ছিল তা মেনে নিতে কোনো বাধা থাকে না।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর অন্যান্য স্কুলগুলির মতোই এর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে স্কুলটি আজ বর্তমান চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিরাই এর ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস বলতে পারবেন।

রাজনগর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলোনীয়া

বিলোনীয়া মহকুমায় পশ্চিমাঞ্চলে একটি অংশ ধারালো ছোরার মত বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে ঢুকে গেছে। এই অঞ্চলেই রাজনগর অবস্থিত। এখানে পুরানো রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন এখনও আছে। সীমান্তবর্তী এই গ্রামটি বহু প্রাচীনকালের। এই গ্রামের স্কুলটি সম্পর্কে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে প্রথম জানা যায় ১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩ - ১৪ খ্রিঃ) সনে— "The model pathsala at Kashipur silk Farm and that at Rajnagar in the Bilonia Division were raised to the status of Lower Vernacular Schools. ......[১৯]" ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) থেকে ১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) পর্যন্ত সমগ্র বিলোনীয়া বিভাগে স্কুলের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ —

সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল	সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল	সন ত্রিপুরাব্দ	বালকদের স্কুল	বালিকাদের স্কুল
১৩১২	৮	০	১৩১৩	১০	০	১৩১৪	১২	০
১৩১৫	১৩	০	১৩১৬	১৩	০	১৩১৭	১৩	০
১৩১৮	১৪	০	১৩১৯	১৩	০	১৩২০	১৩	১
১৩২১	১৩	১	১৩২২	১২	১	১৩২৩	১৩	১

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

১৩১৮ ত্রিং সনে একটি স্কুল বাড়লেও তা রাজনগরের এই স্কুলটি হতে পারে না, কারণ এত তাড়াতাড়ি কোনো পাঠশালার নিম্ন-বাংলা স্কুলে পরিণত হওয়া তখন সম্ভব ছিল না। তাই অন্তত ১৩১৫ ত্রিং সনে (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ) অথবা তার আগেই এই পাঠশালাটি চালু হয় বলে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। ১৩২৩ ত্রিং সনে (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) রাজ্যে Lower Vernacular বা নিম্ন-বাংলা স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬। তাই বুঝা যায় রাজনগর অঞ্চলটি যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। অবশ্য এরপর বিদ্যালয়টি সম্পর্কে কোনো অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে আর তথ্য মেলে না। তাই স্কুলটি শেষ পর্যন্ত এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে বর্তমান লেখক সঠিক বলতে অক্ষম। তবে স্কুলটি যে প্রাচীন তা বিলোনীয়া এলাকার মানুষ জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর স্কুলটি ক্রমে ক্রমে উন্নীত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

শ্রীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, সাব্রুম

১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) সনের শ্রাবণ মাসের ২য়পক্ষে প্রকাশিত গেজেটে সর্বপ্রথম সাব্রুমের শ্রীনগর স্কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। গেজেটে শ্রীনগর মধ্য ইংরেজী স্কুলের জন্য প্রধানশিক্ষক নিযুক্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ —[২০]

A Headmaster for the Srinagar Middle English School on Rs. 15 a month. Board and Lodging free. None need apply who has not passed Entrance or Matriculation Examination of Calcutta University and acquired sufficient experience in the mode of teaching. The applications with copies of testimonials should reach the undersigned on or before the 25th August.

HEM KUMAR CHOUDHURY
Divisional Officer - Sabroom,
Tripura State
P. O. - Ramgar (Chittagong)

কোন জায়গায় পাঠশালা থেকে নিম্ন-বাংলা, নিম্ন-বাংলা থেকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হতে স্কুলের যথেষ্ট সময় লাগে। এরজন্য বৃহৎ জনবসতি, শিক্ষার চাহিদা ইত্যাদি বহু শর্ত কাজ করে। তাই সাব্রুম বিভাগের এই স্কুলটির ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এম.ই. স্কুলে পরিণত হওয়া প্রমাণ করে স্কুলটি এর অনেক আগেই চালু ছিল। উদয়পুর বিভাগ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সাব্রুম বিভাগ আলাদা হওয়ার সময় সাব্রুম বিভাগে অর্থাৎ ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনে ৩টি স্কুল ছিল। এর মধ্যে একটি অবশ্যিই বিভাগীয় কেন্দ্র সাব্রুমে, দ্বিতীয়টি শ্রীনগরে এবং তৃতীয়টি কোথায় তা জানা যায় নি। কিন্তু শ্রীনগর স্কুলের এই সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৩২৩ ত্রিং সনে সদর, সোনামুড়া,উদয়পুর, ধর্মনগর ও শ্রীনগরে মোট ৫টি এম. ই. স্কুল ছিল। কিন্তু ১৩২৫ ত্রিং (১৯১৫-১৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে একটি এম. ই. স্কুলের উচ্চ বাঙ্গালা স্কুলে নেমে যেতে দেখা যায়— "One M. E. School was converted to a H.V. School.[২১]" সদরের এম. ই. স্কুলটি ১৩৩৪ ত্রিং সনে লুপ্ত হয় এবং সোনামুড়া, উদয়পুর ও ধর্মনগরের এম. ই. স্কুলগুলি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়। তাই এটা স্পষ্ট যে শ্রীনগরের স্কুলটিই ১৩২৫ ত্রিং সনে এম. ই. স্কুল থেকে উচ্চ-বাংলা (H.V.) স্কুলে পরিণত হয়, এর কারণ রিপোর্টে উল্লেখ করা না হলেও শ্রীনগরের দুর্গমতাই এর কারণ বলে মনে হয়। ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনে বিলোনীয়ার কৃষ্ণনগরের স্কুলটি এম. ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার রাজ্যে এই একটি মাত্রই উচ্চ-বাংলা (H.V.) স্কুল থাকে।[২২]

এই স্কুলটিতে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৯।

পরবর্তী বছরগুলিতে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এরজন্য ঐ অঞ্চলের অনুন্নত পরিবেশকেই দায়ী করা হয়। ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০-২১ খ্রিঃ) সনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "The decrease in number of boys on the rolls was due to backwardness of the locality.[২৩]" কিন্তু পরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

সন (ত্রিং)	ছাত্র সংখ্যা	সন (ত্রিং)	ছাত্রসংখ্যা	সন (ত্রিং)	ছাত্রসংখ্যা	সন (ত্রিং)	ছাত্রসংখ্যা
১৩২৮	৫৯	১৩২৯	৪৬	১৩৩০	৩৩	১৩৩১	২৮
১৩৩২	৩০	১৩৩৩	৪৫	১৩৩৪	৪৩	১৩৩৫	৪৮
১৩৩৬	৫০	১৩৩৭	৬২	১৩৩৮	৭৭	১৩৩৯	৭১
১৩৪০	৭২	১৩৪১	৮০	১৩৪২	৭৭	—	—

* পরিসংখ্যানগুলি সংশ্লিষ্ট বছরের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যথেষ্ট ছাত্রসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও স্কুলটিকে ১৩৪৩ (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনে নিম্ন বাংলা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়— "...... but the school was reduced to L. V. School in the year under report.[২৪]" আমরা আগেই দেখেছি, ঐ সময়ের মধ্যেই সাব্রুম বিভাগীয় কেন্দ্রের স্কুলটি এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত রাজ্যের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে উচ্চ বাঙ্গালা স্তরটি ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছিল। যাই হউক, ঐ সময়ে সাব্রুম বিভাগে মোট ৬টি স্কুল ছিল। কিন্তু ১৩৪৫ ত্রিং (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ) সনে একটি স্কুল কমে যায়। বিভাগের একটি প্রধান স্কুল হওয়ায় এর বিলুপ্তি পরবর্তী দুইবছরেই অসম্ভব, এক্ষেত্রে বিলুপ্ত স্কুলটি পাঠশালা পর্যায়েরই হওয়ার সম্ভাবনা। তবে পরবর্তী সময়ে এর কোন সূত্র অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় না। তবে খুব সম্ভবত, রাজন্য আমলে নিম্ন বাংলা পর্যায়েই স্কুলটি বেঁচে ছিল। ভারতভুক্তির পর এর বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে পেতে স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের সহায়তা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

সাব্রুমের বাসিন্দা ও সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাখাল নাথ জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময় স্কুলটি এম.ই. পর্যায়েরই ছিল এবং তা পরে প্রথমে হাই, পরে বিবর্তিত হয়ে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। কাজেই স্কুলটি যে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মুহুরীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলোনীয়া

১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বছর বিলোনীয়ার লুংথুং-এ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৫] ঐ সময়ে সারা রাজ্যে মাত্র ১২টি চিকিৎসালয় ছিল, যার মধ্যে বিলোনীয়া বিভাগে ছিল ২টি— একটি বিভাগীয় কেন্দ্র বিলোনীয়াতে এবং অপরটি লুংথুং-এ। তাই স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে লুংথুং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই লুংথুং-এরই পরবর্তী কালে নাম হয় মুহুরীপুর। প্রাচীন অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এই লুংথুং বা মুহুরীপুরে মুহুরী নদী বেয়ে বাংলাদেশের বাঁশ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের কারবারীরা এসে থাকতেন, অর্থাৎ মুহুরীপুর বনজ সম্পদ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যার পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি এর প্রমাণ দেয়। ১৩১৬ ত্রিং (১৯০৬-০৭ খ্রিঃ) সনে সমগ্র বিলোনীয়া বিভাগে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩টি। অতএব, ঐ বিভাগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে যে একটি স্কুল ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু তাই নয়, স্কুলটির যে আরো আগেও অস্তিত্ব ছিল তা জোর দিয়েই বলা চলে। ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনে এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি বন্ধ করে দেওয়া[২৬] হলেও ১৩৪৫ ত্রিং (১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ) সনেই আবার এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি চালু করা হয়, তবে লুংথুং দাতব্য চিকিৎসালয় নামে নয়, মুহুরীপুর চেরিটেবল ডিসপেনসারী নামে।[২৭]

জনশিক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা ১৯৪৬ খ্রিঃ সনে যখন বিলোনীয়া পরিক্রমা করেন, তখন তিনি বাইখোড়া গ্রাম থেকে লুংথুং বা মুহুরীপুর যান। মুহুরীপুর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "মুহুরীপুর বিলোনীয়া বিভাগের একটি বহু পুরাণ উল্লেখযোগ্য বাজার। মুহুরীপুর বাজারের সন্নিকটবর্তী স্থানে মুহুরী নদীর কাছে কিছু বাঙালী হিন্দুদের বাসস্থান ছিল।[২৮]" এখানেই তিনি রাত কাটান। ঐ সময়ে চালু মুহুরীপুর পাঠশালাটি সম্পর্কে তিনি লিখেন— "মুহুরী নদীর পাড়ে একটি ছোট দু-চালা ঘর তাও আবার অর্ধেক বেড়া নেই একটি সরকারী পাঠশালা আছে। তাতে ক্লাশ টু পর্যন্ত পড়ান হয়।" অঘোর দেববর্মা মহাশয়ের কাছে স্থানীয় বাঙালী কৃষকরা স্কুলটির উন্নতির জন্য অনুরোধ করলে শ্রীযুক্ত দেববর্মা আগরতলায় এসে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ ব্রাউনকে দিয়ে মুহুরীপুর পাঠশালাটিকে এম. ই. স্কুলে উন্নীত করার ব্যবস্থা করেন।[২৯]

শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মার বয়ান অনুসারে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই মুহুরীপুরের স্কুলটি এম.ই. স্কুল হিসেবে চালু থাকে। ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর স্কুলটি সিনিয়র বেসিকে উন্নীত হয়। ঋষ্যমুখের প্রাচীন বাসিন্দা শ্রীযুক্ত সীতানাথ মজুমদার ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন জোলাইবাড়ী স্কুলে পড়তেন, তখন মুহুরীপুর স্কুলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যেতেন। তিনি ঐ

সময়ে স্কুলটিকে মুহুরীপুর বাজারে অবস্থিত দেখেছেন এবং তখন তা সিনিয়র বেসিক পর্যায়ে ছিল। মুহুরীপুরের ছাত্ররা অষ্টম শ্রেণী পাশ করে জোলাইবাড়ী স্কুলেই পড়ত, ফলে সীতানাথবাবুর পক্ষে স্কুলটির খোঁজখবর পাওয়া সহজ ছিল। খুব সম্ভবত ১৯৫৭-৫৯ খ্রিঃ সনের কোনো একসময় পূর্বতন শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী শশাঙ্ক বিশ্বাস এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। পরবর্তী কালে স্কুলটি প্রথমে হাই স্কুল পরে দ্বাদশ বিদ্যালয় হিসেবে বর্তমান অবস্থায় চলে আসে।

ধলেশ্বর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা

১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩-১৪ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কাশীপুরের মডেল স্কুলটি নিম্ন বাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে— "The model pathsala at Kashipur Silk Farm and that at Rajnagar in Bilonia Division was raised to the status of Lower Vernacular Schools.[৩০]" এই মডেল স্কুলটি সম্পর্কে ১৩২১ ত্রিং (১৯১১-১২ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায়— "In Kashipur farm a model school was established with sericulture and agriculture practical training curriculum along with ordinary primary syllabus.[৩১]" এই মডেল স্কুলটি ১৩২১ ত্রিং সনে নতুন করে প্রতিষ্ঠা হয় নি। এলাকায় আগে থেকেই অবস্থিত দুটি পাঠশালাকে একত্রিত করে ফার্মে এনে বসানো হয়েছে— যার কারণে কোনো অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয় নি বলে রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কাশীপুর ফার্মের তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীকে জাপান পাঠানো হয়েছে— "Jogesh Chandra Chowdhury,Superintendent of Kashipur sent to Japan in September, 1909 for studying sericulture (college of Agriculture, Imperial University, Tokyo) and expected to back in next winter after completing his course. ....[৩২]" পরের বছরের রিপোর্টেই শ্রীযুক্ত চৌধুরীর জাপান থেকে ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া যায়।[৩৩]"

কামিনীকুমার সিংহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 'আগরতলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী লিখেছেন— "এলাকাবাসীর শিক্ষার সুবিধার্থে তিনি এক কাণি ভূমি দান করেন; সেই ভূমিতে নির্মিত হয়েছে ধলেশ্বর বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস আছে। পুরাতন আগরতলা ও নতুন আগরতলার মধ্যে রেশম বাগান নামক জনপদ আছে। সেখানে যোগেশ চৌধুরীর আগ্রহে একটি ছোট বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।[৩৪]" এক্ষেত্রে এলাকাবাসী বলতে

তৎকালীন ধলেশ্বর গ্রামের কথা বলা হয়েছে। কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মনের শ্যালক নবকুমার সিংহের পুত্র ছিলেন কামিনীকুমার সিংহ। রাধাকিশোর মাণিক্য নবকুমার বাবুকে ধলেশ্বর গ্রামটি দেন। এই কামিনীকুমার সিংহ রাজ্যে দীর্ঘদিন (১৯১০-৪৬ খ্রিঃ) উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাই হউক, এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, যোগেশ চৌধুরী জাপান থেকে ফিরে আসার পরই এলাকার দুটি পাঠশালা মিলিত হয়ে কাশীপুর ফার্মের মডেল স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়।

শ্রীযুক্ত গণচৌধুরী আরো লিখেছেন— "যোগেশ চৌধুরীর অবর্তমানে বিদ্যালয়টি হতশ্রী হয়ে পড়ল এবং পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়ে রাজকুমার গোপালজিতের পুকুরপাড়ে নির্মিত হয়। গোপালজিতের বাড়িটিই বর্তমানে আশ্রম চৌমুহনীর 'রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির'। এরপর ইহা পূর্ব ধলেশ্বরস্থিত মণিপুরী নাট মন্দিরে স্থানান্তরিত হল। তারপর কামিনীবাবু নিজ বাড়ীর দক্ষিণে ও অসম-আগরতলা সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূমি দেন বিদ্যালয়টির জন্য।[৩৫]" তাই ধলেশ্বর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি যে ইতিমধ্যেই শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাকড়াবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, উদয়পুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে কাকড়াবনে একটি পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায়।[৩৬] এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আনুমানিক ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে লিখিত। একই গ্রন্থে সমগ্র উদয়পুর বিভাগে দুটি পোস্ট-অফিসের উল্লেখ আছে— যার একটি রাধাকিশোরপুরে এবং অপরটি কাকড়াবনে।[৩৭] কাকড়াবনের এই পোস্ট-অফিসটি চালু হয় ১৩১৮ ত্রিং (১৯০৮-০৯ খ্রিঃ) সনে।[৩৮] ঐ সময়ে কাকড়াবনের গুরুত্ব যে যথেষ্ট ছিল, তা বুঝা যায় অন্যান্য বিভাগীয় কেন্দ্রে পোস্ট-অফিস চালু হওয়ার আগেই (যেমন ১৩১৯ ত্রিং সনে খোয়াই ও ধর্মনগরে পোস্ট অফিস চালু হয়) কাকড়াবনে পোস্টঅফিস চালু করার তাগিদ দেখে। তাই ঐ সময়ে যে কাকড়াবনে পাঠশালা ছিল, তা যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায়। কোন বসতিতে পোস্ট-অফিস স্থাপিত হয়ে গেছে, এলাকায় বাজারও আছে (ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কাকড়াবনে বাজারের উল্লেখ করেছেন) অথচ এলাকার লোকজনের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তাই কোনো জায়গায় পোস্ট অফিসের অস্তিত্ব ঐ জায়গায় স্কুলের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। এছাড়া কাকড়াবন, সোনামুড়া ও উদয়পুরের মধ্যে যোগাযোগের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রও ছিল। ফলে কাকড়াবনের বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিও যে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তা নিশ্চিত বলা যায়।

সূত্র ঃ

১. রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃষ্ঠা - ৩৩০
২. Adm. Report of Pol. Agency, Vol-I, page - 118
৩. — do —, Vol - II, page - 131
৪. The Adm. Report of Tripura State, page - 53
৫. Adm. Report of Tripura State, Vol - IV, page - 1989.
৬. — do —, page - 2056
৭. Report on Adm. of the Tripura State, page - 139
৮. Tripura District Gazetteers, page - 348
৯. পূর্বাভাষ, শারদসংখ্যা, পৃষ্ঠা - ১৬২
১০. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ১৬২
১১. Report on the Adm. of the State of Tipperah, page - 35
১২. Report on the Adm. of the Tripura State, page - 52
১৩. Adm. Report of Tripura State, Vol-I, page - 81
১৩.ক) — do —, Vol - IV, page - 1991
১৪. রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃষ্ঠা - ৩৪৩
১৫. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর - ধর্মনগর বিভাগ, পৃষ্ঠা - ৭
১৬. Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 767
১৭. ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর — ধর্মনগর বিভাগ, পৃষ্ঠা - ৭
১৮. Adm. Report of Tripura State, Vol-II, page-477
১৯. — do —, page - 534
২০. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃষ্ঠা - ৫২
২১. Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 589
২২. Report on Adm. of the Tripura State, page - 157
২৩. Adm. Report of Tripura State, Vol-II, page - 832
২৪. — do —, Vol - IV, page - 1692
২৫. Tripura State Adm. Report, page - 56
২৬. Adm. Report of Tripura State, Vol - IV, page - 1640
২৭. — do —, page - 1861
২৮. জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা, পৃষ্ঠা - ৫৩
২৯. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ৫৪
৩০. Adm. Report of Tripura State, Vol - II, page - 534
৩১. — do —, Vol - I, page - 412
৩২. — do —, Vol - I, page - 260
৩৩. — do —, page - 324
৩৪. আগরতলার ইতিবৃত্ত, গণচৌধুরী, পৃষ্ঠা - ১০৬
৩৫. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ১০৬
৩৬. উদয়পুর বিবরণ, পৃষ্ঠা - ৯২
৩৭. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ৮৬
৩৮. Adm. Report of Tripura State, Vol - I, page - 200.

রাজন্য আমলের আরো কিছু বিদ্যালয়

আলোচিত স্কুলগুলি ছাড়াও অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে আরো অনেক স্কুলের সংখ্যাভিত্তিক চিত্র দেওয়া আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যহেতু, রিপোর্টগুলিতে আর কোনো স্কুলের নামের উল্লেখ নেই, যাদের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। কিন্তু উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়াও আরো কিছু পরোক্ষ প্রমাণ হাজির করা যায়, যার সাহায্যে আরো কিছু শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া স্কুলগুলি সম্পর্কে একটা অনুমান সম্ভব।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থ থেকে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে উদয়পুর বিভাগে দুটি তহশীল কাছারী ছিল। এদের একটি বিভাগীয় কেন্দ্র রাধাকিশোরপুরে এবং অন্যটি শালগড়া-য়। উদয়পুর বিভাগে বাজার সম্পর্কে আলোচনা কালে তিনি রাধাকিশোরপুর অর্থাৎ উদয়পুরের গোলাঘাটি বাজার এবং শালগড়া বাজার সম্পর্কে লিখেছেন, এই দুটি বাজারই ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪-০৫ খ্রিঃ) সনে স্থাপিত হয়েছিল।[১] তহশীল কাছারী রাজ্যের অর্থনৈতিক পটভূমিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই এই তহশীল কাছারীগুলি হয় ঘন বসতি অঞ্চলে গড়ে উঠে, নতুবা এই কাছারীতে কেন্দ্র করে বড় জনবসতি গড়ে উঠে। ১৩১১ ত্রিং (১৯০১-০২ খ্রিঃ) সনে সোনামুড়া বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে উদয়পুর বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৩১২ ত্রিং (১৯০২-০৩ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, তখন উদয়পুর বিভাগে মোট ৫টি স্কুল ছিল। তবে ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনে এই বিভাগে তা সর্বনিম্নে অর্থাৎ বালকদের জন্য ৩টি এবং বালিকাদের জন্য ২টি-তে দাঁড়ায়। শালগড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, ১৯০১ খ্রিঃ সনে উদয়পুর বিভাগ আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে থেকেই শালগড়ায় স্কুল ছিল এবং তা শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই বেঁচে ছিল, যা বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনের সেনসাস বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সদর বিভাগে ১১টি তহশীল কাছারী (সদর, সিমনা, মোহনপুর, বামুটিয়া, পুরাতন আগরতলা, ঈশানচন্দ্রনগর, বিশালগড়, চড়িলাম, গোলাঘাটি, কমলাসাগর ও কামথামা), খোয়াই বিভাগে ৩টি (সদর, কল্যাণপুর, আশারাম বাড়ী), কৈলাসহর বিভাগে ৪টি (সদর, ফটিকরায়, কমলপুর,

কুলাই হাওর), ধর্মনগর বিভাগে ৩টি (সদর, ব্রজেন্দ্রনগর ও কুর্ত্তি), সোনামুড়া বিভাগে ৫টি (সদর, মতিনগর, বক্সনগর, ধনপুর ও কাঁঠালিয়া), উদয়পুর বিভাগে ২টি (রাধাকিশোরপুর ও শালগড়া), অমরপুর বিভাগে ৩টি (বীরগঞ্জ, অম্পি ও দুছড়ি), বিলোনীয়া বিভাগে ৮টি (সদর, লুংথুং,মতাই, ঋষ্যমুখ, মহেশ পুষ্করিণী, রাধানগর, সিদ্ধিনগর ও পুরান রাজবাড়ি) এবং সাব্রুম বিভাগে ৬টি (সদর, আমলিঘাট, সমরেন্দ্রগঞ্জ, মনু, গোড়াকাপ্পা ও মাগরুম) অর্থাৎ রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে ৪৫টি তহশীল কাছারী ছিল। তাই ঐ সময়ে রাজ্যে ঐ স্থানগুলিতে যে অবশ্যই অন্তত পাঠশালা পর্যায়ের স্কুল ছিল তা জোর দিয়েই বলা যায়। অবশ্য এর মধ্যে আগরতলা সদর, পুরাতন আগরতলা, বিশালগড়, খোয়াই সদর, কৈলাসহর সদর, কমলপুর, ধর্মনগর সদর, সোনামুড়া সদর, রাধাকিশোরপুর (উদয়পুর), বিলোনীয়া সদর, ঋষ্যমুখ, পুরান রাজবাড়ী (রাজনগর) ও লুংথুং এবং সাব্রুম সদরের স্কুল— এদের নিশ্চিতভাবে শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুল বলে জানা গেছে। এছাড়া আমলিঘাট, মাগরুম এবং রাধানগরে ১৮৭৬-৭৭ খ্রিঃ সনের পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টে পুলিস থানার উল্লেখে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব স্থানে ঐ সময় থেকেই যথেষ্ট জনবসতি ছিল।[২] একই রিপোর্টে কাঁঠালিয়া, বক্সনগর ও মহেশ পুষ্করিণীতে Police outpost-এর উপস্থিতিতে সেইসব অঞ্চলেও জনবসতির অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। কাজেই অন্তত ঐ এলাকার স্কুলগুলিকে শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুলের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উদয়পুরের শালগড়ার স্কুলটি সম্পর্কে আলোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে, এই স্কুলটিকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাকি কাছারীভুক্ত স্থানগুলির স্কুলগুলির অস্তিত্ব অন্তত ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনে যে ছিল, তা মেনে নিতে কোনো বাধা থাকে না।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে রাধাকিশোরপুর টাউনে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং শালগড়ায় একটি পাঠশালা বাদে হদ্রা, কাকড়াবন, মির্জা ও মায়ের বাড়ীতে পাঠশালা (পৃষ্ঠা-৯২) এবং মহারানীতে একটি পাঠশালা (পৃষ্ঠা - ৭৮)-এর উল্লেখ আছে। এদের অস্তিত্বও যে কমপক্ষে ১৯২৬-২৭ খ্রিঃ সনে ছিল (ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় গ্রন্থটি ঐ সময়েই রচনা করেছিলেন), তা মেনে নিতেই হয়।

এছাড়াও এমন অন্তত একটি স্কুলের কাহিনী লেখকের জানা আছে যার ইতিহাস লোকমুখে পুরুষানুক্রমে বয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রী হরিপদ ভট্টাচার্য দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় (৯ আগস্ট, ২০০৩ খ্রিঃ) 'কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা' শীর্ষক নিবন্ধে বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টির প্রাচীন ইতিহাস সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, আনুমানিক ১৮৭০ (±১০) খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে বিদ্যানগর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত খুমল কে. পি. সিন্‌হা মহাশয়ের পিতামহীর মাতা শ্রীমতী জানকী দেবী কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যানগর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জানকী দেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণেই এই পড়াশুনার কাজ চলত।

পরে এর কাছেই শ্রীযুক্ত গোপীচাঁদ সিংহ (উকীল)-এর পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে একটি কাঁঠাল বট-এর তলায় ছন-বাঁশের তৈরি চৌচালা ঘরে পাঠদানের কাজ চলতো। জানকী দেবীর এই স্কুলটি পরবর্তী সময়ে একাধিক জায়গায় স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন-বঙ্গ পাঠশালা (সরকারী), নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় হিসেবে চালু রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শতবর্ষ অতিক্রমকারী আরো দুটি স্কুলের নাম নিশ্চিতভাবে বেরিয়ে আসে—

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	অবস্থান	অস্তিত্ব	মন্তব্য
১।	শালগড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	উদয়পুর মহকুমা	১৯০১ খ্রিঃ	আরো প্রাচীন
২।	বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	কৈলাসহর মহকুমা	১৮৭০-৭৮ খ্রিঃ	—

এছাড়া নিম্নলিখিত স্থানের স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও শতবর্ষ অতিক্রমণের সম্ভাবনা আছে—

১। আমলিঘাটের স্কুল ২। মাগরুমের স্কুল (?) ৩। রাধানগর স্কুল
৪। কাঁঠালিয়ার স্কুল ৫। বক্সনগরের স্কুল ৬। মহেশ পুষ্করিণীর স্কুল (?)

এক্ষেত্রে মহেশ পুষ্করিণী বিলোনীয়া বিভাগের কোথায় অবস্থিত তা বর্তমান লেখকের জানা নেই। মাগরুমের ক্ষেত্রেও বর্তমান লেখক নিশ্চিত নন যে, সাব্রুম মহকুমা সৃষ্টির সময়ে ঐ অঞ্চলে কোনো স্কুল ছিল, কারণ কুকীদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বিরল বসতি অঞ্চলেও পুলিশ আউট পোস্ট বসানো হত। বাকি চারটি স্কুলের ক্ষেত্রে শতবর্ষ অতিক্রমণের সম্ভাবনা যথেষ্ট জোরালো বলেই মনে হয়।

এ পর্যন্ত বর্তমান লেখক শতবর্ষ অতিক্রমকারী যেসব স্কুলের বিষয়ে পাঠকদের কাছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ তথ্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, রাজ্যে শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুলের প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় তা যথেষ্ট নগণ্য। ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০ খ্রিঃ) সনের বিভাগ ভিত্তিক স্কুলের সংখ্যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।[৩]

বিভাগ	স্কুলের সংখ্যা			বিভাগ	স্কুলের সংখ্যা		
	বালক	বালিকা	মোট		বালক	বালিকা	মোট
সদর	৫২	২	৫৪	কৈলাসহর	১৯	৩	২২
বিলোনীয়া	১৩	০	১৩	খোয়াই	৯	১	১০
সোনামুড়া	১৮	১	১৯	ধর্মনগর	১৪	১	১৫
উদয়পুর	১১	২	১৩	সর্বমোট	১৩৯	১০	১৪৯
সাব্রুম	৩	০	৩				

অর্থাৎ ঐ সময়ে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪৯টি স্কুল ছিল, তার মধ্যে সামান্য সংখ্যক বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অধিকাংশই শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, যাদের ইতিহাস আজ প্রায় অবলুপ্ত। ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯-১০খ্রিঃ) থেকে ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় যে, সদরে বালক ও বালিকাদের স্কুলের সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪৮ ও ২, কৈলাসহরে ১১ ও ৩, সোনামুড়ায় ১৮ ও ১, বিলোনীয়ায় ৯ ও ১ খোয়াই-এ ৪ ও ১, ধর্মনগরে ৮ ও ১, উদয়পুরে ৪ ও ১ এবং সাব্রুমে ৩ ও ০ অর্থাৎ সর্বমোট ১১৪টি।

পার্বত্য অঞ্চলে জুমচাষের কারণে স্থানান্তরে গমনের ফলে কিছু স্কুলের অবলুপ্তি, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর কারণে কিছু স্কুলের সাময়িক পঠন-পাঠন বন্ধ অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থায়ী অবলুপ্তি বিভিন্ন বিভাগে পাঠশালার সংখ্যার হ্রাসের একটি কারণ। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণে বাজেট খরচ কমানোর জন্য যেসব পাঠশালা শিক্ষা বিভাগের প্রত্যাশামত কাজ করে নি, তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার কারণেও রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা কম দেখানো হয়— "In view of retrenchment in the Budget, strict care was taken to stop State aid to those primary schools which did not come up to the standard laid by the Department. Hence the decrease in the number of primary schools.[৪]"[১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) Adm. report.] কাজেই ১৯০৯-১০ খ্রিঃ সনের বাকি (১৪৯-১১৪) = ৩৫টি স্কুলের সবগুলিই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা বলা যাবে না। যাই হউক, অন্তত এই ১১৪টি স্কুলের শতবর্ষ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

এবার আমরা কিছু স্কুলের আলোচনা করব, যাদের শতবর্ষ অতিক্রম না হলেও এদের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে অথবা একটা ধারণা করা গেছে —

অমরপুর স্কুল

১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) সনের শুরুতেই উদয়পুর বিভাগ থেকে আলাদা করে অমরপুর উপ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।[৫] ঐ বছরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরে সমগ্র অমরপুর বিভাগে মাত্র একটি স্কুল ছিল।[৬] স্কুলটিতে কত জন ছাত্র ছিল, তা না দেওয়া থাকলেও দৈনিক গড় উপস্থিতির গড় ১২ দেওয়া থাকায় বুঝা যায় যে, ঐ স্কুলে ১২ জনের বেশি ছাত্র ছিল। পরের বছরের পরিসংখ্যানে ঐ বিভাগে মোট স্কুলের সংখ্যা ৬ এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ৮৩ ছিল।[৭] এদের মধ্যে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ২ এবং ২ থাকায় অনুমিত হয় যে, তখনও অমরপুরে যথেষ্ট বাঙালী বসতি গড়ে উঠে নি। পরবর্তী সময়ে বিভাগের অন্যান্য স্কুলগুলি লুপ্ত হয়ে গেলেও অমরপুরের বিভাগীয় স্কুলটির লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা

ছিল না। ১৩৪১ ত্রিং (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ) সনে এই স্কুলটি বাদে সমগ্র বিভাগে আর কোনো স্কুল ছিল না। তখন ঐ স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১১ জন (বালক-৯, বালিকা-২)। এদের মধ্যে ১০ জন বাঙালী হিন্দু ও ১ জন ত্রিপুরী।[৮] ১৩৪৩ ত্রিং (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনে স্কুলটিতে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৭ জন (ছাত্র - ৩১জন, ছাত্রী - ৬), যার মধ্যে ১ জন ঠাকুর, ৫ জন ত্রিপুরী, ১৬ জন বাঙালী হিন্দু, ১২ জন রিয়াং এবং ৩ জন মুসলমান। এছাড়া, সমগ্র বিভাগে আরো দুটি প্রাইভেট স্কুল ছিল, যাতে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫ জন।[৯] ১৩৪৬ ত্রিং সনে (১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ) বিভাগভিত্তিক সর্বশেষ যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে অমরপুর উপ বিভাগে সরকারী ২টি এবং প্রাইভেট ২টি স্কুল দেখা যায়, যাতে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৮৫ এবং ২২ জন।[১০] সরকারী স্কুল দুটিতে ১৭ জন ত্রিপুরী, ১৪ জন বাঙালী হিন্দু ও ২৯ জন মুসলমান ছিল, যাতে প্রমাণিত হয় অন্তত দুটি স্থানে বাঙালীদের মোটামুটি বসতি গড়ে উঠেছিল। তবে উপ বিভাগ হেতু অমরপুর সদরের স্কুলটি সম্ভবত এম.ই. পর্যায়ের ছিল না।[১১] কিছুদিন আগে অমরপুর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠে যে, অন্তত, ১৯১৬ খ্রিঃ সনে প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুলটি গেল কোথায় ? যদি সরকারী স্কুলটি ভারতভুক্তির পর বেসরকারী উদ্যোগে হাই স্কুলে পরিণত হয়, তবে তার বয়স ৫০ বছরের অনেক বেশি। আবার যদি অমরপুরের বর্তমান স্কুলটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে হয়ে থাকে, তবে সরকারী স্কুলটি নিশ্চয়ই তখন প্রাইমারী পর্যায়ে ছিল, পরে নিশ্চয়ই তার উন্নীতকরণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ইতিহাস দেখতে হবে। কারণ অন্যান্য অঞ্চলেও রাজন্য আমলের স্কুলকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে।

কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) ত্রিং সনে খোয়াই বিভাগ থেকে কল্যাণপুর বিভাগ আলাদা করার সময় দেখা যায় যে, কল্যাণপুর বিভাগে ১টি স্কুল আছে,[১২] যা বিভাগীয় কেন্দ্র কল্যাণপুরেই অবস্থিত তাতে সন্দেহ থাকে না। স্কুলটিতে তখন ৪০ জন মণিপুরী ও ৬ জন ত্রিপুরী অর্থাৎ সর্বমোট ৪৬ জন ছাত্র ছিল। ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে বিভাগটির অবলুপ্তির সময়ে কল্যাণপুর বিভাগে ৪টি স্কুলে মোট ৭১ জন ছাত্র ছিল।[১৩] রাজন্য ত্রিপুরার ভারতভুক্তির আগে পর্যন্ত কল্যাণপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপস্থিতি প্রমাণ করে স্কুলটি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিল। পরবর্তী সময়ে স্কুলটি বিবর্তিত হয়ে যে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে, তা নিঃসন্দেহ। কল্যাণপুরে তহশীল কাছারী থাকায় স্কুলটির একটানা চালু থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

এছাড়াও পরবর্তী সময়ের কিছু স্কুলের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা গেল। ১৯২৬-২৭ খ্রিঃ সনে গেজেটে কিছু পাঠশালার অনুদান মঞ্জুরের বিজ্ঞপ্তিটি নিচে দেওয়া গেল—

পাঠশালার সাহায্য মঞ্জুর[১৪]

বিংশ ভাগ, চতুর্দ্দশ সংখ্যা

কার্ত্তিক — দ্বিতীয় পক্ষ, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ

নং ১৮৩৭ - সন ১৩৩৬ ত্রিং, তাং ২১শে কার্ত্তিক

শ্রীল শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট বাহাদুরের ১৪/৫/৩৬ ত্রিং তারিখের আদেশে বজেট বন্ধানী নতুন পাঠশালা স্থাপন হেড হইতে নিম্নোক্ত বিদ্যালয়সমূহের সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে।

শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক — শিক্ষা বিভাগ

সদর বিভাগ

১। কলই রাংখল পাঠশালা — বৈশাখ মাস হইতে মাসিক ৮৲
২। হাকর সর্ব্বং পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৭৲
৩। পাট্রাবিল পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲
৪। লেম্বুছড়া পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲
৫। খামারহাটি পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲
৬। কালিকাপুর পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲

ধর্ম্মনগর বিভাগ

৭। ইটাই সোনাপুর পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲

কৈলাসহর বিভাগ

৮। রাতাছড়া পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৮৲

সোনামুড়া বিভাগ

৯। কলমখেত পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲

সাব্রুম বিভাগ

১০। ব্রজেন্দ্রনগর পাঠশালা — আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৬৲

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যেসব স্কুলে মাসিক অনুদান ৬ টাকা সেগুলি সমতলে অবস্থিত এবং

বহাল তবিয়তে এখন উচ্চ পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পরিণত। মাসিক ৮ টাকা অনুদানের স্কুলগুলি পাবর্ত্য অঞ্চলে অবস্থিত। তাই এদের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে আর কোনো বির্তক থাকে না। ১৩৩১ (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে পার্বত্য এলাকায় দুটি পাঠশালা খোলার উল্লেখ রয়েছে— "Two special schools were started, one in Jampui hills and the other at Hrung Bhung's village for Lusai and Kuki tribes.[১৫]" একই প্রসঙ্গে গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছিল—

পাঠশালার শিক্ষক নিয়োগ

জম্পুই পর্বতবাসী কুকিরাজ শ্রীযুত দৈকুমা ও শ্রীযুত হ্রাংভুঙ্গা চিফের বাড়ীর পাঠশালার জন্য মাসিক ২০্ কুড়ি টাকা বেতনে ২ দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবে। কর্মপ্রার্থীগণ আগামী ২৫শে ভাদ্রের মধ্যে আপন আপন শিক্ষা বিষয়ক যোগ্যতা ও পূর্ব কার্যের নিদর্শনাদি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বহস্ত লিখিত আবেদন প্রেরণ করিবেন। আবেদনপত্রে বয়স লিখিত থাকা প্রয়োজন। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষাত্তীর্ণ স্থানীয় লোকের দাবি অগ্রগণ্য হইবে, ইতি, সন ১৩৩০ ত্রিং, তাং ৮ই ভাদ্র।

শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র পাল
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, কৈলাসহর বিভাগ
ত্রিপুরা স্টেট।

সূত্র ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা - ১১৩

আবার ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) সনে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কৈলাসহর ভ্রমণের সময় কৈলাসহরের স্কুলটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে উন্নীতকরণের সময় কুকী-সর্দারের ছেলেদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুলও খোলা হয়— "... the establishement of a Samanta Boarding school for the boys of the Kuki chiefs and Sardars is another instance of the interest taken by your Highness for the improvement of the hill subjects.[১৬]" জম্পুই হিলের ঐ দুটি পাঠশালা ও এই বোর্ডিং স্কুলের সম্পর্কে পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে কোনো তথ্য না থাকায় এদের পরিণতি সম্পর্কে একমাত্র স্থানীয় প্রবীণ অধিবাসীদের কাছ থেকে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

এবার আমরা এমন কতকগুলি স্কুলের উল্লেখ করব, যাদের নাম সরাসরি কোনো নথিপত্রে না থাকলেও ঐসব স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে যে, সেই সব অঞ্চলে স্কুলের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, কোনো জনবসতি অঞ্চলে যথেষ্ট লোকসংখ্যা না থাকলে অথবা

স্থানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল না হলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় না। দাতব্য চিকিৎসালয় তুলনায় বেশি ব্যয়সাধ্য হওয়ায় সেখানে আগে পাঠশালা গড়ে উঠে এবং পরে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরো কয়েকটি স্কুলের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পেতে পারি।

ফটিকরায় স্কুল, কৈলাসহর

ফটিকরায়ে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রথমে ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] ঐ বছরে ৫৮৪ জন রোগীর চিকিৎসা হয় এবং চিকিৎসালয়ের ব্যয় বাবদ ৫৫ টাকা ১১ আনা ৩ পাই খরচ হয়। রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে ২,৭০০-এর উপর উঠলেও ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনে প্রথম চার মাসে ১১৯১ জন রোগী চিকিৎসিত হওয়ার পর যে-কোনো কারণেই হউক ফটিকরায়ের এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৮] কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৩৪৭ ত্রিং (১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ) সনে আবার ফটিকরায়ে দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা হয়।[১৯] এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলে ফটিকরায়কে কেন্দ্র করে ভালই জনবসতি ছিল। তাই ফটিকরায়ের স্কুলটি যে বেশ ভালভাবেই চলছিল তা অনুমানে ভুল হয় না। দ্বিতীয়তঃ ফটিকরায়ে একটি তহশীল কাছারীও ছিল।

২০০০ খ্রিঃ সনে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় ফটিকরায়ের অতীতের শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনায় শ্রীযুক্ত নীলিমেশ পাল লিখেছেন— "১৯৪০ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার জগৎসী হাইস্কুল থেকে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মেট্রিক পাশ করে গোপেশবাবু ১৯/২০ বছর বয়সে ফটিকরায় আসেন। .... ফটিকরায় এলাকায়, শিক্ষার সুযোগ বলতে বাজারের পাশে মহারাজার আমলে স্থাপিত সরকারী পাঠশালা।[২০]" ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে পাঠশালার শিক্ষক কামিনী মজুমদারের পরিচয়। তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় পাঠশালাটিকে উন্নীত কবার লক্ষ্যে নতুন ঘর নির্মাণ করে উচ্চতর শ্রেণীতে বেসরকারী ভাবে পঠন-পাঠন শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পাঠশালাটিকে সরকারী ভাবে মধ্য ইংরেজী বা এম.ই. (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুলে উন্নীত করা হয়। তাই মনে হয়, ১৯৪০ খ্রিঃ সনে পাঠশালাটি নিম্ন-বাংলা পর্যায়ের ছিল, কারণ রাজন্য আমলে পাঠশালা থেকে সরাসরি এম.ই. স্কুলে উন্নীত করার রীতি ছিল না।

১৯৫১ সালে এই এম.ই. স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর সঙ্গে বেসরকারী ভাবে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী চালু করলেও কৈলাসহর বিভাগের তৎকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শকের অতি তৎপরতায় বেসরকারী পরিচালনায় স্কুলটির উচ্চ শ্রেণীগুলিতে সরিয়ে নিতে হয়। ফলে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টির জন্ম হয় এবং রাজন্য আমলের স্কুলটির উচ্চ পর্যায়ে

উন্নীত হওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়। এই এম. ই. স্কুলটি পরবর্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিবর্তিত হয়। শ্রীযুক্ত নীলিমেশ পাল মহাশয়ের জবানীতে জানা যায়, বর্তমান ফটিকরায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমে জঙ্গল কেটে এম. ই. স্কুলের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ঘর নির্মাণ করে তৎকালীন পাঠশালাটিতে উচ্চতর শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৫১ খ্রিঃ সনে এই স্থান থেকেই বিদ্যালয় পরিদর্শকের তাড়নায় বেসরকারী উদ্যোগকে অন্যত্র সরে গিয়ে হাইস্কুলের জন্ম দিতে হয়। ফটিকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী সুধাংশুশেখর দত্তের স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে, অন্তত ১৯৭১ খ্রিঃ সন পর্যন্ত রাজন্য ত্রিপুরার স্কুলটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় রূপে অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল।[২১] শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে আরো জানা যায়, ২০০০ খ্রিঃ সনে ফটিকরায় গাঁওসভায় একটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, একটি গার্লস স্কুল, একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ফটিকরায়ে মেয়েদের জন্য পৃথক কোনো স্কুল ছিল না। স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা কল্যাণী মিশ্রের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলটিতে প্রথম দিকে অন্তত, ১৯৬০ খ্রিঃ সন পর্যন্ত ছাত্রী প্রায় ছিল না বললেই চলে। খুব সম্ভবত,১৯৬৩/৬৪ খ্রিঃ সনে মেয়েরা প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসে।[২২] ফটিকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়টি কো-এডুকেশন স্কুল হওয়ায় শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য একটি স্কুলের দাবী ওঠে । ঐ সময়ে সরকারী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকেই মেয়েদের হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় বলে বর্তমানে লেখক নিশ্চিত। আগরতলার বিজয়কুমার, বিশালগড়ের উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলকে একইভাবে মেয়েদের হাইস্কুলে রূপান্তর হতে আমরা দেখেছি।

তাই ফটিকরায়ের গার্লস হাইস্কুলটির অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা কমপক্ষে ১৯২১ খ্রিঃ পর্যন্ত পেয়ে যাই।

মোহনপুর স্কুল, সদর

১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, মোহনপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, যাতে ২,৪৪২ জন রোগী চিকিৎসিত হয়েছিল এবং এর জন্য ৫০৪ টাকা ৯ আনা ৬ পাই খরচ হয়েছিল।[২৩] ১৩৩১ ত্রিং সনের রিপোর্টে এই চিকিৎসালয়ের উল্লেখ ছিল না, কিন্তু ১৩৩৩ ত্রিং সনে এটি স্থাপিত হয়েছিল, এমন তথ্য রিপোর্টে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় মোহনপুরে চিকিৎসালয়টি ১৩৩২ ত্রিং সনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ১৩৩২ ত্রিং সনের রিপোর্ট এখনও না পাওয়া যাওয়ায় এ সম্পর্কে নিশ্চিত বলা যায় না। ১৩৩৩ ত্রিং সনে এত রোগীর সংখ্যা প্রমাণ করে যে, মোহনপুরে তখন উল্লেখযোগ্য জনবসতি ছিল। ১৩৪১ ত্রিং সনে (১৯৩১-৩২ খ্রিঃ) মোহনপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪,৭৪৭

জন রোগী[২৪] চিকিৎসিত হওয়ার পরও পরের বছরই এই চিকিৎসালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনের সেনসাস বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় মোহনপুরে তহশীল কাছারী ছিল, অর্থাৎ মোহনপুর সদর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তাই পরবর্তী সময়েও মোহনপুরের স্কুলটির অবলুপ্তির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং, মোহনপুরের বর্তমান স্কুলটির অন্তত ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দেও অস্তিত্ব ছিল, তা নিশ্চিত বলা যায়।

বীরেন্দ্রনগর স্কুল, সদর

বীরেন্দ্রনগরে ১৩৩১ ত্রিং (১৯২১-২২ খ্রিঃ) একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ঐ বছর মাত্র ৫৪৩ জন রোগী চিকিৎসিত হয় এবং এর জন্য ৩৬৬ টাকা ৭ আনা খরচ হয়[২৫]। ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে এই চিকিৎসালয়ে ২,৪৪২ জন রোগী চিকিৎসিত[২৬] হওয়ার পর পরের বছর ধলেশ্বরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ সনে বীরেন্দ্রনগরে পার্বত্য প্রজাদের জন্য একটি মডেল ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে কাশীপুরে একটি রেশম চাষ সহ ফার্ম খোলায় বীরেন্দ্রনগর ফার্মের গুরুত্ব হ্রাস পায়, তবুও বীরেন্দ্রনগর ফার্মের শিক্ষার্থীদের জন্য এর সৃষ্টির লগ্ন থেকেই একটি পাঠশালা গোছের স্কুলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোনো তথ্য আমাদের হাতে না থাকায় বীবেন্দ্রনগরের স্কুলের অস্তিত্ব অন্তত ১৯২১ খ্রিঃ সন পর্যন্ত পেতে পারি। জিরানীয়ায় অবস্থিত বীরেন্দ্রনগর স্কুলটিই খুব সম্ভবত ঐ স্কুলের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

কুলাই স্কুল

১৩৩৯ ত্রিং (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ) সনের ২১ শে মাঘ কুলাই হাওরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়, যাতে ঐ বছরের শেষ দুই মাসাধিক কালে ৬৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়।[২৭] ১৩৪০ ত্রিং সনের সেন্সাস বিবরণীতে দেখা যায় ঐ সময়ে কুলাই-এ একটি তহশীল কাছারী ছিল। পরবর্তী সময়ে রাজন্য আমলের শেষ পর্যন্ত এই চিকিৎসালয় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু ছিল। তাই অনুমানে অসুবিধা হয় না যে, অন্তত ১৯২৯ খ্রিঃ সনেও কুলাই-এর বর্তমান স্কুলটির অস্তিত্ব ছিল। খুব সম্ভবত বর্তমান কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিই ঐ স্কুলের পরিবর্তিত রূপ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. উদয়পুর বিবরণ, পৃষ্ঠা - ৭৮
২. Adm. Report of Pol. Agency, Vol - I, page - 112
৩. Adm. Report of Tripura State, (I), page - 302
৪. — do —, Vol - III, page - 1054
৫. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা - ৭০
৬. Adm. Report of Tripura State, Vol-II, page - 677
৭. — do —, Vol - II, page - 739
৮. — do —, Vol - III, page - 1537
৯. — do —, Vol - IV, page - 1727
১০. — do —, Vol - IV, page - 1991
১১. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা - ২০৮
১২. Adm. Report of Tripura State (II), page - 677
১৩. —do—, page - 1027
১৪. ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, পৃষ্ঠা - ১৯১
১৫. Adm. Report of Tripura State, (II), page - 896
১৬. — do —, Vol - I, page - 107
১৭. — do —, Vol - II, page - 924
১৮. — do —, Vol - IV, page - 1640
১৯. — do —, Vol - IV, page - 2056
২০. স্মরণিকা, ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, পৃ - ৪২
২১. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ২২
২২. — ঐ —, পৃষ্ঠা - ৪১
২৩. Adm.Report of Tripura State, (III), page - 1024
২৪. — do —, Vol - IV, page - 1640
২৫. — do —, Vol - II, page - 924
২৬. — do —, Vol - III, page - 1024
২৭. — do —, Vol - III, page - 1456.

উপসংহার

এ পর্যন্ত ত্রিপুরার যে সকল স্কুল শতবর্ষ অতিক্রম করেছে পাঠকদের সুবিধার্থে নীচে যথাসম্ভব ক্রমানুসারে সাজানো হল —

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	অবস্থান	নিশ্চিত প্রমাণ (খ্রিঃ)	জোরালো সম্ভাবনা
১।	উমাকান্ত একাডেমী	আগরতলা	১৮৬৩	বহু প্রাচীন
২।	রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (RKI)	কৈলাসহর	১৮৭২	
৩।	গোলধারপুর R.S. হাই স্কুল	কৈলাসহর মহকুমা	১৮৭২	আরো প্রাচীন
৪।	নবদ্বীপচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন (NCI)	সোনামুড়া	১৮৭৫	
৫।	বোধজং বয়েজ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	আগরতলা	১৮৭৫	
৬।	আমলিঘাট স্কুল	সাব্রুম মহকুমা	১৮৭৫	
৭।	বিশালগড় টাউন গার্লস হাই স্কুল	বিশালগড়	১৮৭৬	
৮।	পুরাতন আগরতলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল	পুরাতন আগরতলা	১৮৭৬	আরো প্রাচীন
৯।	কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (KBI)	উদয়পুর	১৮৭৭	আরো প্রাচীন
১০।	বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	কৈলাসহর মহকুমা	আনু. ১৮৭০-৭৮ খ্রিঃ	
১১।	ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (BKI)	বিলোনীয়া	১৮৮২	আরো প্রাচীন
১২।	কুলুবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল	সোনামুড়া মহকুমা	১৮৮৩	আরো প্রাচীন
১৩।	বিজয়কুমার দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	আগরতলা	১৮৯২	
১৪।	কমলপুর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	কমলপুর	১৮৯৪ খ্রিঃ	১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ
১৫।	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	খোয়াই	১৮৯৪	

১৬।	মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	আগরতলা	১৮৯৪	
১৭।	বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (BBI)	ধর্মনগর	১৮৯৬	১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ
১৮।	কৈলাসহর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	কৈলাসহর	১৮৯৭	সম্ভবতঃ আরো প্রাচীন
১৯।	দুর্গাপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	বিশালগড় মহকুমা	১৮৯৮	
২০।	শালগড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	উদয়পুর মহকুমা	১৯০১	আরো প্রাচীন
২১।	ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	বিলোনীয়া মহকুমা	১৯০২	আরো প্রাচীন
২২।	যাত্রাপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	সোনামুড়া মহকুমা	১৯০২	আরো প্রাচীন
২৩।	বড়কন্দ (বড়ুয়াকান্দি ?) স্কুল	ধর্মনগর মহকুমা	১৯০২	আরো প্রাচীন
২৪।	সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	সোনামুড়া	১৯০৩	
২৫।	আমটীলা হাই স্কুল	ধর্মনগর মহকুমা	১৯০৩	সম্ভবত আরো প্রাচীন
২৬।	রাগনা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	১৯০৩	ঐ
২৭।	কৃষ্ণনগর হাই স্কুল	বিলোনীয়া মহকুমা	১৯০৪	আরো প্রাচীন
২৮।	ধর্মনগর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	ধর্মনগর	১৯০৫	
২৯।	রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	বিলোনীয়া মহকুমা	১৯০৫	আরো প্রাচীন
৩০।	মুহুরীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	ঐ	১৯০৬	ঐ
৩১।	খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	খোয়াই	১৯০৭	

৩২।	কাকড়াবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	উদয়পুর মহকুমা	১৯০৮	ঐ
৩৩।	সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	সাব্রুম	১৯০৯	ঐ
৩৪।	শ্রীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	সাব্রুম মহকুমা	১৯০৯	ঐ
৩৫।	উদয়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়	উদয়পুর	১৯০৯	
৩৬।	বিলোনীয়া দ্বাদশ বালিকা শ্রেণী বিদ্যালয়	বিলোনীয়া	১৯১০	
৩৭।	তারিণীসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়	সোনামুড়া মহকুমা	১৯১০	
৩৮।	ধলেশ্বর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	আগরতলা	১৯১১	আরো প্রাচীন বলে প্রমাণিত

এছাড়া নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ অতিক্রমণের গৌরব লাভকরেছে, সেগুলি হল —

৩৯।	সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়	আগরতলা	১৮৯৯	আরো প্রাচীন
৪০।	কৈলাসহর /উদয়পুর মাদ্রাসা (যে-কোনো একটি)	কৈলাসহর/ উদয়পুর	১৯০৭/১০	আরো প্রাচীন

যে সব স্কুলের শতবর্ষ অতিক্রমণের যথেষ্ট জোরালো সম্ভাবনা বর্তমান, তাদের নাম নিচে উল্লেখ করা গেল—

৪১।	রাধানগর হাই স্কুল	বিলোনীয়া মহকুমা	১৯৩০	শতবর্ষ প্রাচীন
৪২।	কাঠালিয়া স্কুল (দ্বাদশ)	সোনামুড়া মহকুমা	১৯৩০	ঐ
৪৩।	বক্সনগর স্কুল (দ্বাদশ)	ঐ	১৯৩০	ঐ

* ১৮৭৫-৭৬ সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে আমলিঘাট স্কুলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "The Pathsala at Amlighata, on the river Fenny, was open by the Dewan in December last when visiting the locality." (Adm. Report of the Pol. Agency, Hill Tipperah, Vol-I, page - 79). রাজন্য আমলে আমলিঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়ায় এই পাঠশালাটির অস্তিত্ব কোনো সংকটে পড়ার কথা নয়। তাই

স্কুলটি যে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিছুদিন পূর্বেও স্কুলটি সিনিয়র বেসিক পর্যায়ের ছিল বলে লেখক জানেন।

শতবর্ষ পূরণ হয়নি এমন সব স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালের নিশ্চিত প্রমাণ নিচে দেওয়া গেল :

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	অবস্থান (মহকুমা)	নিশ্চিত প্রমাণ (খ্রিঃ)	জোরালো সম্ভাবনা
১।	অমরপুর স্কুল	অমরপুর	১৯১৬	
২।	কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	খোয়াই	১৯১৬	আরো প্রাচীন
৩।	কুকিরাজ শ্রীযুক্ত দৈ কুমার-এর বাড়ীর পাঠশালা (বর্তমানের পরিণতি লেখকের অজ্ঞাত)	জম্পুই হিল, ধর্মনগর	১৯২০	
৪।	শ্রীযুত হ্লাংভুঙ্গা গ্রামের চিফের বাড়ীর পাঠশালা	ঐ	১৯২০	
৫।	ফটিকরায় গার্লস স্কুল	কৈলাসহর	১৯২০	আরো প্রাচীন
৬।	বীরেন্দ্রনগর স্কুল (বর্তমানে দ্বাদশ)	সদর	১৯২১	ঐ
৭।	মোহনপুর স্কুল (ঐ)	সদর	১৯২৩	ঐ
৮।	কলই রাংখল স্কুল	সদর	১৯২৬	
৯।	হাকর সর্ব্বং স্কুল	সদর	১৯২৬	
১০।	পাট্রাবিল স্কুল	সদর (রাজন্য)	১৯২৬	
১১।	লেম্বুছড়া স্কুল (বর্তমানে হাইস্কুল)	সদর	১৯২৬	
১২।	খামারহাটি স্কুল	সদর (রাজন্য)	১৯২৬	
১৩।	কালিকাপুর স্কুল	ঐ	১৯২৬	
১৪।	ইটাই সোনাপুর স্কুল	ধর্মনগর	১৯২৬	
১৫।	রাতাছড়া স্কুল	কৈলাসহর	১৯২৬	
১৬।	কলমখেত স্কুল	সোনামুড়া	১৯২৬	
১৭।	ব্রজেন্দ্রনগর পাঠশালা	সাব্রুম	১৯২৬	
১৮।	হদ্রা স্কুল	উদয়পুর	১৯২৬	আরো প্রাচীন
১৯।	মির্জা স্কুল	ঐ	১৯২৬	ঐ

২০।	মায়ের বাড়ী স্কুল	ঐ	১৯২৬	ঐ
২১।	মহারানী স্কুল	ঐ	১৯২৬	ঐ
২২।	কুলাই স্কুল	কৈলাসহর	১৯২৯	ঐ

শুধুমাত্র তহশীল অফিসের জন্যই ঐ স্থানে পাঠশালার অস্তিত্বের প্রমাণ ধরে নেওয়ার চেয়ে এর সঙ্গে জনবসতি সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য পাওয়া গেলে পাঠশালার প্রমাণ নিশ্চিত হয়। 'সেনসাস বিবরণী' গ্রন্থে দেখা যায় যে, ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১ খ্রিঃ) সনে রাজ্যে অন্তত ৯৩টি হাট-বাজার ছিল (পৃষ্ঠা- ১০৫)। তাই এটা নিশ্চিত যে, ঐ সব বাজার এলাকায় জনবসতি ছিল। তহশীল অফিস ও বাজার উভয়ই আছে, এমন স্থানে পাঠশালা নিশ্চিত থাকবে তা ধরে নেওয়া যায়। এমন সব স্কুলের নাম নিচে দেওয়া হল ঃ

২৩।	সিমনা স্কুল	সদর	১৯৩০	আরো প্রাচীন
২৪।	বামুটিয়া স্কুল	সদর	১৯৩০	ঐ
২৫।	ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল	সদর (রাজন্য)	১৯৩০	ঐ
২৬।	গোলাঘাটি স্কুল	ঐ	১৯৩০	ঐ
২৭।	কুর্তি স্কুল	ধর্মনগর	১৯৩০	ঐ
২৮।	অম্পি স্কুল	অমরপুর	১৯৩০	ঐ
২৯।	মতাই স্কুল	বিলোনীয়া	১৯৩০	আরো প্রাচীন
৩০।	সমরেন্দ্রগঞ্জ স্কুল	সাব্রুম	১৯৩০	ঐ
৩১।	মনু (বাজার) স্কুল	ঐ	১৯৩০	ঐ

সেনসাস বিবরণীতে হাট-বাজার প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে— "তম্মধ্যে নতুন হাবেলী, রানীরবাজার এবং বিশালগড় রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র "(পৃষ্ঠা - ১০৫)। তাই এটা নিশ্চিত যে, রানীরবাজারে অবশ্যই ঐ সময়ে স্কুল ছিল। বর্তমানে রানীর বাজারে যে প্রাইভেট স্কুলটি আছে, সেটি এই স্কুল নয়, সরকারী স্কুলটিই সেই স্কুল বলে লেখক নিশ্চিত।

৩২।	রানীরবাজার স্কুল	সদর	১৯৩০	আরো প্রাচীন

উপরে উল্লিখিত স্থানগুলি ছাড়াও সদরে জিরানীয়া, কাঞ্চনমালা, হরিশনগর চা-বাগান, সেখেরকোট, লালসিংমুড়া, সিধাই, লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান, দেবেন্দ্রনগর, ফটিকছড়া, নরসিংগড়, কালাছড়া, মনতলা, মেখলীবাঁধ (অর্থাৎ মেখলীবন্ধ), ব্রহ্মাকুন্ড ও কৃষ্ণপুর এই ১৫টি অঞ্চলে

হাট-বাজার, কৈলাসহর বিভাগে বীরচন্দ্রনগর দুর্গাপুর, ধুমাছড়া, রাঙ্গাউটি, হীরাছড়া চা বাগান, দেবস্থল চা বাগান, জগন্নাথপুর, গোলকপুর, হালাইছড়া, কালীশাসন, রাংরুংছড়া, মনু ভ্যালী চা বাগান, সমরুছড়া, হালাহালি, ছেলেমা (সালেমা) অর্থাৎ ১৪টি হাটবাজার, সোনামুড়া বিভাগে ওটামুড়া, মেলাঘর, পচারমার ঘাট, চৌমুনী, পোয়াংবাড়ি, নলছোড় (নলছর), রাজধরনগর, নিদয়া— এই ৮টি হাটবাজার, বিলোনীয়া বিভাগে অভয়া বীটের বাজার, লাউগাঙ, কলসী ও তৈমুক্তি অর্থাৎ ৪টি বাজার, খোয়াইয়ে মাতা মহারানীর বাজার, খোয়াই চা বাগান, বেলছড়া, সোনাতলা, তেলিয়ামুড়া, উদনা— এই ৬টি হাট-বাজার, ধর্মনগর বিভাগে উপ্তাখালী, তিলথৈ, রৌয়া, কামিল মামুদ, কালাছড়া অর্থাৎ ৫টি হাট-বাজার, উদয়পুর বিভাগে আমতলী, লোলঙ্গা, জামজুরী, পিত্রা— এই ৪টি হাট-বাজার, সাব্রুম বিভাগে ছোট খিলে ১টি বাজার এবং অমরপুরে রাধাকিশোরগঞ্জ (নতুন বাজার)-এ ১টি বাজারের উল্লেখ সেনসাস বিবরণীতে দেখা যায়— এই ৫৮টি হাট-বাজার এলাকায় প্রায় সবগুলিতেই পাঠশালা যে ছিল, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

এছাড়া সদর বিভাগে চড়িলাম, কমলাসাগর ও কামথানা এই তিনটি তহশীল কেন্দ্রে, খোয়াই বিভাগে আশারামবাড়ী তহশীল কেন্দ্রে, ধর্মনগর বিভাগের ব্রজেন্দ্রনগর তহশীল কেন্দ্রে, সোনামুড়া বিভাগের মতিনগর ও ধনপুর তহশীল কেন্দ্রে, বিলোনীয়া বিভাগের সিদ্ধিনগর তহশীল কেন্দ্রে, সাব্রুম বিভাগের গোড়াকাপ্পা ও মাগরুম তহশীল কেন্দ্রেও যে স্কুল ছিল, তা যথেষ্ট সর্তক হয়েও বলা যায়।

তাই এই ৬৮ স্থানে স্কুলের অস্তিত্ব ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছিল তা ধরে নেওয়া যায়।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমল থেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাইভেট স্কুল ছিল। সরকারী অনুদান পেতে সমর্থ হলে তা সরকারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হতো। কখনও কখনও স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী অসন্তুষ্টির কারণে কিছু কিছু স্কুলের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হতো। ফলে সরকারী আয়ত্তাধীনে স্কুলের সংখ্যা হঠাৎ হ্রাস পেতো। যেমন ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে রাজ্যে মোট স্কুলের সংখ্যা ১৭১ থেকে ১৩৮-এ দাঁড়ায়। কারণ হিসেবে বলা হয়— "In view of the retrenchment in the Budget, strict care was taken to stop State aid to those primary schools which did not come upto the standard laid down by the Department. Hence the decrease in the number of schools (page - 1056. Adm. Report of Tripura state, edited by Mahadeb Chakraborty, Vol-III). এই ঘটনা একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, অন্যান্য বছরগুলিতেও এই ধরনের উদাহরণ দেখা যায়। এছাড়াও সরকারী অনুমোদন ছাড়া কিছু প্রাইভেট স্কুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৩৫২ ত্রিং (১৯৪২-৪৩ খ্রিঃ) সনে রাজ্যে ৩৭টি প্রাইভেট স্কুল ছিল (page - 2133, Adm. Report of Tripura State, Vol-IV,)। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জনশিক্ষা আন্দোলনের

পুরোধা শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা মহাশয় তাঁর 'জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা' গ্রন্থে বিলোনীয়া বিভাগে রেদাগা, লক্ষ্মীছাড়া এবং বাইখোড়া গ্রামে প্রাইভেট স্কুল দেখেছেন, এদের মধ্যে বাইখোড়ার স্কুলটি বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। এছাড়া উদয়পুর বিভাগে নোয়াপাড়ায় গ্রামবাসীদের নিজেদের উদ্যোগে একটি প্রাইভেট স্কুলের উল্লেখও তিনি করেছেন। স্কুলগুলিকে জনশিক্ষা সমিতির স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

পার্বত্য অঞ্চলে স্কুলের স্বল্পতার আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা সদর বিভাগে দক্ষিণাংশে সুতারমুড়া, ধারিয়াথল ও বড়জলা চন্ডীঠাকুর বাড়ীতে সরকারী পাঠশালার কথা বলেছেন। তাই এই স্কুলগুলির অস্তিত্ব যে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগেই ছিল, তা নিশ্চিত করা যায়।

জনশিক্ষা আন্দোলনের ফল হিসেবে রাজ্যে অতিরিক্ত যে ৪৫০টি স্কুলের সংস্থান হয়, সেগুলির পুরো তালিকা জোগাড় করা সম্ভব না হলেও শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা বিলোনীয়া বিভাগের বগাফা, উদয়পুর বিভাগে পিত্রার দেওয়ানবাড়ী ও তৈরূপায়, জলেমা, বাগমা, সিলঘাট, মহারানী গ্রামে, সদর বিভাগে গুলি রায় কবড়াপাড়া, অমরেন্দ্রনগর, হীরাপুর, প্রমোদনগর, উজান ঘনিয়ামারা, পাইল্যাভাঙ্গা, টাকারজলা ও নারায়ণ খামার গ্রামে স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই এগুলির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বলে মেনে নিতেই হয়।

ফটিকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ত্রিপুরার একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, চল্লিশের দশকের প্রথমভাগে লংতরাই ভ্যালীতে দুটি সরকারী স্কুলের একটি ছিল ধূমাছড়ায় এবং একটি ছাও-মনুতে। সম্ভবতঃ ধূমাছড়ার ঐ স্কুলটি নিম্ন-বাংলা পর্যায়ের ছিল, কারণ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঐ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন।

এই ধূমাছড়ায় বাজার থাকায় আমরা ইতিপূর্বেই ১৯৩০ ইং সনে স্কুলের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করেছিলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে সময়ের কথা বলেছেন তা মোটামুটি ভাবে ১৯৪০ খ্রিঃ বা তার আগের কথা। তাই এক্ষেত্রে আমাদের অনুমানের যথার্থতাই প্রমাণ হয়। তবে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহাশয় ছাও-মনুতে একটি স্কুলের উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের আলোচনায় আসে নি। এছাড়া তিনি ময়নামায় চাকমা পাড়ায়-শ্রীযুক্ত মাধব চাকমার দ্বারা পরিচালিত একটি প্রাইভেট স্কুলেরও উল্লেখ করেছেন (পৃ-১৭, সুর্বণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়)।

রাজন্য আমলের হাই স্কুলগুলি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর দ্বিখন্ডিত হয়ে প্রাইমারী অংশটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এই অংশটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন আগরতলার উমাকান্ত একাডেমী, তুলসীবতীতে সকালবেলায় বসে। কিন্তু আগরতলার বোধজং, বিলোনীয়ার বি. কে. আই, কৈলাসহরের আর. কে. আই. ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাইমারী

অংশটি আলাদা স্থানে নতুন নামে বর্তমানে চালু আছে— যেমন, বোধজং স্কুলের প্রাইমারী অংশটি বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ে, বি. কে. আই.-এর প্রাইমারী অংশটি বিলোনীয়া মডেল স্কুল এবং কৈলাসহরের আর. কে. আই স্কুলের প্রাইমারী অংশটি কৈলাসহর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে চালু আছে। কৈলাসহর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে ২০০২ ইং সনের ৮ই এপ্রিল দৈনিক সংবাদে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আর. কে. আই-এর প্রাথমিক অংশটি বর্তমান আর. কে. আই-এর চৌহদ্দিতে একসময়ে থাকলেও পরে কাজির গাঁও-এর বাসিন্দা নরেন্দ্র দাসের দান করা জমিতে স্থানান্তরিত হয়। প্রতিবেদনে স্কুলটির দৈন্যদশার কথাও বলা হয়েছে।

বিলোনীয়ার বি. কে. আই-এর শতবর্ষ স্মরণিকায় বিলোনীয়ার প্রাচীন বাসিন্দা শ্রী নারায়ণ সেন-এর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, রাজন্য আমলের দাতব্য চিকিৎসালয়টি ১নং টিলায় হাসপাতাল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জায়গায় বি. কে. আই-এর প্রাথমিক বিভাগটি সরিয়ে একটি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু করা হয়। পরে একে মডেল স্কুল নামে অভিহিত করা হয়।

এখন যে প্রশ্নটি উঠে আসে, তাহলে এই স্কুলগুলির বয়স কত ধরা হবে ? দ্বি-খন্ডিত হলেও এদের পৃথক পৃথক সত্তার জন্য এই স্কুলগুলির বয়সও মূল স্কুলের বয়সের সমান বলে ধরতে হয়। ফলে রাজন্য আমলে যতগুলি হাইস্কুল ছিল, তাদের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই প্রাইমারী অংশটিরও শতবর্ষ পালন করতে হয়।

রাজন্য আমলের এম. ই. (মধ্য ইংরেজী) স্কুলগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতভুক্তির পর ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়ে হাই অথবা হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পরিণত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। যেমন আগরতলার বিজয়কুমার এম. ই. স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় প্রাথমিক অংশটি আলাদা হয়ে বিজয়কুমার জুনিয়র বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়। কৈলাসহরের এম. ই. বালিকা বিদ্যালয়টি ভারতভুক্তির পর প্রথমে জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়। পরে হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় এর প্রাথমিক অংশটি বর্তমানে মডেল স্কুল হিসেবে চালু আছে, এসব আমরা আগেই আলোচনা করেছি। প্রতিটি মহকুমার মডেল স্কুলগুলি প্রকৃতপক্ষে হাই স্কুল অথবা এম.ই. স্কুলের প্রাইমারী অংশ, যেমন সোনামুড়ার মডেল স্কুলটি এন. সি. আই-এর প্রাইমারী অংশ ইত্যাদি। রাজন্য আমলের অনেক স্কুলের ক্ষেত্রেই এই ধরনের দ্বিখন্ডিতকরণ হয়েছে, এদের ইতিহাস এখনও পুনরুদ্ধার সম্ভব। রাজন্য আমলের স্কুলগুলির ইতিহাস ভারতভুক্তির পর শিক্ষা সম্প্রসারণ কালে উপযুক্ত যত্ন সহযোগে রক্ষা করা হয় নি, যথেচ্ছভাবে স্কুলগুলিকে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। যেমন, বিশালগড়ে রাজন্য আমলের ছেলেদের এম.ই. স্কুল বর্তমান বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলার ছেলেদের বিজয়কুমার এম. ই. বর্তমানে বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি। সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে বিলোনীয়ার শত বৎসরের বালিকা

বিদ্যালয়টির, যা এম. ই. বালিকা বিদ্যালয় থেকে ভারতভুক্তির পর আজ বলা যেতে পারে বাস্তবে অস্তিত্বহীন। এর ষষ্ঠ শ্রেণীটি বর্তমান বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ে এবং প্রাইমারী অংশটুকু মডেল স্কুলে মিশে গেছে।

শতবর্ষের স্কুলগুলির ইতিহাস থেকে যাত্রা শুরু করে রাজন্য আমলের অন্তত ১৯৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত বেশ কিছু স্কুলের অস্তিত্বের আলোচনায় এসে আমরা এই পরিক্রমার অন্তে এসে পৌঁছেছি। এক্ষেত্রে যেমন রাজন্য আমলের আরো অনেক স্কুলের খোঁজ পাওয়া যায় নি, তেমনি ঐ সময়ের কয়েকটি স্কুলের বর্তমান ঠিকানা লেখকের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি, যেমন— ফলবপুর স্কুল, মহেশ পুষ্করিণীর স্কুল। এই অসম্পূর্ণ আলোচনায় ৪০টি স্কুলের শতবর্ষ অতিক্রমণের নিশ্চিত প্রমাণ, ৩টি স্কুলের শতবর্ষ অতিক্রমণের জোরালো সম্ভাবনা, ৩২টি স্কুলের নিশ্চিত অস্তিত্বের সময়কাল, ৬৮টি স্কুলের অস্তিত্বের সময়কাল সম্পর্কে জোরালো পরোক্ষ প্রমাণ, শ্রী অঘোর দেববর্মা-প্রদত্ত ৪টি প্রাইভেট স্কুলের অস্তিত্বের সময়কাল, ৩টি সরকারী স্কুলের অস্তিত্বের সময়কাল এবং জনশিক্ষা সমিতি পরিচালিত আরো ১৫টি স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা প্রদত্ত একটি সরকারী ও ১টি প্রাইভেট স্কুলের অস্তিত্বের সময়কাল অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ১৬৭টি স্কুলের উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

ত্রিপুরার রাজন্য আমলের প্রাচীন বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত তথ্য সহযোগে মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেই মূল পাণ্ডুলিপিটির সমাপ্তি টানা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশক শ্রীযুক্ত দেবানন্দ দাম মহাশয় রাজন্য পরবর্তী সময়ের ইতিহাসও সংক্ষেপে তুলে ধরলে বইটি একটা সম্পূর্ণতা পেত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে লেখক সমস্ত শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুলগুলিতে (আগরতলার ৪টি স্কুল বাদে) স্বীয় ঠিকানাযুক্ত খাম সহযোগে রাজন্য পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান। এছাড়াও সরাসরি টেলিফোনে যে যে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এই উভয় প্রচেষ্টার ফল হিসেবে বেশ কিছু তথ্য এবং বিদ্যালয়ের প্রাচীনত্ব নিয়ে পৃথক মতামত চলে আসে। এইসব তথ্যই 'পরিশিষ্ট' নামে একটি পৃথক অধ্যায়ে যুক্ত করা হল।

পরিশিষ্ট ঃ - ১ যোগাযোগ

১. রাগনা হাই স্কুল, ধর্মনগর

স্কুলটির বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেয়ে পাঠানো চিঠির উত্তরে বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র দাস মহাশয় স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক শ্রীযুক্ত প্রমেশ পাল ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র পাল মহাশয়ের সহযোগিতায় সংক্ষেপে একটি চিঠিতে স্কুলের বিবর্তনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করে লেখককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

তিনি লিখেছেন—

ত্রিপুরার রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পিতার আমলে রাগনা নিম্ন-বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়।

(১) রাজন্য আমলের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৫৫ ইং পর্যন্ত তা নিম্ন-বাংলা স্কুল ছিল।

(২) সম্ভবতঃ ১৯৫৬ ইং সনে উক্ত স্কুলটি জে. বি. স্কুলে উন্নীত হয়। [এক্ষেত্রে জে. বি. স্কুল বলতে নিম্ন বুনিয়াদী (Junior Basic) বিদ্যালয় বুঝতে হবে। —লেখক]।

১৯৫৮ ইং সনে রাগনা জে. বি. স্কুল এস. বি. (উচ্চ বুনিয়াদী — Senior Basic) স্কুলে উন্নীত হয়।

১৯৮৩ ইং সনে উক্ত স্কুলটি এস. বি. থেকে হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

১৯৮১ইং সনে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে স্কুলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। যার ফলে স্কুলের যাবতীয় রেকর্ডপত্র পুড়ে ছাই হয়।

প্রয়াত শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবের আমলেই স্কুলটি হাইস্কুলের অনুমোদন লাভ করে। (১৯৭৮ সালের মন্ত্রীসভায় মাননীয় দশরথ দেব শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৮৩ সালের মন্ত্রীসভায় তিনি উপ মুখ্যমন্ত্রী ও তৎসঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল— লেখক।)

(৩) বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা = ৩৯৪ এবং শিক্ষকসংখ্যা = ১৮।

(৪) স্থানীয় ঁ রাধারমণ চক্রবর্তী, উক্ত নিম্নবাংলা স্কুলের জন্য ভূমি দান করেন। তাঁরই সৌজন্যে স্কুলের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল।

ঐ সময়ে প্রথম শিক্ষক ছিলেন ঁউমাচরণ পাল। পরবর্তীকালে ঁরমেশ চক্রবর্তী, ঁ গিরিন্দ্র পাল, ঁমোহনচাঁদ সিং, ঁসুকুমার পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা করেন। এরা সবাই রাজন্য আমলের শিক্ষক ছিলেন।

(৫) স্থানীয় ঁগিরীশ চক্রবর্তী, ঁরমেশ নাগ, ঁমহেন্দ্র পাল (ডাক্তার), ঁশচীন্দ্র পাল (কবিরাজ), ঁধনী সিংহ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের তদারকিতে স্কুলের কাজ তখন পরিচালিত হত।

উক্ত সময়ে স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন প্রয়াত নিতাই চাঁদ সিংহ।

লেখকের মন্তব্য ঃ স্কুলের প্রাচীন ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিটোল চিত্র ফুটে উঠেছে বলেই প্রায় সম্পূর্ণ চিঠিটি অপরিবর্তিত ভাবে প্রকাশ হলো। সে যুগে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বারা স্কুলগুলি পরিচালিত হতো, তাও এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে। এছাড়া রাজন্য আমলে এই স্কুলের বিভিন্ন শিক্ষকদের নামের উল্লেখ এতে মূল্যবান অবদান যুগিয়েছে।

তবে স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে এই চিঠিতে ভিন্নমত প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বীরবিক্রমের পিতা, অর্থাৎ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে (১৯০৯-২৩ খ্রিঃ) রাগনা নিম্ন-বাংলা স্কুলটি স্থাপিত হয়, এক্ষেত্রে কোন সন-তারিখের উল্লেখ করা হয় নি। বস্তুত, প্রাচীন স্থানীয় ব্যক্তিদের স্মৃতি থেকে এই ধরনের নির্দিষ্ট সন-তারিখ পাওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্কুলটি একবার সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হওয়ার কারণে যদি

কোন প্রাচীন নথিপত্র থেকেও থাকত, তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমরা এই স্কুলের অতীত খুঁজতে গিয়ে আগে দেখেছি যে, ১৯১২-১৩ খ্রিঃ (১৩২২ ত্রিং) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, স্কুলটি পাঠশালা পর্যায় থেকে নিম্ন-বাংলা পর্যায়ে ঐ বছর (অর্থাৎ ১৯১২ খ্রিঃ সনে) উন্নীত হয়। স্কুলটির অস্তিত্ব যে ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪ খ্রিঃ) পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই টেনে নেওয়া যায়, সে সম্পর্কে আমরা আগেই বিস্তারিত দেখিয়েছি। তবে একটা প্রশ্ন উঠে যে, স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের মনে স্কুলটি সম্পর্কে এই ধারণা উৎপত্তির কারণ কি ?

এর উত্তর আমরা খুঁজে পাব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জবানীতে— "১৩২২ ত্রিং সনে রাগনা মৌজার পাঠশালাটিকেও নিম্নবাংলা স্কুলে পরিণত করিয়া আবশ্যকীয় সুবন্দোবস্ত করতঃ ভবিষ্যতে ধর্মনগরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়।" প্রকৃতপক্ষে, এই "আবশ্যকীয় সুবন্দোবস্ত' কথাটির মধ্যেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। পূর্বে পাঠশালাটির দশা যে খুব একটা ভাল ছিল না, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের উক্তি থেকেই বুঝা যায় (অবশ্য রাজন্য আমলে কোন পাঠশালারই স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, সাধারণত লোকালয়ের একটি কোণে অথবা বাজারের আশেপাশে একটা খুব সাধারণ ছাউনি গড়ে সেখানে শিক্ষার কাজ চালানো হত)। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলেই শিক্ষানুরাগী রাধারমণ চক্রবর্তীর দান করা জমিতে একটি মজবুত স্কুলগৃহ নির্মাণের মাধ্যমে স্কুলটি একটি স্থায়ী ঠিকানা পায়। ভূমিদানের এই ঘটনা রাধারমণ চক্রবর্তীর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে বর্তমানে তা স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে রাগনা এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে স্কুলের এর আগের ইতিহাস এলাকার লোকজনের স্মৃতি থেকে লোপ পায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর— ধর্মনগর বিভাগ' গ্রন্থে এবং Tripura Administration Report -এ স্কুলের অতীত ইতিহাস ধরা পড়েছে।

কাজেই স্কুলটির অস্তিত্ব ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যে ছিল (তা স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালও হতে পারে, অথবা এর আগেও স্থাপিত হতে পারে), সে সম্পর্কে অন্য কোনো ভাবনার অবকাশ নেই।

২. যাত্রাপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সোনামুড়া

স্কুলটির রাজন্য আমলের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক হিমাংশু দাস জানিয়েছেন যে, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্কুলের রাজন্য আমলের ইতিহাস উদ্ধারে সমর্থ হন নি। বিশেষ করে কাঁটাতারের বেড়া পড়ায় এলাকার অনেকেই স্থান পরিবর্তন করেছেন, অন্যরাও বিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। তবে রাজন্য আমলের শেষভাগে, একজন শিক্ষক এসে পাঠশালার মতই শিক্ষা দান করতেন— একথা তিনি শুনেছেন বলে জানিয়েছেন।

স্কুলটির যে রাজন্য আমলে অস্তিত্ব ছিল, তা প্রধান শিক্ষকের একটি মূল্যবান মন্তব্যেই ধরা পড়ে— "তবে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি খাতায় কাগজে 'ত্রিং' এই শব্দটি পেয়েছি। তাহাতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, বিদ্যালয়টি রাজন্য আমলের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল।"

এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য এই যে, ত্রিং বলতে এখানে ত্রিপুরাব্দকে বুঝাচ্ছে, যা কল্যাণ মাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরার রাজারা ব্যবহার করতেন। আর বিদ্যালয়টি রাজন্য আমলের পূর্বে নয়, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির আগে রাজন্য ত্রিপুরার রাজারাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মাননীয় প্রধান শিক্ষক আরো জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর বিদ্যালয়টি অনেকদিন নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় হিসেবে চালু ছিল, কিন্তু কখন স্কুলটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তা তিনি জানাতে পারেন নি। বিদ্যালয়টি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা— ৩১৯ জন এবং ৮ জন শিক্ষক আছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে স্কুলটি তুলনায় গুরুত্বহীন হলেও শতবর্ষের গৌরবে মহীয়ান।

৩. নবদ্বীপ চন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন (N.C.I), সোনামুড়া

টেলিফোন যোগাযোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সেলিম মহাশয় বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লেখককে জানান—

i) স্কুলটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বলে তিনি জানেন।

ii) ১৯৬৪ সনে পুরানো বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ে চালু হয়।

iii) তখন বিদ্যালয়টি নবদ্বীপচন্দ্র নগরে (মধুবন টীলা) চলে আসে।

iv) ২০০১ সালে বিদ্যালয়টি বর্তমান অবস্থানে চলে আসে।

v) বর্তমানে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রাইমারী বিভাগ সহ ১১০০-এর মতো এবং শিক্ষক সংখ্যা - ৪৫।

vi) ১৯৭৬ সন থেকে বিদ্যালয়টি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশনের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিত হয়।

লেখকের মন্তব্য : আমরা আগেই দেখেছি যে, স্কুলটির স্থাপনাকাল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ, তাই প্রধান শিক্ষকের স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল সংক্রান্ত তথ্য যে নির্ভুল নয়, তা প্রমাণিত। মাননীয় প্রধান শিক্ষক এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। তিনি মধুবন টীলায় স্কুলের সাইনবোর্ডে স্কুলটি ১৯১৭ইং সনে স্থাপিত বলে লিখিত আছে, দেখেছেন। এই সাইনবোর্ডের ভিত্তিতেই বর্তমান

অবস্থানেও স্কুলের নামের সঙ্গে সঙ্গে তা ১৯১৭ ইং সনে স্থাপিত বলে লেখা রয়েছে। এই সাইনবোর্ডের উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যের খোঁজ তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। সম্ভবত আগে স্কুলে কোন প্রাচীন কাগজপত্রের ভিত্তিতে (যা বর্তমানে হয়ত নেই) অথবা প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতি থেকে তথ্যটি উদ্ধার করা হয়েছিল। তাই প্রশ্ন একটা উঠে যে, স্কুলটির স্থাপনাকাল ১৯১৭ইং, এই তথ্যের উৎসটি কি ?

ত্রিপুরা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকেই এর একটা সন্তোষজনক উত্তর আমরা পেতে পারি। ১৩২৭ ত্রিং (১৯১৭-১৮ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে আমরা দেখেছি— "Besides there was a feeder school to the U. K. Academy at the Divisional town of Sonamura with 173 pupils on the rolls and teaching upto class VIII of the Calcutta University H. E. School Standard." অর্থাৎ এই বছর থেকেই বিদ্যালয়টি হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে প্রথম ধাপ পেরোয়। বিদ্যালয়টির হাইস্কুলে পরিণতির এই ধাপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হওয়ায় একেই বিদ্যালয়ের স্থাপনাকাল বলে প্রাচীন ব্যক্তিদের মনে গেঁথে আছে। দ্বিতীয়ত মধ্য ইংরেজী (এম. ই.) স্কুল থাকা অবস্থায় বিদ্যালয়ে লিখিত কাগজপত্রের প্রয়োজন খুব কমই ছিল, কিন্তু ফিডার স্কুল হিসেবে পরিণত হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার রক্ষণ অনেক বেশি জরুরী হওয়ায় ঐ পর্যায় থেকেই প্রাচীন তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এইভাবেই বিদ্যালয়গুলির শৈশব / কৈশোর কালের ইতিহাস আমাদের স্মৃতি থেকে লোপ পায়।

৪. বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (B.B.I), ধর্মনগর

টেলিফোনে আলাপচারিতায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রিপন চক্রবর্তী বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানিয়েছেন—

i) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে তিনি ধর্মনগর Alumni Association থেকে জানতে পেরেছেন যে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানে স্কুলটি চলে আসে অথবা স্থাপিত হয়।

ii) তবে স্কুলের একজন প্রাচীন শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন, এই স্কুলে আগে একটি ঘন্টা ছিল, যাতে ১৯০৮ খোদাই ছিল, কিন্তু ঘণ্টাটি, দুর্ভাগ্যবশত, এখন আর নেই, চুরি হয়ে গেছে।

iii) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিদ্যালয়ে পুরানো উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়। তখন এর নাম ছিল Birbikram multipurpose school with diversified course. এই ধরনের পাঠ্যক্রম তখন কেবলমাত্র আর উমাকান্ত একাডেমীতেই চালু ছিল।

iv) বর্তমানে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা— আনুমানিক ১১৬২ জন এবং শিক্ষক ৪১ জন।

v) ১৯৭৬ খ্রিঃ থেকে স্কুলে ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্স চালু হয়।

লেখকের মন্তব্য ঃ দেখা যাছে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে স্কুল-কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয়রা খুব একটা নিশ্চিত নন। ধর্মনগরের এই বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন সম্পর্কে ত্রিপুরা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে এতই তথ্যের সমাবেশ যে, এর প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ (অথবা তারও আগে) তা নিশ্চিত ভাবে যে বলা যায়, তা দেখানো হয়েছে। তাহলে ধর্মনগরের এই স্কুলটির সঙ্গে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ কিভাবে জড়িয়ে গেল তা খতিয়ে দেখা যাক। ১৩২৮ ত্রিং (১৯১৮-১৯ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে আমরা দেখেছি ঐ সালেই ধর্মনগরের এম.ই. স্কুলটি ফিডার স্কুল হিসেবে উন্নীত হয়, যাতে Class VIII পর্যন্ত পড়ানো হত। সম্ভবত, এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটিই প্রাচীন ব্যক্তিদের মনে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে গেঁথে গেছে। কিন্তু তা একবছর কেন এগিয়ে গেল তার খোঁজে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর — ধর্মনগর বিভাগ' গ্রন্থে আরেকটা সূত্র পাওয়া গেল। এতে লিখিত আছে—"শ্রী গৌর নাথ নামক জনৈক প্রজা হইতে কতক স্থান গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করতঃ তাহাতে মধ্য ইংরেজী স্কুলগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। ১৩২২ ত্রিং সনে ঐ স্থানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানেই বীরবিক্রম কিশোর হাই স্কুল পরে স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।' (পৃ- ৭)।

তাই দেখা যায় যে, Dharmanagar Alumni Association-এর বর্তমান স্থানে ১৯১৭ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠার দাবীটিও প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা স্বীকৃতি পায় না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত অনুসারে এই স্থানটি ১৩২২ ত্রিং (১৯১২-১৩ খ্রিঃ) সনের আগেই নেওয়া হয়েছিল এবং জমির দানকর্তা শ্রীযুক্ত গৌর নাথ।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সোনামুড়ার NCI স্কুলের মতই ফিডার হাইস্কুলে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠাকাল নির্দেশ করার প্রবণতা (স্কুলের আগের ইতিহাস অগ্রাহ্য করে) এক্ষেত্রেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

৫. রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন (R. K. I.), কৈলাসহর

আর. কে. আই. -এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্যের কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি তথ্যভারে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, স্কুলটির হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় প্রথম প্রধান শিক্ষক

ছিলেন কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে (শতবর্ষের আলোকে কৈলাসহর 'রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন', স্যন্দন পত্রিকা, ৩ জানুয়ারী, ২০০২ইং) লিখেছেন— "কুঞ্জলাল চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে ১৯৩১ খ্রিঃ প্রথম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়।" কিন্তু এই স্কুলটি ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ইং) বর্ষে হাইস্কুলে উন্নীত হলেও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোনো ছাত্র (প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে) বসতে পারে নি, এটা আমরা আগেই দেখেছি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগরতলায় একটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র অনুমোদিত হয় (এর আগে ত্রিপুরার ছাত্রদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বাইরে যেতে হতো)। এই কেন্দ্রের পরীক্ষা সরাসরি মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে হতো। এই কেন্দ্রে ত্রিপুরার সমস্ত হাইস্কুলের ছাত্ররা এসে পরীক্ষা দিতো। অন্ততঃ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা যে চালু ছিল, তা ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং (১৯৪৩-৪৬ ইং) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টেই দেখা যায়। তাই গোপালবাবুর এই বক্তব্য তথ্যের নিরিখে গ্রহণযোগ্য নয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য প্রাচীন বিদ্যালয়ের মতোই রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশনে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়। এই স্কুলেরই এক প্রাক্তন শিক্ষক দীপকরঞ্জন পাল মহাশয় জানিয়েছেন যে, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যাচ হিসেবে ছাত্ররা পরীক্ষায় বসে।

এছাড়া টেলিফোনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান যে, স্কুলটিতে বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষক ও আনুমানিক ৭৫০ জন ছাত্র আছে। ১৯৭৬ সন থেকে স্কুলটি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

৬. সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, সোনামুড়া

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ সৌমিত্র সোম এই বিদ্যালয়েরই এক শিক্ষক জয়দীপ ভট্টাচার্যের মারফতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাঠিয়েছেন —

i) তাঁর জানা মতে, স্কুলটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রাইমারী স্কুল হিসেবে স্থাপিত হয়।

ii) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

iii) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি হাই স্কুলে পরিণত হয়।

iv) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তা দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।

v) বর্তমানে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা একাদশ শ্রেণীসহ মোটামুটি ভাবে ৭০০ জনের কাছাকাছি এবং ২৯ জন শিক্ষক আছেন।

লেখকের মন্তব্য ঃ রাজন্য আমলে স্কুলগুলির স্তর হিসেবে প্রাইমারী স্কুল ছিল না, পাঠশালা/নিম্নবাংলা/উচ্চ বাংলা / মধ্য ইংরেজী বা এম.ই. / হাই-এই রকমের ছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল এবং তার যে ধারাবাহিক অস্তিত্ব ছিল, তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত। আমরা আগেও অনুমান করেছি যে, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্কুলটি এম.ই. স্কুলে পরিণত হয়। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে কিন্তু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কোনো স্কুলের (মেয়েদের) এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হতে দেখা যায় না, ১৯৪১ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দুটি স্কুলের এম.ই. পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার তথ্য আছে। আবার ২০ জুলাই, ২০০৯ইং তারিখের স্যন্দন পত্রিকায় 'জনমানসে' বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত জিতেন পাল মহাশয় জানিয়েছেন যে, তিনি ১৯৪১ সনে অক্টোবরে যখন শিক্ষা বিভাগে সাব-ইনস্‌পেক্টর নিযুক্ত হন তখন তাঁর অধীনে (সদর বিভাগসহ সমগ্র দক্ষিশ ত্রিপুরা) সোনামুড়ার এই বিদ্যালয়টি সহ তিনটি এম. ই. বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিদ্যালয়টি এর আগেই অর্থাৎ ১৯৩৯ সনের গোড়ায় মধ্য ইংরেজী অর্থাৎ এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়েছিল। তবে কি, ১৯৪২ সনে স্কুলটি নতুন ভাবে নির্মিত হয়ে শহরের পানীয় জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্কের দক্ষিণ পাড়ে চলে আসে, যা ঐ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের স্মৃতিতে গেঁথে আছে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৮ সনে স্কুলটি প্রকৃতপক্ষে উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) স্কুলে রূপান্তরিত হয় নি, জুনিয়র হাইস্কুলে পরিণত হয়েছিল, কারণ, Tripura District Gazetteers-এর ১৯৬৩-৬৪ সনের তথ্যে স্কুলটিকে জুনিয়র হাই স্কুল বলা হয়েছে।

৭. খোয়াই সরকারী বয়েজ হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল, খোয়াই

এক টেলিফোন আলাপচারিতায় খোয়াই সরকারী বয়েজ হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানিয়েছেন—

i) স্কুলটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বলে তিনি জানেন।

ii) আগে স্কুলটি খোয়াই শহরের পুরানো বাজার সংলগ্ন ছিল।

iii) বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা — ৩৮ জন (প্রধান শিক্ষক সহ) এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭০০ জন। স্কুলে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক— এই তিনটি বিভাগই আছে।

iv) ১৯৭৬ খ্রিং সনে বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

লেখকের মন্তব্য ঃ খোয়াই বিভাগের উৎপত্তির (১৮৯৫ খ্রিঃ) সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলটির ধারাবাহিক অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। তাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে

স্কুল-কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনগণের এই ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত খোয়াই বিভাগে ১৯০৯-১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কার্যরত ছিলেন। 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর— খোয়াই বিভাগ' গ্রন্থে খোয়াই-এর এই স্কুলটির উল্লেখ ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনের। তাই স্কুল-কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় জনগণ এই বইটির সাহায্য পেলে স্কুলটির স্থাপনাকাল আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন।

তবে ১৩৪৩ ত্রিং (১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বছর ২০০০ টাকা খরচে ১০০ জন পার্বত্য শিক্ষার্থীর জন্য একটি বেশ বড় ঘর তৈরী করা হয়েছিল। স্থানীয় জনগণের কাছে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাই কি প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এই ধারণার জন্ম দিয়েছিল ?

আগে স্কুলটি কোথায় ছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য খোয়াই-এর বাসিন্দা ও খোয়াই গার্লস স্কুলের শিক্ষক প্রিয়তোষ ঘোষের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে, বর্তমানে গার্লস স্কুলটি যে জায়গায় আছে, সেখানেই খোয়াই বয়েজ এইচ. এস. স্কুলটি আগে ছিল। ঐ জায়গাটি শ্রীযুক্ত অধীর দেব সরকার মহাশয়ের পরিবার তিন পুরুষ আগে স্কুলের জন্য সাত কাণি জমি দান করেন। এই দানের পেছনে অনুশীলন সমিতির জনৈক সদস্যের ঐকান্তিক আগ্রহ কাজ করেছিল বলে শ্রীযুক্ত ঘোষ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইলা লোধ ১৯৫৭ সনে এই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি এই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। আগে স্কুলটির নাম ছিল খোয়াই গভঃ হাইস্কুল, তখন শুধু ছেলেরাই পড়ত। ডঃ ইলা লোধ মহাশয়ার ঐ স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৯৫৫ সন থেকে স্কুলটিতে কো-এডুকেশন চালু হয়। আবার গার্লস স্কুলটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হওয়ার পর তা বয়েজ স্কুলে পরিণত হয়।

৮. বোধজং বয়েজ এইচ. এস. স্কুল, আগরতলা

পূর্ববর্তী আলোচনায় এই স্কুলটি সম্পর্কে ১৮ জানুয়ারী, ২০০৭ইং সনে প্রকাশিত শ্রী অঞ্জন বণিকের একটি প্রবন্ধের জের ধরে লেখকও সহমত হয়েছিলেন যে, স্কুলটি ১৯৪৫ সনেই নতুন নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে মরা চৌমুহনীতে অর্থাৎ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ঐ স্কুলেরই এক প্রাক্তন ছাত্র ও ধলেশ্বরের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন যে, মরা চৌমুহনীতে বর্তমান বিল্ডিং-এ স্কুলটি ১৯৬০ সনে স্থানান্তরিত হয়, এর আগে তা আগের জায়গাতেই (অর্থাৎ বর্তমান বোধজং গার্লস স্কুলের স্থানে) ছিল। শ্রীযুক্ত ভৌমিক এই স্কুলে ১৯৬১ সনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি আরো বলেছেন যে, বোধজং স্কুলটি ১৯৬০ সনে স্থানান্তরণের পরই আগের জায়গায় বোধজং গার্লস স্কুলটি স্থাপিত হয়। তবে ৪নং নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলটি, যা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনও তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

স্কুলের বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, স্কুলটিতে ১৯৫৭ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়েছিল। ১৯৭৬ সনে স্কুলটি দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে স্কুলে ৫০ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্রসংখ্যা ১২০৬ জন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিভাগটি হিসেবের মধ্যে আনা হয় নি।

৯. কমলপুর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কমলপুর

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় লেখকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপচারিতায় জানিয়েছেন—

১) স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই। তবে ১৯৫০ সনে হাইস্কুল রূপে বর্তমান অবস্থানে চলে আসার আগে অন্যত্র ছিল বলে জানা আছে।

২) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আগের উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়েছিল।

৩) ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম চালু হয়।

৪) বর্তমানে স্কুলের শিক্ষকসংখ্যা — ২৯ জন (প্রধান শিক্ষক সহ) এবং ছাত্রসংখ্যা— ৩৪৪ জন।

(স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নিখিলেশ ভট্টাচার্য মহাশয় এই স্কুলেরই প্রবীণ শিক্ষক উমাপদ পালের কাছ থেকে স্কুলের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন।)

১০. কৈলাসহর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, কৈলাসহর

কৈলাসহর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়টি সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা আগেই জেনেছি যে, ১৯৫৪ সনেই স্কুলটি হাই স্কুলে পরিণত হয়। এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সর্বশেষে ১৯৭৬ সালে তা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা আনুমানিক ১২০০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৪৫ জন। এইসব তথ্য টেলিফোন-যোগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরকুমার দাস মহাশয় লেখককে জানিয়েছেন।

১১. ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলোনীয়া

আগের আলোচনায় দেখেছি যে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী থেকে স্কুলটি উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) স্তরে উন্নীত হয়ে বর্তমান অবস্থানে চলে আসে। এরপর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য স্কুলগুলির মতোই ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষকসংখ্যা ৩২ জন এবং ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৪২৫ বলে জানা গেছে।

১২. শালগড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, উদয়পুর

লেখকের চিঠির উত্তরে শালগড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এক চিঠিতে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি দিয়েছেন—

১) এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে, বিদ্যালয়টি ১৯৩২/৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২) বর্তমানে শালগড়া বাজার ও তহশীল কাছারী যেখানে অবস্থিত, পূর্বে তার সন্নিকটেই বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল।

৩) ঐ সময়ে বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষক ছিলেন, একজনের নাম ঁদেবেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। অন্যজনের নাম জানা যায় নি, তবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি চাণক্য পন্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন।

৪) বিদ্যালয়টি ১৯৫৫ সালে সিনিয়র বেসিক (উচ্চ বুনিয়াদী) স্কুলে উন্নীত হয় এবং ঐ সময়েই পূর্বের অবস্থান থেকে বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়।

৫) ১৯৬৯ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়টি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

৬) ১৯৭৪ সালে বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে উন্নীত হয়।

৭) ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণী) স্কুলে উন্নীত হয়। তখন স্কুলে কেবলমাত্র কলাবিভাগ চালু হয়েছিল।

৮) ২০০৭ সালে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগও চালু হয়।

এছাড়া স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত পি. সেনগুপ্ত আরো জানিয়েছেন যে, বর্তমানে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সর্বমোট ১২৬৬ (প্রাথমিক বিভাগের ৪৩৮ জন সহ)।

লেখকের মন্তব্য ঃ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে তথ্য বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তা আদৌ সঠিক নয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চিঠিতে আরো লিখেছেন যে, ঐ সময়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে নেই, যারা বেঁচে আছেন, তাঁরাও বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে তাঁদের স্মৃতি অনেকটাই আবছা, অথবা তাঁরা স্মৃতিবিভ্রমের ফাঁদে পড়েছেন। এই স্কুলটি সম্পর্কে আলোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে শালগড়ায় একটি পাঠশালার উল্লেখ আছে। যেহেতু তাঁর এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দ, তাই ঐ সময়ে যে বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতেই পারে না। দ্বিতীয়ত, যেহেতু উদয়পুর বিভাগের জন্মলগ্নেই শালগড়ায় তহশীল কাছারী স্থাপিত হয়েছিল এবং ১৯০৪ ইং তাতে বাজার স্থাপিত হয়েছিল, কাজেই স্পষ্টত, এখানে উল্লেখযোগ্য জনবসতি ছিল। আরো দেখা যায় যে, সোনামুড়া বিভাগ থেকে উদয়পুর বিভাগ পৃথক হওয়ার আগেই উদয়পুর বিভাগে ৫টি স্কুল ছিল। যেহেতু, প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে উদয়পুরের পরই শালগড়ার স্থান, তাই সেখানে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আগেই যে বিদ্যালয়টি ছিল তা নিশ্চিত বলা যায়।

প্রাচীন ব্যক্তিদের বর্ণনায় স্কুলে দুজন শিক্ষক ছিলেন, তা জানা গেছে। তখন স্কুলটি প্রাথমিক স্কুল ছিল বলে প্রাচীন ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। কিন্তু রাজন্য আমলে বিদ্যালয়ের স্তরগুলি এভাবে নামাঙ্কিত ছিল না। সবচেয়ে নিচের স্তরে পাঠশালা (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত), এরপর নিম্ন-বাংলা (চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত), এরপর মধ্য - ইংরেজী বা এম.ই. (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত), এরপর হাইস্কুল। পাঠশালায় কেবল একজন গুরুমশাই থাকতেন। এই পাঠশালাগুলি সাধারণত বাজারের পাশেই গড়ে উঠত। এদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকতো না, বেশির ভাগ সময়ই বাজারের অস্থায়ী দোকানগুলির অব-কাঠামোগুলি ব্যবহার করা হত। নিম্ন-বাংলা স্কুলের ক্ষেত্রে বেশকিছু ক্ষেত্রেই স্কুলের নিজস্ব অব-কাঠামো গড়ে উঠত এবং স্কুলে দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। তাই ঐ সময়ে যেসব ছাত্র পড়েছেন, তারা স্কুলের নিজস্ব গৃহ দেখেছেন এবং তারই কারণে ঐ সময়েই স্কুলটি গড়ে উঠেছিল তা মনে রেখেছেন, যার জন্যই এই বিভ্রান্তি।

১৩. উদয়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, উদয়পুর

উদয়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হারাধন সাহা পত্রালাপে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন—

১) রাজন্য আমলে স্কুলটি এম.ই. পর্যায়ে ছিল এবং তা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত একই অবস্থায় ছিল।

২) ১৯৫৯ সালে বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৬১ সালে প্রথম স্কুল ফাইনাল

পরীক্ষায় ছাত্রীরা বসে।

৩) ১৯৬৫ সালে বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। তখন কেবল কলা বিভাগ চালু ছিল। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়।

৪) ১৯৭৬ সালে বিদ্যালয়টি ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীনে গেলেও ১৯৭৮ সালে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়। শুধুমাত্র কলা বিভাগের ছাত্রীরাই ১৯৮০ সনে প্রথম এইচ. এস. পরীক্ষায় বসে।

৫) ১৯৮৩ সালে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়।

৬) বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা (ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণী) — ১০০৭ জন এবং প্রাথমিক বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ১২৮ জন।

৭) বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা— ৪২ জন এবং প্রাথমিক বিভাগে - ৯ জন।

এছাড়া তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ১৯০৯ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি জগন্নাথ দীঘির উত্তর পাড়ে ছিল (ছন-বাঁশের ঘর)। ১৯৬৭ সালে বর্তমান জায়গায় আসে। এই নতুন বাসগৃহের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতি প্রতিমা দাস ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি নীলিমা গুপ্ত।

১৯৫৭-৫৮ সালে বিদ্যালয়টি পুড়ে যায়, তখন কিছুদিনের জন্য স্থানীয় K.B.I. স্কুলে সকালবেলা পঠন-পাঠনের কাজ চালু ছিল। এই অগ্নিকান্ডে বিদ্যালয়ের সব প্রাচীন তথ্য নষ্ট হয়ে যায়।

লেখকের মন্তব্য ঃ

উপরোক্ত তথ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি আগেই আলোচিত হয়েছে, তবে প্রধান শিক্ষকের পত্রে স্কুলের রাজন্য আমলের পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। তবে ১৯৫৯ সনে হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার আগে স্কুলটি মধ্য ইংরেজী (এম.ই.) পর্যায়ভুক্ত ছিল কিনা, এ সম্পর্কে লেখকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এম. ই. পর্যায় ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। তাই এরপর হাইস্কুল পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে ঐ সময়ে আরেকটি ধাপ পেরোতে হত। এই ধাপটি হচ্ছে জুনিয়র হাই অথবা উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) পর্যায়। উভয়ই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আমরা আগেই দেখেছি, কৈলাসহর অথবা সোনামুড়া ইত্যাদি মেয়েদের স্কুলগুলি হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার আগে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছিল। উদয়পুরে ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানিয়েছেন যে, হাইস্কুলে

উন্নীত হওয়ার দুই বছর পরেই প্রথম স্কুল ফাইনাল ব্যাচ পরীক্ষায় বসে। তাই এটা নিশ্চিত যে, হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার আগে বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এম.ই. স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হলে প্রথম ব্যাচ্ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে চার বৎসর সময় লাগতো।

তাই এটা নিশ্চিত যে, স্কুলটি ১৯৫৯ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার আগে জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর কখন তা এম. ই. পর্যায় থেকে জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল, তা বোধকরি জানা সহজ হবে না।

স্কুলটি সম্পর্কে মূল আলোচনায় এম.ই. পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সময় প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলা কর সম্পর্কে এই লেখক বলেছিলেন যে, তিনি ধর্মনগর থেকে বদলী হয়ে উদয়পুরে এসে এই স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। আমার শ্বশ্রুমাতা শ্রীমতি শ্যামলা কর মহাশয়া ১৯৯৬ইং সনেই পরলোক গমন করেন। তাঁর মুখেই আমরা শুনেছি যে, তিনি ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয় থেকে উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ে বদলী হন এবং এখানেও কিছু সময়ের পর আবার সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়ে বদলী হন। কিন্তু উদয়পুরবাসীদের চাপে তাঁকে আবার উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানে আরো কিছুদিন চাকুরি করার পর রাজ্য ত্যাগ করে সমতল ত্রিপুরা জেলায় স্বামীগৃহে চলে যান। তাঁর বড় ছেলের বয়সের হিসেবে লেখক এই অনুমানে উপনীত হয়েছেন। উদয়পুরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বড় ছেলের স্মৃতিতেই প্রবল থাকলে এটা স্পষ্ট যে, তিনি উদয়পুরে ১৯৪৩ সনের আগেই এসেছিলেন। এক্ষেত্রে লেখক একটি সাবধানী অনুমানের ভিত্তিতে স্কুলটির এম.ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার একটা সময়সীমায় পৌঁছুতে চেয়েছিলেন মাত্র।

কিন্তু গত ২০ জুলাই, ২০০৯ ইং সনে স্থানীয় দৈনিক স্যন্দন পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জিতেন পালের একটি চিঠি স্কুলটির এম.ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার নির্দিষ্ট সন-তারিখ-এ পৌঁছতে আরো সাহায্য করে। শ্রীযুক্ত জিতেন পাল মহাশয় চিঠিতে জানিয়েছেন যে, ১৯৪১ সনের অক্টোবর মাসে তিনি রাজন্য ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগে সাব-ইনস্‌পেক্টর পদে যোগদান করেন। ঐ সময়ে সদরবিভাগ সহ সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরা তাঁর দায়িত্ব ছিল। তাঁর এলাকায় সদর বিভাগ বাদে আরো তিনটি এম.ই. বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে একটি উদয়পুর মধ্য ইংরেজী (এম.ই.) বালিকা বিদ্যালয়। ডিসেম্বর মাসে তিনি উদয়পুর পরিদর্শনকালে এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলা করের বাসভবনে আশ্রয় নেন। স্কুলটি পরিদর্শন করে তিনি দেখতে পান যে, স্কুলটিতে তখনও এম.ই. স্কুলের পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। ক্লাসরুম ও শিক্ষকসংখ্যাও কম ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের একসঙ্গে বসে ক্লাস করতে হতো। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, স্কুলটিকে সদ্যই বামুটিয়া স্কুলের মতো ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসে

উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু ১৩৫০ ত্রিং (১৯৪০-৪১ খ্রিঃ) সনের Administration Report-এ কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের এম.ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার তথ্য মেলে না, তবে পরের বছরের (১৯৪১-৪২ খ্রিঃ) রিপোর্টে আরো একটি বালিকা বিদ্যালয়ের এম.ই. স্কুলে পরিণত হওয়ার সংবাদ মেলে। তাই এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাস থেকে বিদ্যালয়টির এম.ই. স্কুলে উন্নীত হওয়ার কথা। কিন্তু জিতেন পাল মহাশয়ের প্রদত্ত তথ্যও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা উচিত। তবে কি, স্কুলটি শ্রী জিতেন পাল মহাশয়ের অনুমান মতই ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসেই এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হলেও তাকে ১৯৪১-৪২ সনের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

১৪. বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, বিলোনীয়া

এই স্কুলটি সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনায় লেখক আক্ষেপ করেছিলেন যে, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায়, রাজন্য আমলের বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। এর কারণ কি ? স্মরণিকায় যেসব প্রাক্তন ছাত্রী / শিক্ষক-শিক্ষিকা লিখেছেন, তাদের বেশির ভাগই রাজন্য-পরবর্তী কালের ইতিহাস। আর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ভ্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ। শ্রীমতি অনিমা ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিভূষণ পাল, শ্রীমতি মমতা দাস প্রত্যেকেই বলেছেন, বিলোনীয়াতে মেয়েদের কোনো স্কুল রাজন্য আমলে ছিল না। শ্রীমতি অনিমা ঘোষ লিখেছেন— "১৯৫৩ সাল অবধি বি. কে. আই স্কুলের প্রখ্যাত শিক্ষক মণ্ডলী স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, অশ্বিনী কর, মহেন্দ্র পাল ও আরও অনেক শিক্ষক মহাশয়গণ নিজেদের কন্যাদের স্বার্থে বি. কে. আই. স্কুলের মেয়েদের পঠন-পাঠন দান করতে থাকেন। এভাবেই বি. কে. আই. স্কুলে মেয়েদের জন্য সকালে একটি স্কুলের সৃষ্টি হয়।" কিন্তু আসলে কি তাই ?

শ্রীযুক্ত নারায়ণ সেন, শ্রীযুক্তা তুষারকণা মজুমদার— এদের লেখায় স্পষ্ট যে, ঐ সময়ে বিলোনীয়ার রাজন্য আমলের এম.ই. পর্যায়ের বালিকা বিদ্যালয়টি বি. কে. আই.-এ সকালবেলায় চালু ছিল। তাই ঐ সময়ের ছাত্রী শ্রীযুক্তা অনিমা ঘোষের মনে হয়েছে যে, বি. কে. আই. স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারাই সকালবেলার মেয়েদের স্কুলটির সৃষ্টি হয়েছে। অনিমা দেবীর লেখাতেই আবার স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যখন সকালবেলার মেয়েদের স্কুলটিকে তুলে দিয়ে সরকার বি. কে. আই. স্কুলটিকে কো-এডুকেশন স্কুলে পরিণত করেন, তখন ঐ রাজন্য আমলের এম.ই. বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা এবং বি. কে. আই. স্কুলের শিক্ষকদের উদ্যোগে ঐ স্কুলেই সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর যে সকল ছাত্রীরা প্রাইভেট পড়ত, তাদের সবাই এসে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে এসে ভর্তি

হয়েছিল। তাই বর্তমানের এই স্কুলটি নিশ্চিতভাবেই রাজন্য আমলের বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তরসূরী। তাই স্কুলটির ২০১০ সালে 'শতবর্ষ অতিক্রমণ উৎসব' পালন করে বর্তমান ভ্রম নিরসন প্রয়োজন।

রাজন্য আমলের এই বালিকা বিদ্যালয় কখন এম.ই. স্কুলে উন্নীত হয়েছিল, তা ২০ জুলাই স্থানীয় দৈনিক স্যন্দন পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জিতেন পালের এক চিঠির আনুকূল্যে নিশ্চিত ভাবে জানা যায়। শ্রীযুক্ত জিতেন পাল যখন ১৯৪১ সালের অক্টোবর শিক্ষা বিভাগে সদরসহ সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরার স্কুল সাব-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন তখন এই অঞ্চলে সোনামুড়া ও উদয়পুরের সঙ্গে সঙ্গে বিলোনীয়াতে মেয়েদের এম.ই স্কুল ছিল বলে জানিয়েছেন। ঐ সময়ে সমগ্র ত্রিপুরায় মাত্র চারটি এম. ই. স্কুল ছিল। বাকী স্কুলটি যে কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয় তা নিশ্চিত ভাবেই জানা গেছে। এদের মধ্যে উদয়পুরের স্কুলটি ১৯৪১ সনে এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়। ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায় যে, রাজ্যে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়েছে। কাজেই, ১৯৩৯ খ্রিঃ সনে বিলোনীয়ার বালিকা বিদ্যালয়টি এম. ই. স্কুলে উন্নীত হয়।

২০০৬ সনে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে স্মরণিকা থেকে আরো জানা যায় যে, ১৯৬৭ সনে স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতি কল্পনা পাল ১৯৬৪ সনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন, তিনি H. S. -এর প্রথম ব্যাচ্-এর একজন ছাত্রী। ১৯৭৬ সনে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীনে স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম চালু হয়। এই স্কুলে বর্তমানে শুধুমাত্র কলা বিভাগই চালু আছে। ২০০৬ সনে স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সহ মাত্র ২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, এছাড়া ২ জন শারীর শিক্ষকও আছেন।

১৫. ব্রজেন্দ্রকিশোর ইন্স্টিটিউশন (B. K. I), বিলোনীয়া

বি. কে. আই. -এর শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় শ্রীযুক্ত সুশান্ত চক্রবতীর লেখা থেকে জানা যায় যে, গত শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল ছিল। উপজাতি ছাত্রদের জন্যও পৃথক ঘরের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য স্কুলটি পরিদর্শন করেন।

স্মরণিকায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৩ সনে বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই, ১৯৭৬ সনে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীনে স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়।

স্মরণিকা থেকে আরো জানা যায় যে, ২০০৫ইং সনে ২ জন শারীর শিক্ষক ও ২ জন কম্পিউটার শিক্ষক সহ স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ৩৯।

১৬. কিরীট বিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন (K.B.I), উদয়পুর

রাজন্য আমলে স্কুলটি আগে টাউনহলের আশেপাশে কোন জায়গায় ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তা বর্তমান জায়গায় চলে আসে। আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৩৩৮ ত্রিং (১৯২৮-২৯ খ্রিঃ) সনের শেষভাগে উদয়পুরের জনসাধারণের অনুরোধে স্কুলটিকে ১৯২৯ইং সন থেকে উদয়পুর ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় এই শর্তে যে, উদয়পুরবাসীরা স্কুলের জন্য নতুন ঘরের ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে নতুন জায়গায় নতুন ঘরে ১৯৩০ সনে স্কুলটি চলে আসে।

শহরের প্রবীণ অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, ১৯৫৭ খ্রিঃ সন থেকেই উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়।

অন্যান্য স্কুলের মতোই ১৯৭৬ সনে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে স্কুলে ২ জন শারীরশিক্ষক সহ ৪০ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্রসংখ্যা ১১০০-এর মতো।

১৭. সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, সাব্রুম

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি স্কুলটি ১৯৫৪ সালে হাইস্কুল হিসেবে বর্তমান স্থানে স্থাপিত হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সাব্রুমের প্রাচীন বাসিন্দা এবং এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক (পরে সাব্রুম গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত রাখাল নাথ জানান যে, পূর্বে অর্থাৎ রাজন্য আমলের শেষভাগে স্কুলটি মধ্য ইংরেজী (এম.ই.) পর্যায়ভুক্ত ছিল। তখন স্কুলটি বাজারের কাছে একটি বাঁশের বেড়ার ঘরে চালু ছিল। পরে তা ১৯৫৪ সনে হাইস্কুলে উন্নীত হয়ে বর্তমান অবস্থানে চলে আসে। তবে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অংশটি আগের জায়গাতেই থেকে যায়। এই অংশটি বর্তমানে সাব্রুম জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে পরিচিত।

সাব্রুম হাইস্কুলটি ১৯৬৫ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পর্যায়ে উন্নীত হয়। ত্রিপুরার অন্যান্য স্কুলগুলির মতোই স্কুলটিতে ১৯৭৬ সনে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়।

লেখকের মন্তব্য ঃ কোনো বিদ্যালয়ই হঠাৎ করে হাইস্কুলে পরিণত হয় না। ধীরে ধীরে স্কুলের উচ্চতর শ্রেণী খোলার মাধ্যমেই তার ক্রমোন্নতি হয়। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের তা ভাবনার

মধ্যে থাকলে সহজেই স্কুলের পূর্বতন ইতিহাস তাদের সামনে এসে যেত।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ত্রিপুরার অন্যান্য প্রাচীন স্কুলগুলির মতোই স্কুলটি উচ্চ বিভাগ ও প্রাথমিক বিভাগ— এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কাজেই সাব্রুম জে. বি. স্কুলটিও দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলটির মতোই শতবর্ষ অতিক্রমণের দাবী রাখে।

সংযোজন ঃ ইতিমধ্যে স্কুলটির বিবর্তন সম্পর্কিত আরো তথ্য পাওয়া গেছে —

ভারত ভাগ হওয়ার পরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে ব্যাপক হারে বাঙালী উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হয়। ঐ সময়ে সাব্রুমে আগতশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে বেসরকারী উদ্যোগে সরকারীভাবে পরিচালিত সাব্রুম মধ্য ইংরেজী (এম ই) স্কুল প্রাঙ্গণেই স্কুলঘরের পাশে নতুন একটি ঘর তুলে তাতে ক্রমে ক্রমে সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেণীর ক্লাস শুরু করেন। এই বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রী ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, তেজেন্দ্রকুমার আচার্য প্রমুখ মুখ্য ভূমিকা অবলম্বন করেন। কিন্তু এই বেসরকারী উদ্যোগের কোন সরকারী অনুমোদন না থাকায় ছাত্রদের অন্য হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে হতো। সাব্রুমের প্রাচীন বাসিন্দা ও এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র শ্রী ফণীভূষণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, এই স্কুল থেকে প্রথম দুই বছর BKI (বিলোনীয়া) এবং এক বছর KBI (উদয়পুর)-এর মাধ্যমে ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। এই হিসেবে ১৯৪৮ সনে বেসরকারী উদ্যোগে সপ্তম শ্রেণীর সূত্রপাত হয় বলে অনুমান করা যায়।

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় চালু এই উদ্যোগের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীক্ষেত্রমোহন চৌধুরী এবং শেষভাগে শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্তী। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী এই স্কুলে ১৯৫২ সনে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেও পরে জোলাইবাড়ি স্কুলে চলে যান। ঐ সময়ে জোলাইবাড়ি স্কুলেরও স্বীকৃতি না থাকায় তিনি KBI স্কুলের মাধ্যমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। আনুমানিক ১৯৫৪ সনে এই বেসরকারী অংশসহ সরকারীভাবে চালু সাব্রুম এম ই স্কুলটিকে হাইস্কুলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাব্রুমের প্রাক্তন বাসিন্দা ও বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীসুনীল চৌধুরী আরো জানান যে, বর্তমান স্থানে তদানীন্তন TTC (ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল) -এর পরামর্শদাতা (Advisor) শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আগের জায়গায় স্কুলটি আরো কিছুদিন (নতুন বিল্ডিং হওয়া সাপেক্ষে) থাকার পর সাব্রুম হাইস্কুলের মাধ্যমিক অংশটুকু বর্তমান স্থানে চলে আসে, প্রাথমিক অংশটুকু পুরানো জায়গাতেই থেকে যায়। শ্রীসুনীল চৌধুরী আরো জানিয়েছেন যে, সরকারী ভাবে অধিগ্রহণের পর শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। (উপরোক্ত সকল তথ্যই সাব্রুমের বাসিন্দা সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও পরে সাব্রুম গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক (প্রাক্তন) শ্রীরাখাল নাথ-এর মাধ্যমে সংগৃহীত।)

লেখকের নিবেদন ঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেসরকারী উদ্যোগে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ক্লাস-এর শুরু রাজন্য আমলের এই এম ই স্কুলটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল অর্থাৎ এটি নেহাতই সাব্রুম এম ই স্কুলের একটি বর্ধিতরূপ মাত্র। ঋষ্যমুখ স্কুলেও আমরা এমন উদ্যোগ দেখতে পাই। বস্তুত রাজন্য ত্রিপুরার অধিকাংশ স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করে এই ধরণের উদ্যোগ ঐ সময়ে বাঙালী উদ্বাস্তুদের দ্বারা শুরু হয়েছিল। যেহেতু সাব্রুম একটি মহকুমা সদর, কাজেই সাব্রুমে একটি হাইস্কুল থাকাটা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই সরকারীভাবে পরিচালিত এম ই স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়। যেহেতু আগে থেকেই একই স্কুল প্রাঙ্গণে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বেসরকারী কাঠামো বজায় ছিল, তা সরকারী স্কুলটির হাইস্কুলে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি অনুকূল ভূমিকা সৃষ্টি করে। তাই বেসরকারী উদ্যোগে চালু উপরের ক্লাসগুলি (সপ্তম থেকে দশম) সরকারী স্কুলেই শুধু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নি, এই বেসরকারী উদ্যোগে যে সকল শিক্ষক সামিল ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সময়ে এই বেসরকারী উদ্যোগে যারা সামিল ছিলেন, তাঁদের কেউই এই বেসরকারী প্রচেষ্টা আলাদা স্বীকৃতি পাক, তার জন্য লালায়িত ছিলেন না। সরকারী উদ্যোগেই উচ্চতর শিক্ষা চালু হউক, এটাই তাঁদের কাম্য ছিল। তাই সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলটি এবং সাব্রুম জুনিয়র বেসিক স্কুল উভয়েই যে রাজন্য আমলের স্কুলটির দ্বিখন্ডিত রূপ, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

১৮. ধর্মনগর সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, ধর্মনগর

ছাত্রীসংখ্যার আধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলোচনায় অনুমান করা হয়েছিল যে, ধর্মনগরের এই বালিকা বিদ্যালয়টির ১৩৪৯ত্রিং (১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ) সনে এম. ই. স্কুলে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে জোরালো। এছাড়া এই লেখকের শ্বশ্রুমাতা শ্রীমতি শ্যামলা কর আনুমানিক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলে প্রথম চাকুরিতে যোগ দেন। এখানে বছর দেড়েক চাকুরির পর উদয়পুরে বদলি হন। তিনি ম্যাট্রিকপাশ করেই এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কাজেই স্কুলটি অন্ততঃ মাইনর অর্থাৎ এম.ই. পর্যায়ের ছিল, তা প্রথমত মনে হয়। বর্তমানে শ্বশ্রুমাতা পরলোকগতা হওয়ায় তা স্পষ্ট জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু অপরদিকে ২০ জুলাই, ২০০৯ইং সনে ত্রিপুরার বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত জিতেন পাল মহাশয়ের চিঠিতে জানা যায় যে, ১৯৪১ সনের অক্টোবরে স্কুল ইনস্পেক্টর হিসেবে যোগদানের সময় সদর সহ দক্ষিণ ত্রিপুরায় তিনটি এম. ই. পর্যায়ের বালিকা বিদ্যালয় ছিল (সোনামুড়া, উদয়পুর ও বিলোনীয়ায়)। ঐ সময়ে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টিও যে এম.ই. পর্যায়ের ছিল, তা জানা গেছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তখনও ধর্মনগর বালিকা

বিদ্যালয়টি এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। স্বর্গীয়া শ্যামলা কর আমাদের কাছে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শোনাবার সময় কোনো সময়েই ধর্মনগর, উদয়পুর ও সোনামুড়ার স্কুলগুলি কোন্ পর্যায়ের ছিল, তা স্পষ্ট করে বলেন নি, তিনি ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয়, উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি বলেছেন। তাই তাঁর চাকুরি জীবন ধর্মনগরে শুরু করার সময় ধর্মনগরের এই বালিকা বিদ্যালয়টি নিম্ন-বাংলা অথবা এম.ই. কোন পর্যায়ের ছিল, তা এই লেখক নিশ্চিত ভাবে বলতে অক্ষম। তবে তাঁর সময়ে বিদ্যালয়ে ইনচার্জের কথা বলেছেন, প্রধান শিক্ষিকার কোন উল্লেখ করেন নি। তাই মনে হয়, অন্তত ১৯৪০ সন নাগাদ ধর্মনগরের বালিকা বিদ্যালয়টি নিম্ন-বাংলা পর্যায়েরই ছিল। ১৩৫৩ ত্রিং (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ) সনে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয়ের এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার খবর অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে মেলে।

যাই হোক, ঘটনা পরম্পরা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, অন্তত ১৯৪৩/৪৪ খ্রিঃ সনেই ধর্মনগরের বালিকা বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরেজী অর্থাৎ এম. ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এম. ই. পর্যায় থেকে কিভাবে তা হাই স্কুলে উন্নীত হয়, তা এই লেখকের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে সম্ভবত কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টির মতোই প্রথমে জুনিয়র হাই এবং এরপর হাইস্কুলে পরিণত হয়— তবে তা রাজন্য আমলের পরে।

ধর্মনগরেরই বাসিন্দা শ্রীমতি মাধুরী রায় (বর্তমানে বিবাহসূত্রে সরকার এবং আগরতলায় আছেন) জানিয়েছেন যে, তিনি এই স্কুল থেকে ১৯৬৪ সনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। তার দিদিরাও এই স্কুল থেকেই স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। তাই অন্ততঃ ১৯৬০ সন অথবা তার আগে স্কুলটি যে হাইস্কুল ছিল তা জানা যায়। কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৫৪ সনে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। সম্ভবত তারপর অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেই ধর্মনগরের স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

শ্রীমতি মাধুরী রায় আরো জানিয়েছেন যে, তার সর্বকনিষ্ঠ ভগ্নী শ্রীমতি রত্না রায় ১৯৬৯ সনে এই স্কুল থেকে H.S. পাশ করেন। শ্রীমতি রত্না রায় আরো জানিয়েছেন যে, তিনি এই স্কুলের H.S. পরীক্ষার্থীদের সেকেন্ড ব্যাচ-এর ছাত্রী অর্থাৎ ১৯৬৮ সনে H.S. পরীক্ষার প্রথম ব্যাচ বসে। কাজেই শ্রীমতি রায়ের বর্ণনা অনুসারে ১৯৬৫ সন থেকে স্কুলে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয় বলে ধরা যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র কুমার বৈদ্য মহাশয়ের সঙ্গে এক টেলিফোন আলাপচারিতায় তিনি জানান যে, বিদ্যালয়টি কখন হাই অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পর্যায়ে উন্নীত হয়, তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানেন না। তবে বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনেছেন যে, বিদ্যালয়টি খুব সম্ভবত ১৯৬০ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়।

১৯৭৬ সনে বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম চালু হয়। বিদ্যালয়ে দু'জন শারীর শিক্ষক সহ ৪৪ জন শিক্ষক বর্তমানে আছেন এবং ছাত্রীসংখ্যা আনুমানিক ১২০০।

১৯. বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, ১৯৫২ সন পর্যন্ত স্কুলটি মাইনর অর্থাৎ এম. ই. পর্যায়ের ছিল। ঐ সময়ে স্কুলটি কেবলমাত্র বালকদের জন্যই ছিল, কিন্তু ১৯৫৩ সনে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার সময় থেকে তা কো-এডুকেশন স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সনে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সনে এতে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়। ১৯৭৬ সনে বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম চালু হয়। এতে বর্তমানে বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিস শাখা চালু আছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে যে, বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৪৯ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্রীসংখ্যা ৮৫৫ জনের মতো।

২০. উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা

স্কুলটি ১৯৫৬ সন পর্যন্ত হাই স্কুল হিসেবেই চালু থাকে। ১৯৫৭ সনে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে স্কুলে বহুমুখী পাঠ্যক্রম চালু হয় এবং স্কুলটি Multipurpose School with diversified course এই নামে পরিচিত হতে থাকে। সাধারণ পাঠ্যক্রম ছাড়াও এতে টেকনিক্যাল শাখাসহ আরো কয়েকটি পাঠ্যক্রম (যেমন স্টেনোগ্রাফি ইত্যাদি) চালু ছিল। অবশ্য এই শাখাগুলি পরবর্তী কালে বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র সাধারণ পাঠ্যক্রম চালু থাকে। ১৯৭৬ সনে অন্যান্য স্কুলের মতোই এতে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে স্কুলে শিক্ষকসংখ্যা ৫৫ জন (তিনজন শারীরশিক্ষক সহ) এবং ছাত্রসংখ্যা ১৬১৬ বলে স্কুলের মাননীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কল্যাণ ভদ্র ৩১শে জুলাই, ২০০৯ইং তারিখে জানিয়েছেন।

২১. মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা

আমরা আগেই জেনেছি যে, ১৯৪১ সনে স্কুলটি হাই ইংলিস স্কুল অর্থাৎ হাই স্কুলে (প্রচলিত ভাষায়) পরিণত হয়। ১৯৫৭ সনে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে স্কুলটি বহুমুখী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে (একাদশ শ্রেণী) উন্নীত হয়। স্মরণিকায় পূর্বতন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অপরাজিতা রায়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, তখন তুলসীবতী স্কুলে মানবিক শাখা, বিজ্ঞান শাখা, গৃহ বিজ্ঞান শাখা ও চারুকলা এই পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছিল।

১৯৭৬ সনে রাজ্যের অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু হয়। স্কুলের বর্তমান ইতিহাস শিক্ষক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দেবনাথ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেছে, স্কুলে বর্তমানে ৬০ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্রীসংখ্যা ২০৩৪ জন।

২২. ধলেশ্বর এইচ. এস. স্কুল, আগরতলা

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, ১৩২১ ত্রিং (১৯১১-১২ খ্রিঃ) সনে কাশীপুর ফার্মে একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল এবং তা হয়েছিল আগে থেকেই বর্তমান, এলাকার দুটি প্রাথমিক স্কুলকে একত্রিত করে তাকে ফার্মে এনে স্থাপনার মাধ্যমে। একই বছরের রিপোর্টে 'পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন' অধ্যায়েও এই সংবাদটি আছে (যা আগে বলা হয় নি)— "It will appear that the variation in the number of the Primary Schools, as compared with the previous year, was due to (1) the amalgamation of two pathsalas into a model Agricutltural School, (2) the conversion of a boys' school into a Girls' School, (3) the raising of a pathsala to the status of a Lower Vernacular School." (page - 420).

এক্ষেত্রে model Agricultural School বলতে কাশীপুর ফার্ম-এর স্কুলটির কথা বলা হচ্ছে। তাই এটা স্পষ্ট যে, কাশীপুরের এই মডেল স্কুলটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে, স্থাপিত হয় নি, এর উৎস পূর্বতন দুটি পাঠশালা, যাদের প্রতিষ্ঠাকাল অজানা হলেও এটা ধরে নেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, আলোচ্য স্কুলটির ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও তার প্রতিষ্ঠাকাল আরো আগের, যা কাশীপুরের একত্রে মিলে যাওয়া দুটি পাঠশালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই এই স্কুলের অস্তিত্বকাল শতবর্ষেরও বেশি।

ধলেশ্বরের অন্যতম প্রাচীন নিবাসী ডাঃ জগদীশ দত্ত ছোটবেলা থেকেই এই স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে এই লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি বা তাঁর ভাইয়েরাই শুধু এই স্কুলে পড়েন নি, তাঁর কাকারাও এই স্কুলে পড়েছেন। তিনি কাকাদের কাছ থেকে জেনেছেন যে, মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর উৎসাহেই স্কুলটি স্থাপিত হয়। তিনি যখন এই স্কুলে প্রথম ভর্তি হন, তখন স্কুলটি কাশীপুরেই ছিল। ঐ সময়ে কাশীপুর, তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ছাত্র এবং ধলেশ্বরের কিছু কিছু ছাত্র ঐ স্কুলে পড়ত। তিনি তাঁর কাকার মুখে শুনেছেন, পাকা ভিটের ঘরে এই স্কুলটি বসত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পর অনুৎসাহে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা শুধু কমেই যায় না, এক অগ্নিকান্ডে তা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এরপর সামান্য উত্তরে কাঁচা ভিটের ছন-বাঁশের ঘরে স্কুলটি চলে আসে। জগদীশ দত্ত মহাশয় এই ঘরেই প্রথমে পড়েছেন।

এরপর কিভাবে স্কুলটি কাশীপুর থেকে ধলেশ্বর এলাকায় চলে আসে, সে সম্পর্কে তিনি একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। তিনি এই স্কুলে পড়ার সময় এক গ্রীষ্মের বন্ধের পর দেখা যায় যে, স্কুলগৃহে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে, যাতে পচন ধরেছে। এই মৃতদেহকে ঘিরে ছাত্ররা ঐ ঘরে পঠন-পাঠনে অনীহা প্রকাশ করে। একে তো ছাত্র কম, তার উপর এই সমস্যার জেরে কামিনীকুমার সিংহ-এর উদ্যোগে স্কুলটি ঠাকুর কুমুদবন্ধু সিং-এর মণিপুরী নাটমন্দিরে চলে আসে। ডাঃ জগদীশ দত্ত মহাশয় স্কুলটিকে 'কাশীপুর নিম্ন-বাংলা স্কুল' বলেই জানতেন। ধলেশ্বর নাটমন্দিরে আসার সময় স্কুলে দু'জন শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর স্মরণে আছে। যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁর নাম আবদুল আলিম। তৎকালীন সময়ে এই শিক্ষক ম্যাট্রিক পাশ যে ছিলেন, তা দত্ত মহাশয় জানাতে ভুলেন নি। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম ছিল শ্রীযুক্ত শশী ব্যানার্জী (উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক জয়নগর নিবাসী তারাপদ ব্যানার্জীর পিতা)। পরে কামিনীকুমার সিংহ মহাশয় এক কাণি জায়গা স্কুলের জন্য দান করলে সেখানে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানে স্কুলটি এখন বর্তমান আছে,তবে এর পরিসর আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাশীপুর ফার্ম (অর্থাৎ বর্তমানে রেশম বাগান) থেকে স্কুলটি ধলেশ্বরে আসার পরই তার নাম পাল্টে যায়। আলোচ্য স্কুলটির কাশীপুর ফার্ম (রেশমবাগান) থেকে স্থানান্তরণের বর্ণনায় ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরীর সঙ্গে ডাঃ জগদীশ দত্ত মহাশয়ের একটি ক্ষেত্রে অমিল দেখা যাচ্ছে। ডঃ গণ চৌধুরী তাঁর "আগরতলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে কামিনীকুমার সিংহের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনায় অবশ্যই সিংহ মহাশয়ের পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন , তা নিশ্চিত বলা যায়। আবার ডাঃ জগদীশ দত্ত নিজে এই স্কুলের ছাত্র হওয়ায় তাঁর বর্ণনার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে বার্ধক্যের প্রভাবের কথাও এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। তবে যাই হউক, এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া স্কুল স্থানান্তরের অন্যান্য বর্ণনা হুবহু এক। কাজেই, কাশীপুর ফার্মের স্কুলটিই যে বর্তমানের ধলেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাতে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাঃ জগদীশ দত্ত আরো বলেছেন যে, নাট মন্দিরে বছরখানেক থাকার পর বর্তমানে তরুণ সংঘ সংলগ্ন স্থানে চলে আসে। অবশ্য এরপর বিদ্যালয়ের বিবর্তনের চিত্রটি তিনি সঠিক বলতে সক্ষম হন নি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ত জানিয়েছেন যে, তিনি যখন এই স্কুলে পড়তেন তখন স্কুলটিতে সরকারী ভাবে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছিল (অর্থাৎ স্কুলটি তখন নিম্ন-বাংলা পর্যায়েরই ছিল)। তিনি আনুমানিক ১৯৪৬ সনে ইনফ্যান্ট ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েছিলেন। তবে এই পঞ্চম শ্রেণীটি ছিল প্রাইভেট অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ক্লাসটি চালু ছিল। এরপর কোনো একসময় বিদ্যালয়টি নিম্ন-বুনিয়াদী (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

ধলেশ্বর স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন যে, তিনি এই স্কুলে আনুমানিক ১৯৫৮ সনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন বিদ্যালয়টি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। তাই এর আগেই যে সরকারী ভাবে বিদ্যালয়টি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা স্পষ্ট। কখন বিদ্যালয়টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল, তা শ্রীযুক্ত ভৌমিক স্পষ্ট বলতে পারেন নি। তবে এই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রথম ব্যাচ যে ১৯৮৩ সনে বেরিয়েছিল, তা ভৌমিক মহাশয়ের স্পষ্ট মনে আছে। এই হিসেবে বিদ্যালয়টি ১৯৮১ সনে হাই স্কুলে উন্নীত হয়েছিল, তা বলা যায়। ১৯৮৯ সনে বিদ্যালয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রমের জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পেলেও স্থানাভাবে তা চালু করা যায় নি বলে শ্রীযুক্ত ভৌমিক জানিয়েছেন। কারণ, তিনি ঐ সময়েই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্কুলের পুরানো ঘরের পশ্চিমে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত হওয়ার পরই ১৯৯৪ সন থেকে বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের ক্লাস চালু হয় এবং ১৯৯৬ সনে বিদ্যালয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম ব্যাচ বসে। স্কুলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ঐ স্কুলেরই শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবাশীষ দে মহাশয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় (ঐ সময়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে ছিলেন না) জানা যায় যে, বিদ্যালয়ে ৪৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ৭৫৭।

২৩. খোয়াই গভঃ গার্লস এইচ. এস. স্কুল, খোয়াই

এই স্কুলেরই বর্তমান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রিয়তোষ ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, শ্রীযুক্ত ঘোষের মাতা ঁসাধনা রানী দেব (ঘোষ) রাজন্য আমলের শেষভাগে এই স্কুলে পড়তেন। তখন স্কুলটি এম.ই. অর্থাৎ মধ্য ইংরেজী পর্যায়ের ছিল। তাঁর সহপাঠিনী গৌরী সরকার (বর্তমানে কলিকাতায় বসবাসরতা) এই স্কুলে পাঠ সমাপনান্তে খোয়াই গভঃ বয়েজ স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় দেন। তিনি পরে এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পদে উন্নীত হওয়ার পর আশির দশকে অবসর গ্রহণ করেন বলে শ্রীযুক্ত ভৌমিক জানিয়েছেন।

রাজ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ইলা লোধের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, তিনি এই খোয়াই গার্লস স্কুলে পড়েছেন। তখন স্কুলটি এম.ই. পর্যায়ের (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) ছিল। ঐ সময়ে খোয়াই গভঃ হাই স্কুলে (বর্তমানের খোয়াই গভঃ বয়েজ এইচ. এস. স্কুল) সকালে মেয়েদের জন্য সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হতো। এই ক্লাসগুলি প্রাইভেট পর্যায়েই হতো, কারণ তিনি এর জন্য ২ (দুই) টাকা করে বেতন দিতে হতো বলে জানিয়েছেন। প্রাইভেট পর্যায়ের এই উদ্যোগে প্রচুর ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করত বলেও ডাঃ

ইলা লোধ জানিয়েছেন। তাঁর সময়েই খোয়াই গভঃ হাইস্কুলে নবম শ্রেণী থেকে কো-এডুকেশন এবং খোয়াই গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস সরকারী ভাবে চালু হয়। তিনি ১৯৫৭ সনে খোয়াই গভঃ হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন এবং এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে শিলচর চলে যান। তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ১৯৫৫ সনে খোয়াই গার্লস স্কুলটি জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

শ্রীযুক্ত প্রিয়তোষ ঘোষ ১৯৫৯ সনে স্কুলটি হাইস্কুলে উন্নীত হয় বলে জানিয়েছেন। তিনি এর স্বপক্ষে বিদ্যালয়ের একটি প্রাচীন অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার-এর উল্লেখ করেছেন। যাই হউক, বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই গভঃ হাই স্কুলে নবম শ্রেণী থেকে যে কো-এডুকেশন চালু ছিল, তা লোপ পেয়ে স্কুলটি বয়েজ স্কুলে পরিণত হয়।

বর্তমানে খোয়াই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি যেখানে অবস্থিত, সেখানেই আগে টিনের ছাউনি বাঁশের বেড়ার ঘরে গার্লস স্কুলটি চালু ছিল। খোয়াই গভঃ বয়েজ স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার পরই ১৯৬৯ সনে বর্তমান জায়গায় চলে আসে বলে শ্রীযুক্ত ভৌমিক জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য এই যে, Tripura District Gazetteers-এ ত্রিপুরার স্কুলগুলি সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া আছে, তাতে ১৯৬৩-৬৪ সনে খোয়াই শহরে একটি হাইয়ার সেকেন্ডারী ও দুটি হাইস্কুল ছিল বলে দেখানো হয়েছে। কাজেই ঐ সময়ের আগেই গার্লস স্কুলটি যে হাইস্কুলে পরিণত হয়েছিল, তার সমর্থন মেলে।

শ্রীযুক্ত ঘোষ আরো জানিয়েছেন যে, বর্তমানে স্কুলে ২ জন শারীর শিক্ষক সহ ৩০ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্রীসংখ্যা ৮০০-এর কাছাকাছি। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রমে মানবিক শাখা প্রথম থেকেই চালু আছে, ২০০৫ সনে বিজ্ঞান শাখাও চালু হয়েছে।

২৪. গোলধারপুর আর. এস. এইচ. এস. স্কুল, কৈলাসহর

স্কুলের পুরো নাম গোলধারপুর রুদ্র সিংহ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। এই স্কুলের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মারফতে কৈলাসহরের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে শুধুমাত্র স্কুলের বিবর্তনের চিত্রটি তুলেই ক্ষান্ত হন নি, এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রাজন্য আমলে স্কুল সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্যও তাঁর পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এজন্য শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয়ের কাছে লেখক আন্তরিক ভাবে ঋণী। গোলধারপুর গ্রামে চৌধুরী পাড়ার চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে বিদ্যালয়টি সূচনা থেকেই জড়িত বলে শ্রীযুক্ত অর্জুন

সিংহ মহাশয়ের পত্রে জানা যায়। এই চৌধুরী পরিবার একশত উনসত্তর বছর অথবা তার ও আগে এখানে বসবাস শুরু করেন। শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয় বিদ্যালয়টি সম্পর্কে যে বহুল প্রচলিত ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন, তা নিম্নরূপ—

১) স্কুলটি প্রথমে পাঠশালা পর্যায়ে ছিল, ১৮৭২ সনের আগেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২) পরবর্তী সময়ে (১৯০৩ সনের পূর্বে) স্কুলটি নিম্ন-বাংলা (চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত) পর্যায়ে উন্নীত হয়।

৩) ১৯৩৯ সনে চৌধুরী পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তি রুদ্র সিংহের নামে স্কুলের নতুন নামকরণ হয় এবং একই সঙ্গে তা এম.ই. অর্থাৎ মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়। স্কুলটি তখন থেকে গোলধারপুর রুদ্র সিংহ এম.ই. স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪) রাজন্য আমলের পরেও কিছু সময় স্কুলটি এম.ই. পর্যায়েই থেকে যায়। ১৯৫৮-৫৯ স্কুলটি এম.ই. (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) পর্যায় থেকে নিম্ন বুনিয়াদী বা জুনিয়র বেসিক (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

৫) ১৯৬৫-৬৬ সন নাগাদ স্কুলটি উচ্চ বুনিয়াদী বা সিনিয়র বেসিক (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুলে উন্নীত হয়।

৬) ১৯৮৯ সনে বিদ্যালয়টি হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

৭) ২০০৭ সনে স্কুলটি বর্তমান পর্যায়ে অর্থাৎ গোলধারপুর রুদ্র সিংহ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রী অর্জুন সিংহ মহাশয় জানিয়েছেন যে, এম.ই. পর্যায় থেকে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিবর্তনের সঠিক সন-তারিখ এই বিদ্যালয় অথবা স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস-এর কোথাও পাওয়া যায় নি। তাই তিনি এই অঞ্চলের ঐ সময়কার ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

যার নামে এই স্কুলটির নামকরণ হয়, শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় তাঁর সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিয়েছেন। রুদ্র সিংহের জন্ম ১৮৭৭ সনের ২রা অক্টোবর। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে কৈলাসহরের যুবরাজ স্কুলে (বর্তমান আর. কে. আই) এবং পরে ধর্মনগরের ফটিগুলি স্কুলে (বর্তমান বি. বি. আই) শিক্ষকতা করেন। ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩-০৪) সনে নিজ বাড়িতে স্থাপিত গোলধারপুর নিম্ন-বাংলা স্কুলে হেড পন্ডিত হিসেবে যোগদান করেন এবং এই স্কুল থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। অঙ্কে তাঁর বিশেষ দখল ছিল।

এই চৌধুরী পরিবারেরই এক উত্তরসূরী শ্রী বিশ্বেশ্বর সিংহ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান

শিক্ষক) স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন যে, তিনি স্কুলটির নিম্ন-বাংলা ও এম. ই. উভয় পর্যায়েই পড়াশুনা করেছেন। তখন রুদ্র সিংহ চৌধুরী এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের যেমন আদর করতেন, আবার তেমনি কঠোর শাসনও করতেন। কোনো ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করে ছাত্র/ছাত্রীটিকে বুঝিয়ে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর এই নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে তিনি এলাকায় বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। এই চৌধুরী পরিবার এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। রুদ্র সিংহের পুত্রবধূ শ্রীমতি কমলাদেবী জানিয়েছেন যে, লালুকর্তা একবার চৌধুরীবাড়ীতে আসেন, তখন রুদ্র সিংহ এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাধবলাল চট্টোপাধ্যায়।

স্কুলটির রুদ্র সিংহের চৌধুরীর নামে নামকরণের ইতিহাস দু'জন প্রাচীন ব্যক্তির স্মৃতিচারণায় শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয় জানতে পেরেছেন।এদের উভয়েরই একই নাম। একজন হচ্ছেন কৈলাসহরের কীর্তনতলীর শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহ (অবসরপ্রাপ্ত সমবায় উপ-নিয়ামক) এবং আরেকজন হচ্ছেন গোলধারপুরের শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহ। প্রথমোক্ত গোপীমোহন সিংহ ঐ নামকরণের সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় জন তৎকালীন ছাত্র ছিলেন।

১৯৩৯ সনে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের শিক্ষামন্ত্রীর কৈলাসহরে আগমন কালে গোলধারপুর নিম্ন-বাংলা স্কুলটি পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত এক সভায় রুদ্র সিংহ চৌধুরী তাঁদের এই পারিবারিক প্রচেষ্টায় পালিত স্কুলটিতে শিক্ষামন্ত্রী রাণা বোধজং-এর নামে উৎসর্গ করতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রুদ্র সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহীতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই স্কুলটিকে রুদ্র সিংহ মহাশয়ের নামে শুধুমাত্র নামকরণই করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটিকে মধ্য ইংরেজী অর্থাৎ এম.ই. স্কুলে উন্নীত করেন।

সময়ের প্রবাহে স্কুলটি একাধিকবার স্থান পরিবর্তন করে। শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয় পত্রে লিখেছেন— "স্কুলটির আদিরূপ 'পাঠশালা' পুকুরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ছিল। অনুমান, 'এম.ই.' স্কুলে উন্নীত হওয়ার পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রিঃ স্কুলটি পুকুরের উত্তর পাড়ে স্থানান্তরিত হয় (বর্তমান বিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত)।"

সর্বশেষে তিনি লিখেছেন— "সমস্ত এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এবং বিভিন্ন সময়ে যারা এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন তাদেরও সঙ্গে স্কুলটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি, মত বিনিময়ও হয়েছে— নির্যাসটুকু নিয়ে সহমত পোষণ করেছি তারপর তথ্যের আকারে সাজিয়েছি— মনে এই ভয় ছিল যেন তথ্য বিকৃতি না ঘটে— সাবধানতা অবলম্বন করেছি....."।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কিলিকদার মহাশয় জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রাথমিক

বিভাগে মোট ৫ জন অর্থাৎ ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষিকা আছেন। এই বিভাগে মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ১২২ (ছাত্র— ৬৬ ও ছাত্রী — ৫৬)। মাধ্যমিক বিভাগে প্রধান শিক্ষক ও ১ জন শারীর শিক্ষক সহ সর্বমোট ১৮ জন শিক্ষক আছেন (১৪ জন শিক্ষক, ৪ জন শিক্ষিকা), ছাত্র/ছাত্রীসংখ্যা সর্বমোট ২৩৮ (ছাত্র-১১৮ এবং ছাত্রী - ১২০)।

লেখকের মন্তব্য ঃ উপসংহারে শ্রীযুক্ত অর্জুন সিংহ মহাশয়ের উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, এই স্কুলের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, যা তাঁর ইতিহাসমনস্কতার প্রমাণ দেয়। এইজন্য সিংহ মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। সিংহ মহাশয়ের চিঠি থেকে বুঝা যায় যে, স্কুলটি প্রথম দিকে মূলত চৌধুরী পরিবারের আনুকূল্যেই পরিচালিত হত এবং তাদের প্রচেষ্টাতেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে এই চৌধুরী পরিবার গোলধারপুর গ্রামে ১৮৪০ খ্রিঃ অথবা তারও আগে বসবাস শুরু করেন। তাই স্কুলটি ১৮৪০ খ্রিঃ অথবা তারপর যে কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেরও আগে এই স্কুলটি পাঠশালা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে সিংহ মহাশয় জানিয়েছেন, তবে ১৮৭৭ -৭৮ সনের আগে বিদ্যালয়টির সরকারী ভাবে নথীভুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না, কারণ সে বছরই সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ৬ থেকে ১৮-তে দাঁড়ায়। ঐ সময়ে অথবা সামান্য পরেই স্কুলটির সরকারী অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

২৫. বিশালগড় টাউন গার্লস হাইস্কুল, বিশালগড়

সংশোধনী ঃ বিশালগড়ের এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল লেখক পরোক্ষ অনুমানের ভিত্তিতে ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ বর্ষে বলে পূর্বের আলোচনায় উপসংহার টেনেছিলেন। অথচ এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠার বছর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে যা অনবধানতার কারণে লেখকের অগোচরে থাকে, এই অমার্জনীয় ত্রুটির কারণে লেখক ক্ষমাপ্রার্থী। বিশালগড়ের এই স্কুলটি ১৮৭৬ খ্রিঃ সনে (অর্থাৎ ১৮৭৬ -৭৭ খ্রিঃ বর্ষে) স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট C.W. Bolton (ঐ সময়ের পলিটিক্যাল এজেন্ট T. E. Coxhead. হলেও পরবর্তী এজেন্ট Bolton রিপোর্টটি লিখেন) লিখেছেন— "New patshalas have been established at Bisalghar and old Agartala, and a girl's as well as boys patshalas has been opened at the Christian village of Mariamnagar." (Administration Report of the Pol. Agency, Hill Tipperah (1872-1878), Vol-I, page - 104)। কাজেই স্কুলটি এই বছরে (২০০৯ খ্রিঃ) ১৩৩ বছর পূর্ণ করেছে, তা নিশ্চিত বলা যায়।

২৬. পুরাতন আগরতলা এইচ. এস. স্কুল, সদর

এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলোচনায় কোনো সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ দেওয়া হয় নি। এটি লেখকের অনবধানতার কারণেই ঘটেছে, যা পূর্ববর্তী স্কুলের (বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল) ক্ষেত্রে সংশোধনীতে বলা হয়েছে। ১৮৭৬-৭৭ বর্ষের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট এই যে, এই সালেই অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কাজেই বিশালগড়ের স্কুলটির মতোই এই স্কুলটি ১৩৩ বছর পূর্ণ করেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এই স্কুলটি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নি। ধলেশ্বরের স্কুলটি নিয়ে গত ৯ জুলাই, ২০০৯ ইং তারিখে এলাকার অন্যতম প্রাচীন নিবাসী ডাঃ জগদীশ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গক্রমে পুরাতন আগরতলার স্কুলটির কথা এসে পড়ে। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৩৬ সনে ধলেশ্বর স্কুলটি কাশীপুর থেকে ধলেশ্বর মণিপুরী নাটমন্দিরে চলে আসে। তিনি স্কুলটির এই স্থানান্তরণের সময় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। স্কুলটি নাট মন্দিরে আসার পর পুরাতন আগরতলা স্কুল থেকে ৫/৬ জন করে ছাত্র এসে এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হতে দেখেছেন। ফলে তিনি ঐ সময়ে পুরাতন আগরতলার স্কুলটি পাঠশালা পর্যায়ের (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত) ছিল বলে অনুমান করেন। তবে এই সঙ্গে একথাও তিনি জানাতে ভুলেন নি যে, কাশীপুরে স্কুলটি থাকা অবস্থায় তিনি কখনও পুরাতন আগরতলার স্কুল থেকে এই স্কুলে ছাত্র ভর্তি হতে দেখেন নি। সম্ভবত ঐ সময়ে স্কুলটির দৈন্যদশাই এর কারণ ছিল।

২৭. বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কৈলাসহর

লেখকের পত্রের জবাবে অতি সম্প্রতি (৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং) বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি তরফদার মহাশয়ের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসের একটা যথাসম্ভব চিত্র লেখকের হাতে পৌঁছেছে। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, মাননীয় তরফদার মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের অতীত সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এর জন্য মাননীয় মৃণালকান্তি তরফদার মহাশয়ের কাছে এই লেখক অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় লিখেছেন, "কৈলাসহরের অতি সন্নিকটে বিদ্যানগর গ্রাম। বর্তমানে কৈলাসহর নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সালটা আনুমানিক ১৮৮৫ ; তখন বিদ্যানগর গ্রামে দুটি L. P. বিদ্যালয় ছিল। একটি ছেলেদের, অন্যটি মেয়েদের। ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন গোনমণি (গুণমণি ?) সিংহ এবং মেয়েদের বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন জানকী

দেবী। জানকী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমা কন্যা মোহিনী দেবী শিক্ষিকা হন।

আনুমানিক ১৯৩৫ সালের পর মোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টি বিদ্যানগর গ্রাম থেকে বর্তমান পাইতুর বাজারের নিকটে পদ্মের পাড়ে স্থানান্তরিত হয়। কারণ ঐ বিদ্যালয়ে মোহিনী দেবী ছাড়া আরেক জন শিক্ষিকা ছিলেন— চন্দ্রকলা রাজকুমারী। তাঁর বাড়ি পদ্মের পাড়। তাই তাঁর সুবিধার্থে, বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যাই হোক, বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হলেও বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হয় নি।... পাইতুর বাজারের নারায়ণ দত্ত নামে এক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি পদ্মের পাড়ে তাঁর জায়গাতে একটি ছোট্ট পরিসরে স্কুলবাড়ি তৈরি করে দেন। (তখন) বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন চন্দ্রকলা রাজকুমারী এবং একজন শিক্ষক ছিলেন— রতনমণি সিন্হা। রতনমণি সিন্হার শিক্ষাগত যোগ্যতা একটু বেশি থাকায় পরে তিনি অন্যত্র চলে যান। তারপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন — চন্দ্রকলা রাজকুমারী এবং আরেক জন শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন— তাঁর নাম যামিনী দেবী সিংহ। ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল— বিদ্যানগর টাউন পাঠশালা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩০-৩৫ জন। ঐ সময়ের ছাত্রদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তাঁরা হলেন নৃপেশ দত্ত (ভবেশ), হরিপদ দত্ত, খোকা দত্ত, প্রহ্লাদ দত্ত। তাঁরা ১০-১১ বৎসর পূর্বে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। ছাত্রদের বক্তব্য অনুযায়ী ঐ সময়ে স্কুলটি খুব ভালো চলতো এবং কৈলাসহরের ভালো ছাত্ররা ঐ স্কুলে পড়াশুনা করত। তাঁরা প্রধান শিক্ষিকাকে 'গুরু মা' বলে সম্বোধন করতেন।

স্কুল পরিচালনা করার জন্য একটি স্কুল পরিচালন কমিটি ছিল— পরিচালন কমিটির সভাপতি ছিলেন— ডঃ যোগেন্দ্র দত্ত, সচিব ছিলেন— নগেন্দ্র দত্ত। নরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিও এই পরিচালন কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— তাদের তিনজনকে একত্রে 'ত্রয়ী' বলা হত।

একবার স্কুলটি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে কিছুদিনের জন্য পাইতুর বাজারের অনতিদূরে জিতুর দীঘির পাড়ে বাবুচাঁদ শর্মার মন্ডপে স্থানান্তরিত হয়। পরে অবশ্য নিজস্থানে ফিরে আসে।

ঐ সময়কার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যামিনী দেবী সিং এখনও জীবিত। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী— তিনি যখন শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৪৭-৪৮ সালে, তখন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল Class-VI (ষষ্ঠ শ্রেণী)। পরে অবশ্য তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মেট্রিক পাশ করেছেন। তখন মেট্রিক পরীক্ষা আগরতলা গিয়ে দিতে হত। যামিনী দেবী সিংহকে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগপত্র দেন রাণা বোধজং।

১৯৪৭-৪৮ সালে স্কুলটি Primary স্তরে উন্নীত হয়, তখন যামিনী দেবী সিং প্রধান শিক্ষিকা এবং নীলিমা পাল শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন।....... সম্ভবত ১৯৫৭ -৫৮ সালে বিদ্যালয়টি

upper primary স্তরে উন্নীত হয়। ঐ সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন পুররঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী। ১৯৬০ ইংরেজীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ৫টি মডেল এস.বি. স্কুলের মধ্যে বিদ্যানগর একটি। তখন ঐ বিদ্যালয়গুলি সরাসরি প্রশাসনের অধীনে ছিল।

১৯৬৫-৬৬ সালে বিদ্যালয়টি বিজ্ঞান বিভাগ সহ হায়ার সেকেন্ডারী স্তরে (একাদশ শ্রেণী) উন্নীত হয়। কিছুদিন পর প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, তাঁর সময়ে বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।.....

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তারপর ১৯৮৯ সালে বিদ্যালয়টি (১০ + ২) অর্থাৎ দ্বাদশ স্তরে শুধু কলা বিভাগ দিয়ে শুরু হয়।"

শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় আরো জানিয়েছেন যে, বর্তমানে স্কুলটিতে প্রধান শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে (I - IV) ৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, ছাত্রসংখ্যা ২৫০ আর দুপুরের বিভাগে (VI-XII) শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২৩ জন, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪২৫ জন। এছাড়া একজন শারীরশিক্ষক ও ৫ জন অশিক্ষক কর্মচারী আছেন।

২০০৯ সাল থেকে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার অনুমোদন পাওয়া গেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এ ছাড়াও চিঠিতে এই স্কুলের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরনাম করেছেন। তাঁর নাম নিমাইচাঁদ সিংহ। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় লিখেছেন— "..... যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তিনি নিমাইচাঁদ সিংহ। কারো মতে তিনি বিদ্যানগর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, তবে এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে এটা ঠিক যে, নিমাই চাঁদ সিংহ জানকী দেবীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ী বিদ্যানগর গ্রামে এবং তিনি রামকমল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যানগর গ্রাম থেকে বিদ্যানগর স্কুল বর্তমান ঠিকানায় আসার ক্ষেত্রে এবং এই বিদ্যালয়ের সরকারী অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে নিমাইচাঁদ সিংহের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।"

লেখকের মন্তব্য ঃ শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় স্কুলটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে ১৮৮৫ খ্রিঃ সনটির উল্লেখ করেছেন। তবে চিঠিতেই স্পষ্ট যে, এই সনটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল নয়। এ প্রসঙ্গে ২০০৩ ইং সনের ৯ আগস্ট তারিখের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'শিক্ষার আলোক-বর্তিকাকে প্রথমে তুলে ধরেন জানকী দেবী-ই' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্য আমাদের বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে ধারণা অধিক পরিস্ফুট করে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তথ্য থেকে সামান্য পরিবেশন করেছি। এই বিদ্যালয় সম্পর্কিত শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তথ্য হুবহু প্রকাশ করলে পাঠক এ বিষয়ে অধিক

জানতে পারবেন বলেই মনে হয়। প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "মৌন অতীতকে মুখর করা বড় কঠিন। ..... যোগসূত্রটা অনেক সময় হারিয়ে যায়। খুব সম্ভব এই হারানো ঐতিহ্য মন্থন করে অমৃতের সন্ধান প্রথম এনে দেন শ্রীযুক্ত জানকী দেবী (বিদ্যানগর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শারীরশিক্ষক শ্রীযুক্ত খুমল কে পি সিন্‌হা মহাশয়ের পিতামহীর মা)। সময়টা পরখ করা বড় কঠিন। প্রায় ১৮৭০ (± ১০) ইং হবে। মহারাজা তখন শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর - ত্রিপুরায় আধুনিকতার ছোঁয়া আনার প্রথম পথিক। কৈলাসহর তখন ত্রিপুরার মানচিত্রে মোটামুটি একটি গ্রামই। তা প্রশাসনিক দিক থেকে একটি উপ বিভাগ সবেমাত্র ঘোষণা হয়েছিল।

যদ্দুর মনে হয়, জানকী দেবীই শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রথমে তুলে ধরেন। তাঁহার শিক্ষাঙ্গন ছিল বিদ্যানগরে। না অঙ্ক, ভূগোল বা ইতিহাস নয়— ছিল রামায়ণ, মহাভারত ভাগবতের কাহিনী শিক্ষা দেওয়া— জীবনটাকে ধর্মের একটা বর্ম দিয়ে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য। কাহিনী জানা ও অন্যকে জানানোর জন্য কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাই এলো লিখা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণবোধ (বর্ণ পরিচয় ?) তখন চালু হয়েছে। ধারাপাতও তখন শিক্ষাধারার অন্যতম বাহক গ্রামে-গঞ্জে কিছুটা হয়ে গিয়েছে। অতএব কাহিনীগুলির সঙ্গে একই সাথে এলো অ, আ, ক, খ, এলো ১-২-৩-৪ শেখা। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যানগর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জানকী দেবীর গৃহ প্রাঙ্গণে এসে পড়াশুনা করতো।

পরে তৎসংলগ্ন শ্রীযুক্ত গোপীচাঁদ সিংহ (উকীল) মহাশয়ের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে একটি কাঁঠালবট তলায় ছন-বাঁশের তৈরি চৌচালা ঘরে পাঠদান কাজ চলতো। বর্তমানে একটি রাস্তার পাশে পুকুরপাড়ে শ্রীযুক্ত অমিয় সিন্‌হা, শ্রীযুক্ত রণবীর সিন্‌হা প্রমুখ জানকী দেবীর প্রপৌত্রেরা বাস করছেন। জানকী দেবীর এই স্কুলটি কালক্রমে একাধিক জায়গায় স্থান পরিবর্তনের পর নিম্ন-বঙ্গ বিদ্যালয় (সরকারী), Junior Basic, Senior Basic, High, Higher Secondary হলে পর বর্তমান Vidyanagar Higher Secondary School হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান এই স্থানে প্রথম ঘরটি তৈরি হয় শ্রীযুক্ত নিমাই চাঁদ সিন্‌হা মহাশয়ের দানকৃত ভূমির উপর (সংবাদটির নথিভিত্তিক প্রামাণ্য কোনো তথ্য পাইনি)। পরে আরো একাধিক ব্যক্তি জমি দান করলে পর স্কুলটির বর্তমান বিশাল চত্বর হয়।"

১৮৭২ খ্রিঃ সনে কৈলাসহর বিভাগের সৃষ্টি হয়, তাই শ্রীযুক্ত হরিপদবাবুর বর্ণনা অনুসারে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল এর অব্যবহিত পরে। কিন্তু কৈলাসহরে শিক্ষার প্রথম আলোক জানকী দেবীই প্রথম দেখান বলে হরিপদবাবুর দাবী। তিনি আরো লিখেছেন— "জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে জানকী দেবী যখন আলো দেখাচ্ছেন, সমসাময়িক কালে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী আরেক জন এগিয়ে আসেন। ইনি .... মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক

সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়।" অর্থাৎ জানকী দেবীর পরই শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ বাবু যুবরাজ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুবরাজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ সনের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাস। কাজেই বিদ্যানগর স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল অবশ্যই এর আগে হতে হবে (হরিপদবাবুর তথ্য অনুসারে)। হরিপদবাবু এই তথ্যের উৎস উল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না, তিনি এইসব তথ্যের অধিকাংশই জানকী দেবীর প্রপৌত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ খ্রিঃ সন ধরে নিলে কোনো অন্যায় হয় না।

শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় তাঁর চিঠিতে ১৮৮৫ খ্রিঃ সন নাগাদ বিদ্যানগর গ্রামে দুটি স্কুলের উল্লেখ করেছেন। এদের একটি ছেলেদের স্কুল, যা শ্রী গুণমণি সিংহ চালাতেন আর মেয়েদের স্কুলটি শ্রী জানকী দেবী চালাতেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিপদবাবুর তথ্য অনুসারে জানকী দেবীর স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই পড়ত, তিনি অন্য স্কুলটির কোনো উল্লেখ করেন নি। এই দ্বিতীয় স্কুলের বিষয়ে শ্রীযুক্ত তরফদারের কাছে জানতে চাইলে টেলিফোনিক বার্তায় তিনি জানান যে, পরে উভয় স্কুল একত্রে মিলে কো-এডুকেশন স্কুলে পরিণত হয়।

স্কুলের বর্তমান স্থানের জমিটি কার দানকৃত ছিল সে বিষয়েও দুই তথ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। শ্রীযুক্ত তরফদারের মতে, জমিটি নারায়ণ দত্তের, আবার হরিপদবাবুর মতে তা নিমাইচাঁদ সিংহের। এ বিষয়ে আরো স্পষ্টতা প্রয়োজন।

জানকী দেবীর মেয়ে মোহিনী দেবী এই স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ করেন বলে শ্রীযুক্ত তরফদার জানিয়েছেন। কিন্তু হরিপদবাবুর মতে, মোহিনী দেবী কৈলাসহরের বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য দ্বারা নিযুক্ত হন (এ বিষয়ে 'কৈলাসহর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়' সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এটা খুবই সম্ভব যে, মোহিনী দেবী প্রথমে বিদ্যানগর স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন, পরে সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। অথবা উল্টোটাও হতে পারে।

শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় কারো মতে নিমাইচাঁদ সিংহ এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্কুলটির বর্তমান স্থানে আসা ও সরকারী অনুমোদনের জন্য নিমাই চাঁদ সিংহ মহাশয়ের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তদুপরি যদি শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তথ্যানুসারে এই স্থানে স্কুলের জন্য জমি দানে নিমাইচাঁদ সিংহের অংশগ্রহণ থাকে তবে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের মনে এই ধরনের ধারণার জন্ম যে সম্ভব তা আমরা আগেও দেখেছি।

শ্রীযুক্ত তরফদার ১৯৪৭-৪৮ সনে স্কুলটির প্রাইমারী ও ১৯৫৭-৫৮ সনে upper প্রাইমারীতে উন্নীত হওয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু তৎকালীন রীতি অনুসারে এই ধরনের নামকরণ (বিভিন্ন

স্তরের) ছিল না। বিদ্যালয়টি এর আগে পাঠশালা পর্যায়ের ছিল। শ্রীযুক্ত তরফদার মহাশয় নিজেই তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, বিদ্যালয়টি পাইতুর বাজারের পদ্মের পাড়ে আসার পর এর নাম ছিল বিদ্যানগর টাউন পাঠশালা, অর্থাৎ তখনও বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়া হতো। তাই এটা স্পষ্ট যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি বিদ্যালয়টি প্রাইমারী স্তরে উন্নীত হয় বলে যে জানিয়েছেন তা নিশ্চিত ভাবে নিম্ন-বাংলা (L.V - Lower Verncular) পর্যায়ের, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত।

১৯৫৭-৫৮ সনে বিদ্যালয়টি upper primary স্তরে উন্নীত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে হবে নিম্ন-বুনিয়াদী (Junior Basic) পর্যায়ের অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত।

এই চিঠিতে নিমাইচাঁদ সিংহের প্রতিষ্ঠিত আরেকটি প্রাচীন স্কুলের সন্ধান পাওয়া যায়— এর নাম রামকমল স্কুল।

যাই হউক, আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিদ্যানগর স্কুলটি মূলত মণিপুরী বসতিকে কেন্দ্র করেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মণিপুরীরা যে শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন তা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিবরণী থেকেই জানা যায়। গোলধারপুর স্কুলের ক্ষেত্রেও আমরা একই ঘটনা দেখেছি। ১৮৭৮-৭৯ খ্রিঃ সনে উমাকান্ত দাস বিবরণীতে আগরতলা, বিশালগড়, বড়জইল (Berjoil) (?), কমলপুর ও কৈলাসহরে মণিপুরী বসতির উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন— 'At the expenses of the State, elementary schools have been opened in some of the Manipur Settlements, where Bengali is taught.'' এছাড়াও মণিপুরীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে ঐ সময়ে কিছু পাঠশালা ছিল, তা বিদ্যানগর ও গোলধারপুর স্কুলের উদাহরণেই স্পষ্ট, কমলপুরে ঐ সময়েই একটি বড় বাজার ছিল। কাজেই কমলপুরের স্কুলটির মণিপুরী সম্প্রদায় দ্বারা ১৮৭৮ খ্রিঃ সনের আগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

বিদ্যানগরের জানকী দেবীর এই স্কুলটি তার প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি পাক, এটাই কাম্য।

২৮. কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, খোয়াই

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খ্রিঃ) সনেও স্কুলটির অস্তিত্ব ছিল। এও আমরা দেখেছি যে, ১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫ খ্রিঃ) সনে কল্যাণপুর বিভাগের অবলুপ্তির সময় কল্যাণপুর বিভাগে ৪টি স্কুল ছিল, তাই কল্যাণপুরে বিভাগীয় কেন্দ্রে যে স্কুলটি গড়ে উঠেছিল, তার অস্তিত্বের বিলোপের কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে না। তাই ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে যখন আমরা রামকুমার বোর্ডি স্কুল নামে কল্যাণপুরে একটি নিম্নবাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হতে দেখি, তখন বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে, কল্যাণপুরের ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ঐ স্কুলটি পাঠশালা পর্যায় থেকে ঐ বছরেই নিম্নবাংলা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে— "A new L.V. school named Ram Kumar Boarding School was started at Kalyanpur during the year on the occasion of His Highness's visit there." এই রামকুমার দেববর্মা (ঠাকুর) একজন সাধারণ জুমিয়া ছিলেন। সুধন্বা দেববর্মা তাঁর 'জাগরণের পটভূমিকা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, এই রামকুমার দেববর্মা ভাগ্য অন্বেষণে আগরতলায় এসে বিনন্দিয়া পদে ভর্তি হন। ক্রমে ক্রমে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে রাজ দরবারে ঠাঁই পান। উপজাতিদের শিক্ষায় তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। কল্যাণপুরে মহারাজার পরিদর্শনকালে প্রকৃতপক্ষে আগে থেকে চালু ঐ পাঠশালাটি দূর-দূরান্তের পার্বত্য ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং হাউস সহ একটি নিম্ন বাংলা স্কুলে উন্নীত করার ক্ষেত্রে রামকুমার দেববর্মার যে মূল ভূমিকা ছিল, তা স্কুলের নামকরণের মাধ্যমেই বুঝা যায়। এই রামকুমার দেববর্মার অবদানের ফসল খোয়াই এবং আগরতলায় দুটি ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস। 'জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা এই অবদানের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

পরবর্তী বছরগুলিতে এই রামকুমার বোর্ডিং-এর বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায়। ১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বোর্ডিং-এর ছাত্রদের সকাল ও বিকালে কোচিং-এর জন্য দুইজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে, এদের একজনের উপর বোর্ডিং-এর ছাত্রদের দেখাশুনা এবং বোর্ডিং পরিচালনার ভারও ন্যস্ত হয়েছিল। রাজন্য আমলে বিভিন্ন সময়ে বোর্ডিং-এর ছাত্রসংখ্যা কত ছিল, তা নীচে টেবিলে দেওয়া হল। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে এই বোর্ডিং হাউস খোয়াই শহরের বোর্ডিং হাউস-এর সমকক্ষ ছিল। এ থেকে এই স্কুলটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে।

রামকুমার বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা

সন (খ্রিঃ)	ছাত্রসংখ্যা	সন (খ্রিঃ)	ছাত্রসংখ্যা
১৯৩২-৩৩	৩২	১৯৩৯-৪০	৪৪
১৯৩৩-৩৪	৩৩	১৯৪০-৪১	৫৩
১৯৩৪-৩৫	৪০	১৯৪১-৪২	৫২
১৯৩৫-৩৬	৪০	১৯৪২-৪৩	৫২
১৯৩৬-৩৭	৫২	১৯৪৩-৪৪	৫৩
১৯৩৭-৩৮	৩০	১৯৪৪-৪৫	৫১
১৯৩৮-৩৯	৩৪	১৯৪৫-৪৬	৪৯

২৬শে এপ্রিল, ২০০৯ থেকে ২৮ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত দৈনিক স্যন্দন পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে জনশিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিমান ধর মহাশয়ের ধারাবাহিক ৯টি কিস্তি বের হয়। প্রথম কিস্তিতে কল্যাণপুরের এই স্কুলটির রাজন্য পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাস শ্রদ্ধেয় বিমানবাবু উল্লেখ করেছেন। তা থেকেই নীচে সংক্ষেপে এই ইতিহাস বিধৃত করা হলো।

শ্রীযুক্ত বিমান ধরের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির আগেই স্কুলটি নিম্ন বাংলা থেকে মধ্য-ইংরেজী (এম.ই.) স্কুলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রামকুমার বোর্ডিং স্কুলটি কখন এম.ই. স্কুলে রূপান্তরিত হয়, তা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। যদিও রাজন্য আমলের শেষভাগে, বীরবিক্রম মাণিক্যের আমলে রাজ্যের বেশ কিছু স্কুল এম.ই. পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তাদের নামের উল্লেখ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে পাওয়া যায় না। যাই হউক, তখন বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'রামকুমার এম.ই. স্কুল। ১৯৫৬ সালে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নামেরও পরিবর্তন ঘটে। তখন তার নাম হয় কল্যাণপুর জুনিয়র হাই স্কুল। পরবর্তী সময়ে উন্নীত হয়ে প্রথমে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) এবং পরে ১৯৭৬ সাল থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

তাই আগামী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি শতবর্ষ অতিক্রমণের গৌরবে যে গৌরবান্বিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৯. জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত স্কুল

আমরা আগেই দেখেছি যে, 'জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা ১) বগাফা ২) পিত্রার দেওয়ান বাড়ী ৩) তৈরূপা ৪) জলেমা ৫) বাগমা ৬) সিলঘাট, ৭) মহারানী ৮) গুলিরায় কবড়াপাড়া ৯) অমরেন্দ্রনগর ১০) হীরাপুর ১১) প্রমোদনগর ১২) উজান ঘনিয়ামারা ১৩) পাইল্যাভাঙ্গা ১৪) টাকারজলা এবং ১৫) নারায়ণখামার— এই ১৫টি স্কুল স্থাপনের কথা বলেছেন।

এছাড়া ১৩৫৬ ত্রিং সনের ২৯শে ভাদ্র (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর) 'ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির আবেদন' শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তি (জীবন চক্রবর্তী মহাশয় লিখিত 'ত্রিপুরা তিরিশ থেকে আশি' বইয়ে এর ফটোকপি দ্রষ্টব্য) থেকে জানা যায় যে, জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিক্ষাবিভাগের অনুমোদনক্রমে ১৩৫৬ ত্রিং (১৯৪৬-৪৭ইং) সনে যথাক্রমে— ১) জম্পুইজলা ২) টাকারজলা ৩) পদ্মনগর ৪) রাঙ্গাপানিয়া ৫) রামচন্দ্রঘাট (বটতলী) ৬) আঠাইবাড়ী ৭) ঈশ্বর সর্দারপাড়া ৮) সুখরায় কবড়াপাড়া ৯) বিদ্যামোহন হাজারী ১০) বেহেলাবাড়ী ১১) গোপালনগর ১২) রাধানগর ১৩) দুর্জয়নগর ১৪) চম্পকনগর

এবং ১৫) আখালিয়া ছড়া— এই স্থানগুলিতে প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়েছে (পটভূমিকা আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি — সম্পাদনা কুমুদকুন্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব, অক্ষর প্রকাশন, জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা - ৬৪)।

এই দুই তালিকায় একমাত্র টাকারজলার স্কুলটি অন্তর্ভুক্ত আছে, কাজেই জনশিক্ষা সমিতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্ততঃ ২৯টি স্কুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাজেই এদের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সন্দেহ থাকার নয়।

৩০. রাজন্য আমলে প্রাইভেট স্কুল

রাজন্য আমলে ১৩২০ ত্রিং (১৯১০-১১ খ্রিঃ) সনের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে রাজ্যে প্রাইভেট পাঠশালার প্রথম উল্লেখ থাকলেও এই রিপোর্ট থেকে মনে হয় আগে থেকেই রাজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল— "The rise of a number of private pathsalas deserves mention, as indicating the growing demand for education." ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে বিভিন্ন বিভাগে কতগুলি প্রাইভেট স্কুল ছিল এবং তাদের ছাত্রসংখ্যা এইরূপ ঃ

বিভাগ	প্রাইভেট স্কুল	ছাত্র/ ছাত্রীসংখ্যা	বিভাগ	প্রাইভেট স্কুল	ছাত্র/ ছাত্রীসংখ্যা
সদর	৩	৭৮	বিলোনীয়া	৩	৭৫
উদয়পুর	১	৪৭	সাব্রুম	০	০
কৈলাসহর	১৮	৫২৫	খোয়াই	৫	১২৩
সোনামুড়া	২	৫৭	ধর্মনগর	১২	৩৯৪
অমরপুর (উপ) ঃ	২	২২	সর্বমোট	৪৬	১৩২১

১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সনের রিপোর্টে জানা যায় যে, তখন রাজ্যে ৫১টি প্রাইভেট স্কুল ছিল, কিন্তু তাতে মোট ছাত্রসংখ্যার উল্লেখ নেই।

প্রাইভেট স্কুলগুলির নাম অথবা রাজ্যের কোন্ স্থানে অবস্থিত তা জানা না যাওয়ায় ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর এদের পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় না, তবে কোনো কোনো প্রাচীন ব্যক্তিত্বের লেখায় কিছু কিছু প্রাইভেট স্কুলের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস বর্ণনায় শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা বিলোনীয়া পরিক্রমায় রেদগা গ্রামে একটি প্রাইভেট স্কলের উল্লেখ করেছেন। এই স্কলটি রজনীকান্ত পাল নামে এক ভদ্রলোক চালাতেন।

লক্ষ্মীছড়ায় গ্রামের জনসাধারণই একটি প্রাইভেট স্কুল চালাতেন। বাইখোড়া গ্রামেও একটি প্রাইভেট স্কুলের উল্লেখ করেছেন। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ময়নামায় মাধবচন্দ্র চাকমা মহাশয়ের উদ্যোগে একটি প্রাইভেট স্কুলের উল্লেখ করেছেন। জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্মরণিকায় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী ক্ষেত্রমোহন মজুমদার জোলাইবাড়ীতে চিংলাফ্রু মগ নামে এক আদিবাসী শিক্ষকের একটি পাঠশালার উল্লেখ করেছেন। বি. কে. আই-এর শতবর্ষ স্মরণিকায় প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত আলোকবরণ পাল ১৯৫০ সাল নাগাদ মফিজ মিঞার স্কুলের উল্লেখ করেছেন, যা সম্ভবত রাজন্য আমলেই স্থাপিত। এটি বর্তমানে দক্ষিণ বিলোনীয়া স্কুল নামে পরিচিত। রাজন্য আমলের শেষে এইসব প্রাইভেট স্কুলের কিছু অংশ বর্তমানেও হয়ত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চালু আছে। আর বাকী অংশ সরকারী অধিগ্রহণের ফলে নিজের ইতিহাস খুইয়ে নতুন নামে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এইসব প্রাইভেট স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল অথবা ইতিহাস, দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। পরবর্তী কোনো উৎসাহী তরুণ গবেষকের হাতে এই পরিশ্রমসাধ্য কাজের ভার অপর্ণ করা গেল।

পরিশিষ্ট ঃ ২ - শেষকথা

অনেক চেষ্টার পরও কিছু স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে আর উঠল না। সম্ভবত, ডাকযোগের ত্রুটির কারণেই এই দুর্বলতা। তবে যেসব স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে, তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তবে সবক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কেউ সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম হন নি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, এমন তথ্যও দিয়েছেন। হাইস্কুলগুলির (রাজন্য আমলে) ক্ষেত্রে এমন ধরনের যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা খতিয়ে দেখা গেছে যে ঐ তারিখগুলি বিদ্যালয়ের হাইস্কুল অথবা ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ। প্রকৃতপক্ষে, এটি বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ ঘটনার সময়কাল, যা ঐ স্কুলে পড়ুয়া ছাত্র বর্তমানে প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। দ্বিতীয়ত, হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার সময় পুরানো কাঠামোতে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে বিদ্যালয়টিকে নতুনভাবে গড়ে নেওয়া, অথবা কাছাকাছি অন্য স্থানে স্থানান্তরণের ঘটনা ঐ সময়েই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, লোকমনে এমন ধারণার জন্ম দেয়। এম. ই. পর্যায়ের স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঐ সময়ে হামেশাই ঘটত।

রাজন্য আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাদের নিজস্ব ঠিকানা খুব কমক্ষেত্রেই ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা বাজার অথবা বাজার-সংলগ্ন স্থানে চালু থাকত। পাঠশালার নিজস্ব গৃহ থাকলেও তার অবস্থা ছিল করুণ, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজারের বাঁশের মাচার কাঠামোতেই পঠন-পাঠন সেরে ফেলা হত। লুংথুং (পরে মুহুরীবাজার) -এ পাঠশালাটি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মার বর্ণনা পাঠশালাগুলির শোচনীয় অবস্থারই পরিচয় দেয়। তাই সেইসব পাঠশালাগুলির প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে কারো মাথাব্যথা ছিল না। নিম্ন-বাংলা স্কুলের অবস্থা এর চেয়ে কিছুটা ভাল হলেও এদের সম্পর্কেও খুব কম ক্ষেত্রেই আগ্রহ ছিল। তাই কেবলমাত্র এম.ই. (মধ্য ইংরেজী) এবং হাই স্কুলগুলির কথাই প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতিপটে বিশেষভাবে রক্ষিত আছে। পাঠশালা অথবা নিম্নবাংলা স্কুলের কথা যে একেবারেই স্মৃতিপটে নেই তা বলা যাবে না— তবে তা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে।

রাজন্য আমলের শতবর্ষ অতিক্রমকারী এই স্কুলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ প্রকৃতপক্ষে এদের মান্যতা পেতে যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, এতে সন্দেহ নেই। এদের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে যেসব প্রশ্ন পরবর্তীকালে উঠতো, প্রতিটি স্কুলের ক্ষেত্রেই এগুলিকে নিয়ে লেখকের মন্তব্য একারণেই সংযোজিত হয়েছে যেন এইসব ক্ষেত্রে যেসব বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা সুষ্ঠু সমাধান মেলে। এই সব সংগৃহীত তথ্য থেকে আরো একটা চিত্র বেড়িয়ে এসেছে যে, রাজন্য আমলে শতবর্ষ অতিক্রমকারী কিছু কিছু স্কুলের ক্ষেত্রে স্কুলের বিবর্তনের সময়কাল নিয়ে লেখকের অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। (যেমন, রাগনা স্কুল, উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়)। কিন্তু শতবর্ষ

অতিক্রমকারী স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাকাল অথবা উৎস নিয়ে কোনো ভুলের সুযোগ থাকা সম্ভব নয় বলে এই লেখক মনে করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুলগুলির অস্তিত্বের যে যুক্তিসিদ্ধ অনুমানে লেখক পৌঁছেছেন, স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাকাল তারও আগে বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং তা হলে লেখক সবচেয়ে খুশী হবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে রাজন্য আমলের অন্যান্য স্কুলগুলির অস্তিত্বের খোঁজে লেখক যেসব নীতি-নির্দেশিকা আরোপ করেছেন, সে সম্পর্কেও দ্বিধা থাকার কথা নয়, কারণ আমরা দেখেছি যে, পাঠশালাগুলি বাজারে অথবা সংলগ্ন অঞ্চলেই চালু হতো। জনশিক্ষা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেববর্মার একটি লেখা থেকেও এর সমর্থন মেলে। তিনি লিখেছেন— "আমি সালেমা স্কুলে পড়াশুনা করতাম। স্কুলঘর ছিল না। বাজারের বাছারিতে বাঁশের মাচায় বসে লেখাপড়া করতাম। আমাদের শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্মা। বাড়ী ময়মনসিং জিলায়। ছাত্রসংখ্যা মাত্র ১০/১২ জন। সালেমা বাজার ছিল শনিবার দিন। সেদিন শুধু মাস্টার মহাশয় নাম ডেকে ছুটি দিয়ে দিতেন। আমরা অধ্যয়নকারীরা মহারানী থেকে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। উলুছড়া থেকে বিশ্বমণি দেববর্মা নামে একজনই স্কুলে আসত। উক্ত স্কুলটি L.V অর্থাৎ নিম্ন-বাংলা ক্লাস IV পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।" (পটভূমিকা আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি-সম্পাদনা কুমুদকুন্ডু চৌধুরী / শুভব্রত দেব, ২০০৮, পৃষ্ঠা - ৩৬)। এতে রাজন্য আমলের পাঠশালা / নিম্নবাংলা স্কুলগুলির সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। বাজারকে ঘিরেই যে স্কুলগুলি গড়ে উঠত, এটা তারই একটা প্রমাণ।

বস্তুত, লেখকের এই প্রচেষ্টা মূলতঃ রাজন্য আমলের স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাকালকে অনুসন্ধানের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ। এরই সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে স্কুলগুলির কিছু কিছু ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। কিছু শতবর্ষ অতিক্রমকারী স্কুল ভিন্ন সিংহভাগ স্কুলেরই ইতিহাস এই লেখকের অজ্ঞাত। লেখক মনে করেন, প্রতিটি স্কুলের ইতিহাস লুকিয়ে আছে স্কুলের প্রাচীন রেকর্ডে, স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের (যারা এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অথবা শিক্ষক অথবা অন্য কোনো ভাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন) স্মৃতিতে। তবে আমরা দেখেছি যে, স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারণা করে। তাই একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে দেখাও প্রয়োজন। কাজেই এই কাজ যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি পরিশ্রমসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস সংগ্রহ সম্ভব হলেও তাকে একত্রে গ্রন্থনা করার জন্য একজন সংকলকের প্রয়োজন। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার জন্য অসংখ্য তরুণ গবেষকের প্রয়োজন। এই কার্য একদিন বাস্তবায়িত হবে, এটাই লেখক আন্তরিক ভাবে আশা করেন।

সর্বশেষে, বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থের কোথাও আরো তথ্য সংযোজনের সুযোগ থাকলে অথবা কোনো তথ্যে ত্রুটি থাকলে তা পাঠকরা লেখককে অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করা হবে।

সংযোজন

শেষ মুহূর্তে আরো দুটি শতবর্ষ অতিক্রমকারী বিদ্যালয়ের খোঁজ পাওয়া গেল ঃ

১. দুর্গাপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বিশালগড়

আবদুল আলীম 'বিশালগড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা - ১২৯) জানিয়েছেন যে, পতাকী দাস নামক এক কবিরাজ ১৮৯৮ সনের ২৬ জানুয়ারী পাঠশালা হিসেবে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিম্ন-বাংলা পর্যায়েও স্কুলটি অনেকদিন ছিল। ১৯৫৯ সন থেকে স্কুলটি নিম্ন বুনিয়াদী পর্যায়ে থাকার পর ১৯৯৯ সনে উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে উন্নীত হয়। ২০০১ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর স্কুলটি শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করে। বিশালগড় মহকুমার নারায়ণখামারে স্কুলটি অবস্থিত।

২. তারিণীসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, ধনপুর, সোনামুড়া

সোনামুড়া মহকুমার ধনপুরের লাগোয়া বাংলাদেশের গ্রাম বিজয়নগর (দল কুইয়া)-এর জমিদার ফেজুরাম ও তাঁর পুত্র শশীকুমারের উদ্যোগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলটি ঐ গ্রামে স্থাপিত হয়। তখন স্কুলটির নাম ছিল তারিণীসুন্দরী বিদ্যালয়। তারিণীসুন্দরী ছিলেন জমিদার ফেজুরামের পত্নী। দেশভাগের পর গ্রামের বেশির ভাগ অংশই পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেও স্কুলটি ভারত-ভূখন্ডে সীমান্ত এলাকায় থেকে যাওয়ায় তখন স্কুলটিকে একটু ভিতরে শান্তিনগর গ্রামের পূর্বপাড়ায় স্থাপন করা হয়। আশির দশকের শুরুতে স্কুলটি আবার স্থানত্যাগ করে বর্তমান জায়গায় চলে আসে। ১৯৯১ সনে বিদ্যালয়টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমান বছরে (২০১০) স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দৈনিক সংবাদ (১৯ জানুয়ারী) ও স্যন্দন পত্রিকায় (২৬ জানুয়ারী, ২০১০) বিদ্যালয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত প্রতিবেদন বেরিয়েছে।

এছাড়া 'বিশালগড়ের ইতিবৃত্তে' আবদুল আলীম রাজন্য আমলে প্রতিষ্ঠিত আরো ৪টি স্কুলের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে কৃষ্ণকিশোর নগরের চৌধুরী পরিবার প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণময়ী গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলটি (প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯২২) বর্তমানে অবলুপ্ত বলে তিনি জানিয়েছেন। বাকী তিনটি স্কুলের মধ্যে বামাসুন্দরী সিনিয়র বেসিক স্কুল ১৯২৬ সনে, গজারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৫ সনে এবং ঢাকা বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আধুনিক ত্রিপুরা ঃ প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য - ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ২০০৫ (ত্রিপুরা)।

২. আবর্জনার ঝুড়ি — নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, ২০০৪, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩. উদয়পুর বিবরণ — শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, রাজ্য শিক্ষা বিভাগীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৪. জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা (ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে)— অঘোর দেববর্মা, জুন, ১৯৯৭, প্রাপ্তিস্থান — অঘোর দেববর্মা, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৫. ত্রিপুরা রাজ্যে দশ বছর, কৈলাসহর বিভাগ — শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শিক্ষা অধিকার, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৭৬।

৬. ত্রিপুরা রাজ্যে দশ বছর, খোয়াই বিভাগ — শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শিক্ষা অধিকার, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৭২।

৭. ত্রিপুরা রাজ্যে দশ বছর, ধর্মনগর বিভাগ — শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শিক্ষা অধিকার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৮. ত্রিপুরার ইতিহাস — ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০০।

৯. ত্রিপুরার ইতিহাস — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ১২, ১৯৮২।

১০. ত্রিপুর দেশের কথা — সম্পাদনা ঃ ত্রিপুর চন্দ্র সেন, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৯৭ ।

১১। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন — সম্পাদনা ঃ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৭১।

১২। দেশকাল — ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৬।

১৩। বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা — পরমেশ আচার্য, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলিকাতা-৯, ১৯৮৯।

১৪। রাজন্যী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা — সম্পাদনা ঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা , ১৯৭৬।

১৫। রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস — কৈলাসচন্দ্র সিংহ, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

১৬। সেনসাস বিবরণী, ১৩৪০ ত্রিং — সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৯৭।

17. Administration Report of the political Agency, Hill Tipperah (1872-78), Vol - I, Tripura State Cultural Research Institute & Museum, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura, 1996. (edited by D. K. Chaudhuri).

18. Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, (1878-79-1890), Vol-II, Tripura State Cultural Research Institution & Museum, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura, 1996, (Edited by Dipak Kumar Chauduri).

19. Administration Report of Tripura State, Edited by, Mahadeb Chakraborty, Vol-I, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994.

20. Administration Report of Tripura State, Edited by Mahadeb Chakraborty, Vol-II, Gyan Publishing House, New Delhi - 110002, 1994.

21. Administration Report of Tripura State, Edited by Mahadeb Chakraborty, Vol-III, Gyan Publishing House, New Delhi - 110002, 1994.

22. Administration Report of Tripura State, Edited by Mahadeb Chakraborty, Vol-IV, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994.

23. Report on Administration of Tripura State, Edited by Ranjit Kumar De, Tara Book Agency, Kamachha, Varanasi, 1997.

24. Report on the Administration of the State of Tipperah for the year 1300 TE, Tribal Research and Cultural Institute, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura - 2004.

25. The Administration Report of Tripura State , 1894-95, 1914-15, 1918-19, Tribal Research Institute, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura, 2004.

26. Tripura State Administration Report, Edited by Dr. D. N. Goswami & Arun Debbarma, Tribal Research and Cultural Institute, Govt.

of Tripura, Agartala, Tripura, 2007.

27. Tripura District Gazetteers, K.D. Menon, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura, 1975.

28. Centenary Souvenir, Umakanta Academy (1890-1990), Agartala, Tripura, 1990.

২৯. সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা ২০০০, বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিশালগড়, পশ্চিম ত্রিপুরা, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০০।

৩০। শতবর্ষ স্মরণিকা বিজয়কুমার বিদ্যালয় (১৮৯২-১৯৯২), আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৯৫।

৩১। শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ২০০৫, ব্রজেন্দ্রকুমার ইন্‌স্টিটিউশন, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ২০০৫।

৩২। শতবর্ষ স্মরণিকা (১৮৯৪-১৯৯৪), মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৯৪।

৩৩। উজ্জয়ন্ত, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০১।

৩৪। স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ২০০৬, বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩৫। স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, ১লা জানুয়ারী, ২০০০, ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ফটিকরায়, উত্তর ত্রিপুরা।

৩৬। পূর্বাভাষ (সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), ৪র্থ বর্ষ - ৪র্থ সংখ্যা, শারদ ২০০০, পূর্বাভাষ প্রকাশনী, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩৭। আর. কে. আই.-এর শতবর্ষ ঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা (চিঠি) — বিক্রমজিৎ দেব, দৈনিক সংবাদ, ১৯শে জানুয়ারী, ২০০২।

৩৮। শতবর্ষের আলোকে কৈলাসহরের রাধাকিশোর ইন্‌স্টিটিউশন— গোপাল চক্রবর্তী, স্যন্দন পত্রিকা, ৩ জানুয়ারী, ২০০২, আগরতলা।

৩৯। ১৩০ বছরের প্রাচীন কৈলাসহরের উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় অস্তিত্বের সংকটে (প্রতিবেদন) — দৈনিক সংবাদ, ৮ এপ্রিল, ২০০২, আগরতলা।

৪০। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গণে অগ্রণীরা (১) ঃ শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রথমে তুলে ধরেন জানকী দেবী-ই— হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৯ আগস্ট, ২০০৩।

৪১। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গণে অগ্রণীরা (২) ঃ সম্ভবত মোহিনী দেবীই ছিলেন সর্বপ্রথম সরকারী শিক্ষিকা — হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১০ আগস্ট, ২০০৩।

৪২। কৈলাসহরের শিক্ষাঙ্গনে অগ্রণীরা (৩)ঃ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম হাল ধরেছিলেন প্রতিভা দত্তগুপ্ত— হরিপদ ভট্টাচার্য, দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৩ আগস্ট, ২০০৩।

৪৩। অবশেষে সত্যের জয়ঃ শতবর্ষ পূর্তির মুখে কিরীট বিক্রম ইন্স্টিটিউশন ইতিহাস ফিরে পেলো— স্বপন ভট্টাচার্য, স্যন্দন পত্রিকা, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর, ২০০৪।

৪৪। পর্বতপ্রমাণ সমস্যায় জেরবার দক্ষিণের প্রাচীন বালিকা বিদ্যালয় ক্ষয়িষ্ণু সৌধ— স্বপন ভট্টাচার্য, স্যন্দন পত্রিকা, আগরতলা, ১৮ জুন, ২০০৫।

৪৫। রাণা বোধজং, একটি রাবীন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব— অঞ্জন বণিক, স্যন্দন পত্রিকা, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারী, ২০০৭।

৪৬। উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কিত স্বপন ভট্টাচার্যের একটি প্রতিবেদন, স্যন্দন পত্রিকা, আগরতলা, ২৮ জুলাই, ২০০৭।

47. Survey and settlement of the Chakla Roshanabad in the district of Tipperah and Noakhali (1892-96), J. G. Cummings, Tripura State Cultural Research Institute and Museum, Govt. of Tripura, Agartala.

৪৮। আগরতলার ইতিবৃত্ত, ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২।

৪৯। আগরতলার ইতিবৃত্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৯৯।

৫০। স্মরণিকা, সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষঃ ৯ই মার্চ, ২০০১-৮ই মার্চ, ২০০২, জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৫১। বিশালগড়ের ইতিবৃত্ত, আবদুল আলীম, ২০০২।

৫২। দৈনিক সংবাদ, ১৯ জানুয়ারী, ২০১০।

৫৩। স্যন্দন পত্রিকা, ২৩ জানুয়ারী, ২০১০।

৫৪। পটভূমিকা আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি, সম্পাদনা কুমুদকুন্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব, অক্ষর প্রকাশন, জুলাই, ২০০৮।
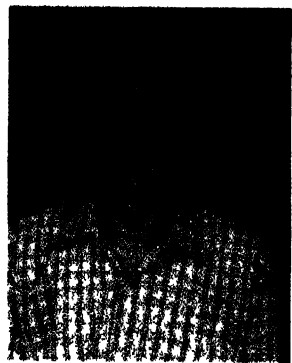
মৃণালকান্তি দেবরায়ের জন্ম ১০ জুলাই, ১৯৫০। এম বি বি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক সহ বি এসসি ডিগ্রি নিয়ে ১৯৭০ সাল থেকে ত্রিপুরার শিক্ষা-দপ্তরেব অধীনে শিক্ষকতার আরম্ভ। চাকুরি জীবনের বেশির ভাগ অংশই উমাকান্ত একাডেমিতে অতিবাহিত। বিগত শতকের আশির দশক ও নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯০ থেকে রাজন্য ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র অনুসন্ধানে রত। ২০০৩ সালে এ বিষয়ক একটি গ্রন্থ 'ত্রিপুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতির শেকড়ের-সন্ধানে' (প্রাক্-আধুনিক পর্ব)-ব প্রকাশ।

রাজমালার প্রাচীনত্ব নিয়ে ২০০৮ সালে 'রাজমালা' নামক আরেকটি গ্রন্থও লিখেছেন লেখক।